সত্য মিথ্যা

আবুল মনসুর আহমদ

সত্যমিথ্যা

আবুল মনসুর আহমদ

পরিবেশক ঃ

ভারতী লাইব্রেরি
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা

নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬ বাংলা বাজার
ঢাকা

প্রকাশক
মোসাম্মৎ ফাতেমা খানম্
নওরোজ লাইব্রেরি
১সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস
কলিকাতা

দ্বিতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫
দাম পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস,
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-১২

'সত্যমিথ্যা' যোহান বোয়ারের অমর কাহিনী The Power of a Lie এর বাংলা য়্যাডাপ্‌টেশন। ঐ অমর সৃষ্টি যাঁর, এই বাংলা রূপান্তরও তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

আবুল মনসুর আহমদ

এক

অঘ্রাণ মাস। সাঁঝের বেলা। সুরুজ ডুবু ডুবু। পশ্চিম আসমানে পাতলা-পাতলা সাজ। অস্তগামী সুরুজের রঙে তা লাল।

নসিরাবাদ হইতে মুক্তাগাছা হইয়া রোড-বোর্ডের পাকা সড়ক টাংগাইল মুখে গিয়াছে। এই সড়কের দুধারে যতদূর নযর চলে কেবল সরিষার খেত। তাতে ফুল ফুটিয়াছে। খেতের আইলে আইলে অসংখ্য শিমুল গাছ। তাতেও ফুল ফুটিয়াছে। সরিষার ফুল জমিনের উপর হলুদ রঙের বিস্তৃত গালিচা পাতিয়া দিয়াছে। শিমুল গাছগুলি সেই হলুদ গালিচার উপর লাল ফুলের টবের মতই শোভা পাইতেছে।

এই সড়ক ধরিয়া একটি এক্কাগাড়ি পশ্চিম হইতে পূব মুখে ছুটিতেছে। এক্কার আরোহী মাত্র একজন।

লোকটির মুখে কলপ-দেওয়া কাল কিচকিচা চাপ-দাড়ি। পরনে মিহিন তাঁতের ধুতি। গায়ে ছাইয়া রঙের জুটফ্লানেলের শার্ট। শার্টের উপর খয়েরী রঙের গরম কোট। গলায় সবুজ রঙের পশমী মাফলার। মাথায় লাল তুর্কী টুপির ঝুপ্পা হাওয়ায় উড়িতেছে। পায়ে উল্টা ক্রোম লেদারের খয়েরী রঙের জুতা।

ইনি কিস্‌মতপুরের ওসমান সরকার। শুধু সে গাঁয়ের নয়, তিনি এ অঞ্চলেরই প্রবল-প্রতাপ মাতব্বর। কিস্‌মতপুর নসিরাবাদ হইতে পশ্চিমে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

ওসমান সরকার জিলা বোর্ডের পুরান কণ্টাকদার। এ কাজে তিনি বহু টাকা রোযগার করিয়াছেন। জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর, দালান-ইমারত করিয়াছেন। নসিরাবাদ শহরে তিন চারখানা বাড়ি আছে। তার একটিতে সরকার সাহেবের নিজের কাপড়ের দোকান। বাকীগুলি ভাড়া চলে। মাসে দুইশ টাকা ভাড়া আসে। কিসমতপুরের বাজারেও দুই-তিনটা ঘর আছে। আগে তাতে তিনি পাটের কারবার করিতেন। এখন ভাড়া

দিয়াছেন। কারবার, কণ্টাকদারি এবং ভাড়া বাবদ খাইয়া-থুইয়া সরকার সাহেবের বার্ষিক আয় খোদার ফযলে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা।

সরকার সাহেবের বয়স ষাটের উপর। কিন্তু হঠাৎ দেখিয়া মনে হয় অনেক কম। এটা শুধু চুল-দাড়িতে খেযাব লাগানোর জন্য নয়। আসলেই তাঁর শরীরটা টান-টান। স্বাস্থ্যটি বেশ। কিছুদিন আগেও সাইকেলে চলাফিরা করিতেন। এই সেদিন মাত্র এক্কা করিয়াছেন। এ ছাড়া একটা দামী ঘোড়াও আছে। সরকার সাহেব এককালে ভাল ঘোড়-সওয়ার ছিলেন। দরকার-মত ঘোড়ায়ও তিনি চলাফিরা করেন। এক্কাও তিনি নিজেই চালান। কোচমান লাগে না।

গাড়ি কিনিবার কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলেন: বয়স হইয়াছে, এখন আর আগের মত সাইকেল মারিতে পারি না, তাই।

লোকে কিন্তু বলাবলি করে: বড়লোক হইয়াছেন, জমিদারির শরিকি কিনিয়া চৌধুরী লিখিতেছেন। তাই এই জমিদারী চাল।

সরকার সাহেব ঘোড়াকে কশিয়া চাবুক মারিলেন। ঘোড়াটা চলিতেছে খুব তেজেই। তবু তিনি ঘোড়ার পিঠে বারবার চাবুক মারিতেছেন। তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তি ফাটিয়া পড়িতেছে।

সরকার সাহেবের রাগের কারণ আছে। তিনি এখন ইউনিয়ন বোর্ড হইতে ফিরিতেছেন। তথায় আজই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হইয়াছে। এই নির্বাচনে সরকার সাহেব রহমতপুরের ইয়াকুব মৌলবির কাছে মাত্র এক ভোটে হারিয়া আসিয়াছেন। ওসমান সরকার একটানা আঠার বছর ধরিয়া এই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। এ অঞ্চলের কেউ তাঁকে কন্টেস্ট করিতে পারে এবং কন্টেস্ট করিলেও হারাইতে পারে, এ কল্পনা কেউ কোনদিন করে নাই, তিনি নিজেও করেন নাই। আর করিবেনই বা কেন? এই আঠার বছরের প্রেসিডেন্টগিরিতে তিনি এই ইউনিয়নের কত না উন্নতি, লোকজনের কত না উপকার করিয়াছেন। একটি করিয়াছেন, বোর্ড হইতে গ্রাণ্ট দিয়া অনেকগুলি আধ-মরা ম তাজা করিয়াছেন। অনেক রাস্তাঘাট তৈয়ার করিয়

চলাচলের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কয়েকটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের তহবিলে যখন কুলায় নাই, তখন জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানদেরে দাওয়াৎ খাওয়াইয়া, অভ্যর্থনা-অভিনন্দন-পত্র দিয়া, মেম্বরদেরে খোশামুদ করিয়া তিনি ইউনিয়নে আধ-ডজন নলকূপ দেওয়াইয়াছেন এবং একটি খয়রাতী ডাক্তারখানা খোলাইয়াছেন। এত করিয়াও তিনি গ্রামবাসীর মন-ঈমান পাইলেন না! আঠার বছরের এই নিঃস্বার্থ খিদমতের বদলা দিল কিনা নিমকহারাম গ্রামবাসী তাঁকে বুড়া বয়সে হারাইয়া দিয়া! এই আঠার বছর তিনি যদি বেইমান গ্রামবাসীর জন্য মেম্বর-চেয়ারম্যানদের খোশামুদ না করিয়া নিজের জন্য করিতেন, তবে তাঁর কণ্টাক্‌দারি কত বাড়িয়া যাইত! কত বেশী টাকা তিনি রোযগার করিতে পারিতেন! বেইমান লোকগুলি তাঁর এই খিদমতের কথা একটুও ভাবিল না! আর, হারাইয়া দিল কিনা একটা মোল্লার কাছে! সে মোল্লা প্রেসিডেন্টির জানে কি? সে কি এক হরফ ইংরাজী জানে? ইংরাজীতে নিজের নামটা দস্তখত করিতেও ত সে পারে না। হেঁ, প্রেসিডেণ্ট হইলেই হইল!

তা ছাড়া, এই মৌলবি লোকটাও কি বেইমান! কে তাকে পুছিত? সরকার সাহেবই ত একদিন তাকে পাঁচ গাঁয়ের ইমাম বানাইয়া দিয়াছিলেন। আগে গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন মাঠে ও মস্‌জিদে ঈদের জমাত হইত। ওসমান সরকারই ত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, মাতব্বর ও ইমামদের খোশামুদ করিয়া, কত দেন-দরবার করিয়া, কত যিয়াফত খাওয়াইয়া সমস্ত ক্ষুদে জমাত ও দলাদলি ভাঙিয়া পাঁচ গাঁয়ের এক মিলিত ঈদের জমাত করিয়াছেন। আর তার ইমাম বানাইয়াছিলেন ইয়াকুব মৌলবিকে। মওলানা মুসার মত বড় আলিমকে শুধু বিদেশী হওয়ার দোষে বাদ দিয়াছিলেন। আলাদা আলাদা জমাত ভাঙিয়া এক জমাত করায় ঐ সব ক্ষুদে জমাতের ইমামতি ও সর্দারি হারাইয়া কত মুন্‌শি-মৌলবি সরকার সাহেবের দুশ্‌মন হইয়াছেন। মওলানা মুসাকে বাদ দিয়া ইয়াকুব মৌলবিকে ইমাম বহাল করায় পাঁচ গাঁয়ের যত সব মৌলবি-মওলানা সরকার সাহেবের উপর চটিয়া

লাল। নাহক এত লোকের দুশ্‌মনির এ ঝুঁকি লইবার সরকার সাহেবের কি দরকার ছিল? অথচ সেই ইয়াকুব মৌলবিই কিনা আজ তাঁর বিরুদ্ধে এত বড় দুশ্‌মনিটা করিল! কেন? মৌলবি যে ইমামতি হারাইল, তার জন্য কি সরকার সাহেব দায়ী? ইমামতির সুযোগ লইয়া মৌলবি যখন ইউনিয়ন বোর্ডে দাঁড়ায়, তখনও সরকার সাহেব তার বিরুদ্ধতা করেন নাই। বরঞ্চ সহায়তাই করিয়াছিলেন। তারপর মেম্বর হইয়া মৌলবি যখন লোকের ঠাঁই পয়সা-কড়ি নিতে লাগিল, তখন তার পিছে লোকে নমায পড়িতে চায় নাই বলিয়াই ত সরকার সাহেব আখেরে মওলানা মুসাকে ইমাম বহাল করিয়াছেন। এতে তাঁর দোষটা কি হইয়াছে?

কেউ তাঁকে ঠকাইয়াছে, একথা বুঝিতে পারিলে ওসমান সরকারের রাগ ঠকের চেয়ে নিজের উপরেই হইত বেশী। আর তিনি যেই বুঝিলেন, গ্রামের লোকেরা এবং ইয়াকুব মৌলবি তাঁকে ঠকাইয়াছে, অমনি তাঁর রাগ হইল নিজের উপর এবং শেষ পর্যন্ত সে রাগ পড়িল গিয়া বেচারা ঘোড়াটার উপর। তাই তিনি ঘোড়াটাকে ঘন ঘন চাবুক কশিয়া নিজের রাগ ঝাড়িতেছেন। তিনি যেন ইয়াকুব মৌলবির পিঠেই চাবুক বসাইতেছেন।

ঘোড়া ছুটিতেছিল। আরেকটা চাবুক খাইয়া ঘোড়াটা পিছের পা-জোড়া খেঁচিয়া হাওয়ায় একটা লাথি মারিয়া দ্বিগুণ তেজে ছুট দিল। রাস্তার লোকেরা বহুদূর হইতেই একেবারে সড়কের কিনারে নামিয়া পড়িয়া গাড়ির রাস্তা করিয়া দিতে লাগিল। বেশীর ভাগ পথিকই সরকার সাহেবকে চিনে। তারা মাথা নোয়াইয়া সরকার সাহেবকে আদাব করিতেছে। অন্যমনস্ক রাগত সরকার সাহেব তার কোনটা লইতেছেন, কোনটা তাঁর দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতেছে। তিনি ঠোঁটে কামড় দিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আছেন।

বোর্ডের সড়ক ছাড়িয়া এবার এক্কা একটি ছোট রাস্তায় পড়িল। এটি ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা। সরকার সাহেবের নিজের জমির উপর দিয়া তাঁর বাড়িতক রাস্তাটি গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া এক্কা ছুটিয়া অল্পক্ষণেই সরকার সাহেবের পুকুর-পাড়ে আসিয়া হাযির হইল।

ঘোড়ার খুরের শব্দে ইতিপূর্বেই সহিস আগাইয়া আসিয়াছিল। এক্কা পুকুর-পাড়ে পৌছিতেই সে দৌড়িয়া আসিয়া ঘোড়ার মুখের কাছে লাগাম ধরিল। গাড়ি থামিল।

সরকার সাহেব গাড়ি হইতে এক লাফে নামিয়া পড়িলেন এবং জুতার মচমচ আওয়ায করিয়া সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

মস্ত বড় বাড়ি ওসমান সরকারের। ব্রহ্মপুত্র নদীর অল্প দূরে দক্ষিণ দিকে। অঘ্রাণ মাসে নদীতে চর পড়িয়াছে। তবু কিছু দূরেই নদীর পানি দেখা যায়। বাড়ির পূবধারে বিশাল পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে কিছুদূরে পূবমুখা এক সারি টিনের ঘর। ঘরগুলির ভিত পাকা। বেড়া টিন ও কাঠের। এই ঘরের সারির পশ্চিমে মস্ত বড় উঠান। উঠানে সারি সারি ধানের পালা। উঠানের পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মস্ত বড় একতালা দালান। দালানের পেট কাটিয়া আন্দরে যাইবার গেট। গেটের কপালিতে নীলরঙা বিলাতী মাটিতে চাঁদ-তারা আঁকা।

দুই

দালানের ভিতর দিককার চওড়া বারান্দায় একটা চৌকি পাতা। চৌকির পাশে একটি ইযিচেয়ার। সরকার সাহেব মাথার টুপিটা চৌকির উপর ফেলিয়া মারিয়া ইযিচেয়ারে লম্বা হইয়া পড়িলেন।

বাড়ির উত্তরের ভিটায় একটি প্রকাণ্ড টিনের ঘর। এই ঘরের বারান্দায় সরকার সাহেবের বিবি জায়নমাযে বসিয়া ছিলেন। বোধ হয় নমায পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সরকার সাহেবের আহট পাইয়া তিনি জায়নমায ছাড়িয়া স্বামীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন। আগে হইতেই তিনি এক বদনা পানি ও খড়ম যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবার উহা সরকার সাহেবের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন: নমাযের ওক্তো হইছে, আযান পইড়া গেছে। চা'র পানি গরম করাই আছে। আপনে নমাযটা পইড়া আসেন ; আমিও নমাযটা পইড়া লই।

কিন্তু সরকার সাহেব নড়িলেন না। ইযিচেয়ারে তেমনি পড়িয়া রহিলেন

কিছুক্ষণ ইন্তেযার করিয়া বিবিসাহেব চেয়ারের পিছনে আসিলেন। স্বামীর মাথা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলেন। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন: তৈবতটা কি ভাল না? মাথাটায় কি দরদ হইছে? একটু টিইপা দিমু?

সরকার সাহেব হাঁ-না কিছু বলিলেন না। চোখ বুজিয়া তেমনি পড়িয়া রহিলেন। বিবি সাহেব খসমের মাথা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। বোঝা গেল তিনি আরাম পাইতেছেন। মাথা টিপিতে টিপিতে বিবি সাহেব বলিলেন: ইলেক্‌শনের খবর কি?

এতক্ষণে সরকার সাহেব সাড়া দিলেন। তিনি চোখ না খুলিয়াই বিরক্তিমাখা সুরে বলিলেন: বুঝতেই ত পারতাছ। আমার হাইরের কথা বারে বারে শুন্‌তে তোমরার খুব মজা লাগে?

অন্য কোনো স্ত্রীলোক হইলে খসমের এই ধমকে ভড়কিয়া যাইত। কিন্তু সরকার-পত্নী চালাক মেয়ে। কিছু কিছু পড়ালেখাও জানেন। খসমের চেহারা দেখিয়াই তিনি ফলাফল অনুমান করিয়াছিলেন। তবু ওটা জানিতে চাহিয়া তিনি ভুলই করিয়াছেন। নিজের পরাজয়ের কথা বলিতে মানুষের মনে কষ্ট লাগা স্বাভাবিক। তাই বিবি সাহেব ভুল শোধরাইবার আশায় বলিলেন: বাঁচা গেছে, ও-আপদ দূর হইছে। দিন নাই রাত নাই পরের লাগি ঐ হাড়-ভাঙা খাটুনি! ওটা আমার কোনো দিন ভালা লাগত না। খাইটা খাইটা শরীলটা কি হইছে, একবার চাইয়া দেখেন ত। নিজের দিকি কোনদিন ত চাইলেন না। খালি পরের লাগি খাইটা মরলেন। এবার আল্লা বাঁচাইছে। একটু আসান পাইবেন।

বিবি সাহেব সরকার সাহেবের দ্বিতীয়পক্ষ। সুতরাং তাঁকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু সেটা শুধু দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া নয়। এই বিবির বুদ্ধি-আক্কেলেও তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাঁরই পরামর্শে, তাঁরই সাহায্য ও উৎসাহে, এমন কি গোড়াতে তাঁরই বাপের বাড়ির টাকায় সরকার সাহেবের এই অতুল ধন-দওলৎ। এজন্য সরকার সাহেব বিবি সাহেবার প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ। মুখে মুখে তারিফও তাঁর করিয়া থাকেন।

এ অঞ্চলের প্রায় সবাই জানে সরকার সাহেব একটু স্ত্রৈণ। কেউ কেউ বলিয়া থাকে, ও-বাড়ীর আসল কর্তা বিবি সাহেব।

যাহোক বিবির আজকার কথাগুলি সরকার সাহেবের ভাল লাগিল। এতক্ষণে এই অপমানকর পরাজয়ের একটা ভাল দিকও তাঁর নযরে পড়িল। তিনি সান্ত্বনার একটা যুক্তি পাইলেন। সত্যই ত! প্রেসিডেন্টগিরি করিয়া তাঁর নিজের লাভ কি? অথচ ঝামেলা কত!

বিবির নরম হাতের স্পর্শে সরকার সাহেবের মাথায় খুবই আরাম লাগিল। তিনি স্ত্রীর হাতের নীচে একেবারে এলাইয়া পড়িলেন। নমাযের কথা ভুলিয়া গেলেন। বিবিও আর তাগিদ করিলেন না। মাথায় কপালে চোখে কানে ঘাড়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

হাত বুলাইতে বুলাইতে বিবি সাহেব ডাক ছাড়িলেন: ও যায়েদা, ও বৌমা, তোমরা কেউ সায়েবের চা'টা লইয়া আইস। কেতলিটা আমি চুলার উপর দিয়াই থুইছি।

যায়েদা সরকার সাহেবের মেয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম সন্তান। বয়স পঁচিশের উপর। নিঃসন্তান বিধবা। পাঁচ বছর আগে বিধবা হইয়া বাপের বাড়িতেই আছে। দিন-রাত ইবাদত-বন্দেগি ও কোরআন তেলাওত লইয়াই থাকে।

বৌমা সরকার সাহেবের মৃত পুত্র হায়দর আলির বিধবা স্ত্রী। হায়দর আলি ছিল সরকার সাহেবের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে পড়াশোনায় সুবিধা করিতে পারে নাই বলিয়া সরকার সাহেব তাকে কুড়ি বছর বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন এবং নিজের কণ্টাকদারি কাজের সহকারী করিয়া লইয়াছিলেন। এই কাজে হায়দার আলি যোগ্যতার পরিচয়ও দিয়াছিল। সেজন্য সরকার সাহেব তাকে স্বাধীনভাবে কণ্টাকদারি করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন এবং তার নামে কতকগুলি কণ্টাক লইয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পাঁচ বছরের মধ্যেই একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া হায়দর আলি মারা যায়। সরকার সাহেব পিতৃহীন নাতি হুদু মিঞাকে বুকে লইয়া বালিকা-বিধবা পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়া কাঁদিয়া বলেন: মা,

তুমি আমার আপন ফরযন্দের মেয়ে। এই নাবালকের মুখের দিকে চাইয়া তুমি এ বাড়িতেই থাক। এই বাড়িই তোমার বাপের বাড়ি। সেই হইতে বালিকা-বিধবা পুত্র তুতুকে বুকে ধরিয়া স্বামীর ভিটায় পড়িয়া আছে। বছরে এক আধবারের বেশী বাপের বাড়ি যায় না। সরকার সাহেব বৌমাকে সত্যই মেয়ের মতই আদর করেন। যতক্ষণ আন্দরে থাকেন, তুতুকে লইয়া ঘোড়া ঘোড়া খেলেন।

বিবি সাহেবও বৌমাকে স্নেহ করেন। বি-শাশুড়ী বলিয়া কোনও অযত্ন বৌমা কখনও পায় নাই।

বিবি সাহেব যখন তুজনের উদ্দেশে চা'য়ের ফরমায়েশ দিলেন, তখন যায়েদা নমাযে বসিয়াছে এবং বৌমা তুতুর হাত পা ধোওয়াইতেছে। সারা বিকাল উঠান-দীঘালি দৌড়াদৌড়ি করিয়া তুতু মিঞা পা হইতে মাথা পর্যন্ত ধূলি-মাখা। কাজেই হাত-পা ধোওয়াটা কার্যত আধা-গোসলই হইতেছে। সন্ধ্যাবেলার টেল্‌ক পানিতে তুতু চিৎকার করিতেছে। বালিকা-মাতা কখনও ধমকাইয়া কখনও চড়-থাপ্পড় দিয়া তুতুকে বশ মানাইবার চেষ্টা করিতেছে।

সুতরাং বিবি সাহেবার আদেশে বৌমা উঠিয়া আসিতে পারিল না। বলিল: এই আসতাছি আম্মা। এই বান্দরটাকে ধুইয়া এক্ষণই আসতাছি।

নাতির কান্নাকাটিতে সরকার সাহেবের নীরবতা কাটিল। তিনি বলিলেন: থাক থাক বৌমা, তুমি দাতুর হাত-পা ধুওয়া শেষ কইরাই উঠ। বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে। ছোঁড়ার আবার সর্দি-টর্দি লাইগা যাবার পারে। চা'র লাগি অত তাড়াতাড়ি কি?

কিন্তু চা আসিয়া পড়িল। বিবি সাহেবার ডাকে যায়েদা ফরয নমায সারিয়াই জায়নমায হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে এবং বাপের চা লইয়া হাযির হইয়াছে।

বিবি সাহেবা চা বানাইতে শুরু করিলেন। যায়েদা মার নির্দেশে পালঙের নীচের টিনের ভিতর হইতে মুড়ির লাড়ু বাহির করিয়া তশ্‌তরিতে করিয়া বাপের সামনে রাখিয়া দিল।

সরকার সাহেব লাড়ুতে দুই-একটা কামড় দিয়াই রাখিয়া দিলেন। লাড়ুগুলি যেন আজ বড় শক্ত, দাঁতগুলি যেন আজ নড়-বড়া। এই দাঁতে দুদিন আগেও তিনি কড়মড় করিয়া লাড়ু ভাঙিয়াছেন। কিন্তু আজ প্রেসিডেন্টগিরি হারাইয়া যেন দাঁতগুলিরও গোড়া নরম হইয়া গিয়াছে।

লাড়ু রাখিয়া দিলেন দেখিয়া বিবি সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সরকার সাহেব একটা বাজে কৈফিয়ৎ দিয়া দুই-তিন চুমুকে চা খাইয়া ফেলিলেন। চা'টাও যেন কেমন বেমজা লাগিল।

ইতিমধ্যে চাকর সামনে হুক্কা ও টিপয়ের উপর হারিকেন রাখিয়া গিয়াছে। সরকার সাহেব টিপয়ের উপর আজকার ডাকের চিঠি-পত্র দেখিতে পাইলেন। চিঠিগুলির বেশীর ভাগই ইউনিয়নবোর্ড সংক্রান্ত। রাত্রেও তিনি বোর্ডের কাজ লইয়া থাকেন বলিয়া বোর্ডের চিঠি-পত্র সরকার সাহেবের বাড়িতেই ডেলিভারি দিবার নির্দেশ আছে। বিশেষতঃ বোর্ডের নিজস্ব আফিস ঘর থাকা সত্ত্বেও আঠার বছরের প্রেসিডেন্টের বাড়িই একরূপ বোর্ডের আফিস হইয়া গিয়াছে।

বোর্ডের চিঠিগুলি আজ তাঁর চোখে বালি হইয়া ফুটিল। তিনি ওগুলি ধাক্কা দিয়া একদিকে সরাইয়া ব্যক্তিগত চিঠিগুলি খুলিলেন।

ব্যক্তিগত চিঠি ছিল মাত্র দুইটি। তিনি হুক্কার নল মুখে লইয়া ইযিচেয়ারে চিৎ হইয়া চিঠি খুলিলেন। একটি লিখিয়াছে তাঁর ছেলে ওয়াজেদ আলি। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বি-এ পড়ে। সে লিখিয়াছে, তার টেস্টের আর তিনমাস মাত্র বাকী। দিন রাত পড়িতেছে। বাপের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের ফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব আছে।

'হুম্'—বলিয়া চিঠিটা তিনি টিপয়ের উপর ছুড়িয়া মারিলেন। ছেলেপিলে কেন যাইবে ইলেকশন লইয়া মাথা ঘামাইতে? সরকার সাহেব ইলেকশনে হারুন জিতুন, তাতে কলেজের ছাত্র ওয়াজেদের কি? সে কেন পড়াশোনা ফেলিয়া ইলেক্‌শনের কথা ভাবিবে? ছেলেগুলি আজকাল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সরকার সাহেব ভুলিয়া গেলেন গত প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের সময়

ওয়াজেদ আরও ছোট ছিল। জিলাস্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। তখনকার সে ইলেকশনে ওয়াজেদ শুধু বসিয়া বসিয়া মাথা ঘামায় নাই, সরকার সাহেবের পক্ষে বাড়ি-বাড়ি ক্যানভাস করিতেও গিয়াছিল। সরকার সাহেব তখন আপত্তি করেন নাই। সেবার তিনি ইলেকশনে জিতিয়াছিলেন।

ওয়াজেদের চিঠিটা ফেলিয়া তিনি দ্বিতীয় পত্রটি খুলিলেন। এটা আসিয়াছে নসিরাবাদ ব্যাংকের ম্যানেজারের নিকট হইতে। ব্যাংকের চিঠি দেখিয়া তাঁর কান খাড়া হইল। তিনি তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়িয়া ফেলিলেন।

ম্যানেজার লিখিয়াছেন: আযমতপুরের আমির আলি খাঁ ব্যাংকের নিকট হইতে ছয় বছর আগে দুই হাজার টাকা ধার নিয়াছিলেন। ঐ টাকার জন্য সরকার সাহেব যামিন আছেন। তিন বছরের মধ্যে সে টাকা একতোড়াতে আদায়ের করার ছিল। আমির আলি সেই টাকার এক পয়সাও শোধ করেন নাই। করার উত্তীর্ণ হইবার পরও তিন বছর যায় যায়। অমুক তারিখের মধ্যে কিছু টাকা দিয়া ওয়াশিল না দিলে দলিল তামাদি হইয়া যাইবে। সরকার সাহেব মান্য-গন্য ব্যক্তি, তাঁকে ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ নিজেদের একজন মুরুব্বি মনে করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় ব্যাংক এই সামান্য টাকার জন্য কোর্টে যাইতে ইচ্ছুক ন'ন। সরকার সাহেব যদি অমুক তারিখের মধ্যে কিছু টাকা ওয়াশিল দেওয়াইয়া তামাদি রক্ষা করিয়া যান, তবে ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ বাধিত হইবেন। অন্যথায় ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ নিতান্ত অপ্রিয় কর্তব্য হিসাবে আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবেন। প্রকাশ থাকে যে, সরকার সাহেবকে দেখিয়াই ব্যাংক আমির আলি খাঁকে অত টাকা ধার দিয়াছিলেন, অন্যথায় তাঁকে বিনা-রেহানে কিছুতেই টাকা ধার দিতেন না।

সরকার সাহেব তড়াক করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। তিনি তিন-চার বার পত্রটা পাল্টাইয়া পড়িলেন। তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন?

তিন

সরকার সাহেব আমির আলির যামিন হইয়াছিলেন, কর্ম-ব্যস্ত জীবনে একথা তিনি সাফ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ছয় বছরের কথা কে অত মনে

রাখে? আজ এই পরাজয়ের পরে পরেই এখন সেই যামিনের কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর বিষম রাগ হইল। আমির আলির বেইমানিতে তিনি বিষম চটিয়া গেলেন।

কারণ আজকার প্রেসিডেণ্ট ইলেকশনে সে ইয়াকুব মৌলবির পক্ষে ক্যান্‌ভাস করিয়াছে। লোকটা আদত নিমকহারাম। এই যামিন হওয়া ছাড়াও সরকার সাহেব আমির আলির কত উপকার করিয়াছেন।

সরকার সাহেবের মনে পড়িল, তিনিই ছয় বছর আগে আমির আলিকে সর্বপ্রথম বোর্ডে আমদানি করেন। আমির আলিকে চিনিত কে? সে ইলেকশনে দাঁড়াইতে সাহস করে নাই। সরকার সাহেবই সার্কেল অফিসারকে মুর্গি-পোলাও খাওয়াইয়া, এস-ডি-ওকে এক ঝাঁকা কমলা ও একটা রুই মাছ ভেট দিয়া আমির আলিকে নমিনেশন দেওয়ান। এই নমিনেশনের জোরে বোর্ডে আসিয়াই ত সে লোক-সমাজে পরিচিত হয়। তাতেই ত সে এখন ভোট পায়।

এই বেইমানের জন্য তিনি আবার যামিনও হইতে গিয়াছিলেন! তাঁর কি মাথা খারাপ হইয়াছিল? তিনি এই নিমকহারামের প্রতি হঠাৎ অত দরদী হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন?

এতক্ষণে সরকার সাহেবের বেশ মনে পড়িতেছে ব্যাপারটা। তাঁর প্রথম পক্ষের মেয়ে মাজেদা তিন বছরের মধ্যে উপরাউপরি দুইবার বিধবা হওয়ায় তাকে তৃতীয়বার নিকাহ্ দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। নগদ টাকা-পয়সা ও লেখাপড়ার খরচা ইত্যাদির অনেক লোভ দেখাইয়াও তিনি মাজেদার জামাই যোগাড় করিতে পারেন না। এমন কথাও লোকেরা বলাবলি করে যে, যদি কেউ মরিতে চাও ওসমান সরকারের মেয়ে বিয়া কর গিয়া। গ্রামে তাঁর শত্রুরা এমন আজগুবি কথাও রাষ্ট্র করে যে, মাজেদার পেটে সাপ আছে, তার নিশ্বাসের সাথে সাপের বিষ বাহির হয়, তাতেই মাজেদার জামাই মারা যায়। দুশ্‌মনদের এই সব মিথ্যা প্রচারের ফলে মাজেদার বিয়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ কুড়ি বছরের স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়ের ফাটিয়া-পড়া যৌবনের দিকে

চাহিয়া সরকার সাহেবের চোখে আঁসু আসে। সৎমার ঘর। কাজেই মেয়ে সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন। কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না।

এমনি সময় আমির আলির সাথে সরকার সাহেবের দেখা। আমির আলি তিন-তিনবার বি-এ ফেল করার পর বাড়িতে বসিয়া চাকুরির উমেদারি করিতেছিল। একটা স্কুল-মাস্টারিও যোগাড় করিতে পারিতেছিল না। কার পরামর্শে সে তখন ইটখোলা খুলিবার কল্পনা করিতেছিল। সরকার সাহেবের প্রস্তাবে সে মাজেদাকে নিকাহ্ করিতে রাযী হয়। কিন্তু ইট খোলার জন্য দুই হাজার টাকা কোথাও হইতে ঋণ লইয়া দিতে বলে। সরকার সাহেব বুঝিয়া ফেলেন জামাই কৌশলে তাঁর নিকট হইতে বর-পণ আদায় করিতেছে। কিন্তু ইটের কারবার লাভজনক সরকার সাহেব এটা জানিতেন। তাঁর নিজের কন্টাকদারিতেই সারা বছরে যে ইট লাগে, তাতেই একটা ইটখোলার সব ইট লাগিয়া যায়। সরকার সাহেব নিজে একা খরিদ্দার থাকিলেও জামাই আমির আলির ইটের কারখানা চলিয়া যাইবে, সেটা সরকার সাহেব হিসাব করিয়া বুঝিলেন। কাজেই তিনি ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে বলিয়া আমির আলিকে ঐ ঋণ লইয়া দেন এবং নিজে যামিননামা সম্পাদন করিয়া দেন।

আমির আলির তিনি যামিনই শুধু হন নাই, তাকে নমিনেশনে ইউনিয়ন বোর্ডেও আনিয়াছিলেন। আশা ছিল, জামাই মেম্বর হইলে প্রেসিডেন্টির একটা ভোট নিশ্চিত।

কিন্তু এ সব আয়োজন মাটি করে স্বয়ং মাজেদা। ভিতরে ভিতরে সব ঠিকঠাক হইয়া যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই মাজেদা তিন দিনের ম্যালিগনাণ্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যায়।

আমির আলি তখন নিয়ামতপুরের ডেংগু বেপারীর মেয়ে যরিনাকে বিয়া করে এবং শোনা যায় কিছু নগদ টাকাও আদায় করে।

সরকার সাহেব এই ব্যাপারটা কাকেও, বিশেষ করিয়া বিবি সাহেবকে কোনও দিন বলেন নাই। বলা ত যায় না, সৎমার মন। দুই হাজার টাকার

যামিন হইয়া সংমেয়ের বিবাহ দেওয়া হইতেছে। বাড়িতে নাহক একটা অপ্রীতির সৃষ্টি হইতে পারে। কি দরকার অত সব কথা মেয়েলোকের কাছে বলিয়া? ইটের কারখানার নিশ্চিত লাভে সে টাকা ত মেয়াদের আগেই শোধ হইয়া যাইবে। এটা লইয়া ভাবিবারই কি আছে, বলাবলিরই বা কি আছে?

মাজেদা মারা যাওয়ার পরও তিনি স্ত্রীর কাছে ও-কথা বলেন নাই। কারণ, ভয় পাইতেন। কাজটা বাস্তবিকই তাড়াতাড়ি হইয়া গিয়াছিল। যাক গিয়া। আমির আলির ইটের কারখানা যেভাবে চলিতেছে, সে ঐ ঋণ অতি সহজেই শোধ দিতে পারিবে। তা ছাড়া ইউনিয়নবোর্ডে আমির আলি সরকার সাহেবের সমর্থন করিত। মেয়ে বিবাহ করিতে না পারিলেও সে সরকার সাহেবকে শ্বশুরের মতই সম্মান করিত। সুতরাং ঐ ঋণের ব্যাপার লইয়া নাড়া-চাড়া করা সরকার সাহেব উচিত মনে করেন নাই।

সরকার সাহেব সেদিন তাড়াতাড়ি এশার নমায পড়িয়া অল্প চারটা খাইয়া শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন শরীরটা ভাল নয়। বাহির বাড়ির সমাগত লোকজনেরা চোখ ঠারাঠারি করিয়া বলিল: এতদিনের প্রেসিডেন্টির তখ্‌ত হারাইলে কার না শরীর খারাপ হয়?

বিবি সাহেব আন্তরিক দরদ দেখাইয়া এবং মাথায় তেল মালিশ করিতে হইবে কিনা ইত্যাদি খোঁজ খবর করিয়া নিজেও শুইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সরকার সাহেব শুইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। বিবি সাহেব পুছ করিলেন: উঠলেন কেন? বাইরে যাবেন?

সরকার সাহেব জানাইলেন, তিনি এক ছিলিম তামাক খাইবেন। পালঙের নীচেই চিলিম-দানিতে কল্‌কি সাজা ছিল। বালিশের নীচে হইতে দিয়াশলাই লইয়া একটি চিলিম ধরাইয়া ফুঁ দিতে লাগিলেন। বাহিরে বাতাস আছে বুঝিয়া চিলিম হাতে তিনি বারান্দায় আসিলেন এবং চিলিম হাতে হাত দোলাইয়া টিক্কা ধরাইতে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন।

তিনিই না হয় যামিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমির আলি ত তার দেনার কথা ভুলে নাই। সে এক পয়সাও দেনা শোধ করে নাই কেন? সে জানিত সে নিজে টাকা না দিতে পারিলে সরকার সাহেবকেই টাকা ভরিয়া দিতে হইবে। তবে কি সে ইচ্ছা করিয়াই এই দেনা শোধ দেয় নাই? খুব সম্ভব। খুব সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই। সরকার সাহেবকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার এটা একটা ষড়যন্ত্র। নইলে সে টাকা দেয় না কেন? টাকা নাই বলিয়া? উপরাউপরি কয়েক বছর ধরিয়া আমির আলির কারবারে লোকসান যাইতেছে, এটা সরকার সাহেব শুনিয়াছিলেন এবং অন্তরে অন্তরে খুশীই হইয়াছিলেন। তার কয়েকটা পাঁজা কম পোড়া হইয়াছে, তাতে ফাষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস ইট একটাও বাহির হয় নাই। কয়েকটা পাঁজা একেবারে ঝামা হইয়া গিয়াছে। এতদিন এইসব কথা সরকার সাহেব যা শুনিয়াছিলেন, আজ তার সত্যতায় সরকারের সন্দেহ হইল। এসবই দেনা না দিবার মতলবে বানাওট কথা। আমির আলিই নিজের লোক দিয়া এসব গুজব রটাইয়াছে। মতলব, সরকার সাহেবকে দিয়া তাঁর দেনা শোধ করান। তাই যদি না হইবে, তবে এতদিন দেনা শোধ করে নাই কেন? লোকসান যদি হইয়াই থাকে, তবে না হয় দুই বৎসর যাবৎই হইতেছে। তার আগের টাকাগুলা? মিলিটারি সাপ্লাই দিয়া এক লাখের মধ্যে সে পঁচাত্তর হাজার লাভ করিয়াছে নিশ্চয়। দরে বেশী নিয়াছে, গণতিতে কম দিয়াছে। অত লাভ লইবে না কেন? সে টাকা হইতে দুই হাজার টাকা ব্যাংককে দিতে পারিত না?

সরকার সাহেবের বাড়ি দক্ষিণ খোলা। বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে দক্ষিণ পাড়ায় তাঁর নযর গেল। সেখানে এক বাড়িতে অনেক বাতি জ্বলিতেছে। হাঁ, ওটা নিশ্চয় ইয়াকুব মৌলবির বাড়ি। ওবাড়িতে নিশ্চয় এখন ইলেকশন জিতার উৎসব চলিতেছে। সরকার সাহেবের চোখের সামনে আঠার বছরের প্রেসিডেন্টগিরির গৌরবময় স্মৃতি পূর্ণিমার চাঁদের মত ভাসিয়া উঠিল এবং এক নিমিষে ইয়াকুব মৌলবি-রূপ রাহু তাকে গ্রাস করিল। সরকার সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইলেন। হাঁ, তাঁর এ পরাজয়ের

জন্য দায়ী একটি ভোট এবং সে ভোট আমির আলির। সরকার সাহেবের চোখ দুটা দূরবীন হইয়া গেল। তিনি সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া ইয়াকুব মৌলবির বৈঠকখানায় উল্লাসকারীদের মধ্যে আমির আলিকে দেখিতে পাইলেন। সেই সবচেয়ে জোরে হো হো করিতেছে।

সরকার সাহেব আর সেদিকে চাহিতে পারিলেন না। তিনি ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। টিক্কা বহুক্ষণ আগেই ধরিয়া গিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া তিনি তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্য দিন তামাক টানিতে টানিতে নল মুখেই তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। কিন্তু আজ তাঁর ঘুম লাগিতেছে না। ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি কেবলই যামিনের কথা ভাবিতেছেন। দু-দশ টাকার ব্যাপার নয়—দুই হাজার টাকা। সুদও ত কম হয় নাই। হাজারখানিক নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে।

তিনি ঘাড় না ফিরাইয়াই দম বন্ধ করিয়া জানিতে চেষ্টা করিলেন বিবি সাহেব ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন কিনা। আজ বিবির কাছে কথাটা পাড়িবেন কি করিয়া? শুনিলে তিনি ত তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিবেন। অমনি ত আমির আলির নাম শুনিতে পারেন না। তার উপর তার যামিনের কথা শুনিলে কি কাণ্ড যে করিয়া বসিবেন, সরকার সাহেব তা অনুমান করিতেও সাহস করিতেছেন না। হারামযাদা আমির আলি শুধু সরকার সাহেবকে আর্থিক ক্ষতির তলেই ফেলে নাই, তাঁর পারিবারিক অশান্তির কারণও সৃষ্টি করিয়াছে। সরকার সাহেব এখন কি উপায়ে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন?

সরকার সাহেব আর হুক্কা টানিতেছেন না দেখিয়া বিবি সাহেব স্বামীর বুকের উপর একটা হাত দিয়া বলিলেন: শরীলটা এখন একটু ভালা লাগতাছে?

সরকার সাহেব এখন একটু একলা চিন্তা করিবার ফুরসৎ খুঁজিতেছিলেন। বিবি সাহেব ঘুমান নাই বুঝিয়া তাঁকে এড়াইবার জন্য জবাব দিলেন: হাঁ, এখন একটু ভালা বোধ করতাছি। তুমি ঘুমাও।

বিবি সাহেব ঘুমাইবার আয়োজন না করিয়া বরঞ্চ স্বামীর দিকে আরেকটু ঘেঁষিয়া আসিয়া বলিলেন: একটা কথা পুছ করবার পারি?

অজ্ঞাত কারণে সরকার সাহেবের মনটা চমকিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন: কি কথা?

বিবি: ঐ যে কোন ব্যাংকের ঐ চিঠিটা। আমির আলির যামিন হওয়ার কথা ওটা কি ওরা লেখছে?

আমির আলির উপর চটিয়া তিনি বাঘ হইয়া ছিলেন। সামনে পাইলেই তিনি তাকে কয়েক ঘা জুতা কশিয়া মারিতেন।

বিবি সাহেবের প্রশ্নে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া হইল। তিনি রাগিয়া শোওয়া হইতে উঠিয়া বসিলেন। স্ত্রীর দিকে তীব্র নযর হানিয়া বলিলেন: আমার সামনে ও-হারামযাদার নাম কইরো না। ওর মত শয়তান বদমায়েশের জেল হওয়া উচিত।

স্বামীর রাগ দেখিয়া বিবি সাহেব ভয় পাইলেন। তিনি বলিলেন: আপনে শান্ত হন, মেযাজ খারাপ করবেন না। আমি ব্যাপারটা বুঝবার পারছি।

স্ত্রী কি বুঝিতে পারিয়াছেন আর না পারিয়াছেন, সেটা লইয়া খোঁচাখুঁচির ইচ্ছা বা মেযাজ সরকার সাহেবের ছিল না। স্বামীর ঐ মেযাজে বিবি সাহেবও অধিক কিছু পুছ করা যুক্তিসংগত মনে করিলেন না।

উভয়ে খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

চার

রোয সকালে উঠিয়া আওয়াল ওক্তে ফজরের নমায পড়িয়া এক গেলাস চাউল-পানি খাইয়া খেত-খোলা দেখিতে বাহির হওয়া ওসমান সরকারের অনেক দিনের অভ্যাস। এটা প্রায় বার মাসই চলে। সাধারণ মেঘ-বৃষ্টি তাঁর এই কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। রাত্রে কার গরু কার খেতের ফসল নষ্ট করিল, বর্ষাকালে আইলের পল্লা ভাঙিয়া কোন্ খেতের পানি শুকাইয়া গেল, কোন্ খেতে চাষের জো হইল, অঘ্রাণ মাসে কার কোন্ খেতের ধান পাকিয়া কাটিবার লায়েক হইল, রোয সকালে তিনি গাঁয়ের সকলের আগে এ সব খবর পান। এ সব ব্যাপারে তাঁর আপন-পর ভেদাভেদ নাই।

ঠিক জো-মত চাষ না করার জন্য, সময়মত ফসল না মাড়াইবার জন্য, খেত-খোলার ঠিকমত তদারক না করার জন্য নিজের চাকর-বাকর ও প্রতিবেশীদেরে তিনি সমান তাম্বি-তিরস্কার করেন। যদি দেখেন, গরুতে কোনও খেতের ফসল খাইতেছে, তবে কার গরু আর কার খেত সেটা বিবেচনা না করিয়া গরু তাড়া করেন এবং গরুওয়ালার বাড়িতে গিয়া গরু ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তিরস্কার ও ভবিষ্যতে না ছাড়ার জন্য হুশিয়ার করিয়া দিয়া আসেন। যদি দেখেন, পল্লা ভাঙিয়া কোনও খেতের পানি চলিয়া যাইতেছে, তবে কার খেত সেটা বিবেচনা না করিয়া হাতের ছাতা-লাঠি ফেলিয়া তহবন্দ মালকাছা মারিয়া কাদায় নামিয়া পড়েন এবং পল্লাটা ঠিকমত বাঁধিয়া দেন।

এই সব কাজে তাঁকে বাড়ি হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইতে হয়। কারণ তাঁর জমি-জিরাত অনেক। মালির কান্দা হইয়া, ঐ ফজুয়ার চর ঘুরিয়া, সেই জয়নালের ভিটা দেখিয়া, শরিফের বাইদ তদারক করিয়া, শিংমারি বিলের পশ্চিম পারের ইটখোলার পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিতে রোয তাঁর দুই ঘণ্টা লাগে। পাঁচ ছয় মাইল রাস্তা হাঁটাও হইয়া যায়।

ততক্ষণ সুরুজ উঠিয়া পড়ে। সারা গ্রাম জাগিয়া যায়। যে দু'চারজন তখনও বাড়ির বাহির হয় না, সরকার সাহেব তাদের বাড়ির আংগিনায় দাঁড়াইয়া সাটাসাটি করিয়া তাদেরে বাড়ির বাহির করেন এবং ঐ দুপুর বেলা তক শুইয়া থাকা গিরস্থের পক্ষে যে খুবই আয়েবের কথা, সে-বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সবাইকে সে বিষয়ে নসিহত করেন। এতে আর কোনও কারণে না হইলেও শুধু সরকার সাহেবের ভয়ে এ অঞ্চলের মরদ-আওরৎ সকলেই সকালে উঠে। প্রবাদ আছে, কোনও নূতন জামাই যদি নয়া বৌকে আরও একটু শুইয়া থাকিতে বলিয়া শাড়ির আঁচল ধরে, তবে নয়া বৌ "না, না, ছাড়েন, সরকার সাব আইসা পড়বেন" বলিয়া আঁচল ছাড়াইয়া দৌড় দেয়।

সরকার সাহেবকে সকলে ভয়ও করে যেমন, ভক্তিও করে তেমনি। গাঁয়ের ছেলে-বুড়া সবাই যেমন তাঁকে 'আদাব' 'সেলামালেক' দেয়, মেয়েরাও

তেমনি তাঁকে ডাকাইয়া দেউড়ির আড়াল হইতে আদাব-সালাম দিয়া নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা জানায়।

এসব করিতে করিতে তাঁর কামলারা হাল লইয়া মাঠে আসিয়া পড়ে। তাদেরে কোন্ খেতে কত চাষ দিতে হইবে, কোন্ খেতে মই দিতে হইবে, কোন্ খেতে কি বুনিতে হইবে ইত্যাদি খুটিনাটি উপদেশ দিয়া তবে তিনি বাড়ি ফিরেন।

বাড়ি ফিরিতে তাঁর সাতটা বাজিয়া যায়। ইতিমধ্যে তাঁর নাশ্তা তৈয়ার হইয়া যায়। চিড়া-নারিকেল গুঁড়া, মুড়ির লাড়ু, মিঠা ঝাল পিঠা এবং সকলের শেষে এক পেয়ালা চা, ইহাই সরকার সাহেবের সকাল বেলার নাশ্তা।

এ নাশ্তার সাথে অবশ্য চাষের কামলাদের কোনো সম্পর্ক নাই। তাদের জন্য খুব সকালে গরম ভাত রান্না হয়। শাক-শুট্কি বাসি তরকারি ও লবণ মরিচ দিয়া পেট ভরিয়া গরম ভাত খাইয়াই কামলারা খেতে কাজ করিতে যায়। খাওয়ার ব্যাপারে এদের দাবিই অগ্রগণ্য। তাদের খাওয়া হইলে পান তামাক দিয়া তাদেরে বিদায় করিবার পর অন্যদের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে অন্যান্যের সাথেই সরকার সাহেবের নাশ্তা হয়।

সেদিন জুম্মাবার। বরাবরের মতই সরকার সাহেব বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। যথারীতি খেত-খামার দেখিয়া রাস্তায় এর-ওর সাথে আলাপ করিয়া বরাবরের নির্দিষ্ট পথে তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন। পূর্ব রাত্রের আমির আলির ব্যাপারটা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন। কারণ অন্য দিকে তাঁর হুশিয়ার নযর রাখিতে হইয়াছে। অ-প্রেসিডেন্টরূপে আজই তিনি প্রথম রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। এতদিন লোকে ওসমান সরকারকে আদাব দিয়াছে, না প্রেসিডেন্টকে আদাব দিয়াছে, এটা পরখ করাই তাঁর আজকার বিশেষ মতলব। বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময়েই একথা তাঁর মনে পড়িয়াছে। সারা পথ ঘুরিয়া এখন তাঁর এই আনন্দ হইয়াছে যে, লোকজনেরা ওসমান সরকারকেই সেলাম করে। যাক, প্রেসিডেন্টি হারাইয়া সরকার সাহেবের তেমন ক্ষতি হয় নাই।

বাড়ির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখেন, হুসেনের বকনটা রহমতের পেঁয়াজ খেতে লাগিয়াছে। ব্যস, আর কোনও কথা নাই। সরকার সাহেব বকনটাকে তাড়া করিলেন। বকনটা লেজ তুলিয়া এক দৌড়ে পাশের বাঁশ-ঝাড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। সরকার সাহেব থামিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। না, আগের মত দম আর তাঁর নাই। বয়স হইয়াছে ত!

এই শীতের দিনেও সরকার সাহেবের ঘাম ছুটিয়া গেল। তাঁর হাঁটু দুইটা অবশ হইয়া আসিল। তিনি সড়কে উঠিয়া একটা চড়ইগাছ-তলায় দাঁড়াইলেন। এতক্ষণ উত্তরের যে কন্‌কনে বাতাসে একটু শীত শীত লাগিতেছিল, সেই হাওয়াটাই এখন ভাল লাগিল। বসিয়া একটু জিরাইবার তাঁর ইচ্ছা হইল। তিনি গাছের একটা উঁচা শিকড়ের উপর বসিলেন।

দুনিয়ার কাজে সরকার সাহেবকে দিন-রাত ব্যস্ত থাকিতে হয়। হায়াত-মওত দিন-আখেরাতের কথা ভাবিবার তাঁর ফুসরৎ হয় না। পাঁচ ওকত নমায তিনি পড়েন বটে, কিন্তু নমাযের মধ্যেও একামত নিয়ত কেরাত রুকু সিজদা দোওয়া-দরুদ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়। তখন হায়াত-মওতের কথা ভাবিবার সময় কই? তাছাড়া, ঐ সব দোওয়া-দরুদের মধ্যেও অনেক সময় যরুরী বিষয়-কর্মের কথা ভাবিয়া লইতে হয়। এত কাজ করিয়া খোদা-রসুল ও হায়াত-মওতের কথা ভাবিবার ফুরসৎ মোটেই পাওয়া যায় না।

আজ এই খোলা মাঠে ঠাণ্ডা বাতাসে একলা এক বিশাল গাছতলায় বসিয়া সেই ফুরসৎ তিনি পাইলেন। আজ একটা ছোট বাছুর তাড়া করিয়া একটা মাত্র খেত পার হইয়াই তিনি হাঁপাইয়া পড়িলেন। অথচ এই সেদিন—বড় জোর দুবছর হইবে—শরিফ মণ্ডলের কাজলা ষাঁড়টাকে শিংমারি বিলের প্রায় তিন দিক গোড়ায় গোড়ায় তাড়া করিয়াছিলেন। আর গায়ের তাকত? আজ এইটুকু দৌড় দিয়াই তাঁর কোমরে ও হাঁটুতে দরদ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই সেদিন—বড় জোর বছর পাঁচেক হইবে—রুশনা গাড়োয়ানের পাট-বোঝাই গাড়িটার চাকা যখন কাদায় আটকাইয়া

গিয়াছিল, [illegible]ইয়া বলী বলদ দুইটাও যখন টানিয়া চাকা তুলিতে পারিতেছিল [illegible] তখন সরকার সাহেব মালকাছা মারিয়া চাকায় কাঁধ লাগাইয়া 'বিস্‌মিল্লাহ্‌ হেইও' বলিয়া একটা ঠেলা মারিতেই পেল-পেল করিয়া চাকা কাদা ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। সে তাকত এখন গেল কোথায়? আজ সরকার সাহেবের সর্বপ্রথম মনে পড়িল তিনি বুড়া হইয়া যাইতেছেন।

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলিল: আদাব হুযুর, ইখানে একলা বইসা আছেন যে?

সরকার সাহেবের ধ্যান ভাঙিল। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতে না চাহিতেই গিরি নাপিত সামনে আসিয়া মাটিতে হাঁটু বিছাইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল: আমি সায়েবের বাড়ি থাইকাই আসলাম। সায়েবের লাগি ইস্তিযার করবার পারলাম না। জুম্মাবার কিনা, সকলেই খেউরি হৈব, সব বাড়িতেই যাওয়া লাগব। সায়েবের বাড়ির সক্কলেই খেউরি হৈয়া গেছে। খালি সায়েবই বাকী। চৈলা গেছিলাম প্রায় রিকাত বেপারীর বাড়ির কাছাকাছি। ঐখান থাইকা দেখলাম সাহেবেরে। তাই ছুইটা আসলাম। ভাবলাম, সায়েবের দরকার আছে কিনা খবরটা লৈয়া যাই। হুকুম হৈলে এইখানেও করবার পারি, আর যদি সায়েবের অসুবিধা হয়, তা হৈলে বাড়িতেও যাইবার পারি। যা হুকুম।

সরকার সাহেব হাসিয়া বলিলেন: না, না, তোর আর অত কষ্ট করা লাগব না। আজ আর আমি খেউরি হমু না।

—বলিয়া সরকার সাহেব মাথার চুলে আঙুল দিয়া কাঁকই করিলেন এবং দাড়ির নীচে গলায় হাত বুলাইলেন। আবার বলিলেন: না, দরকার নাই। আজ থাক। অবসর পাইলে তুই একবার রবিবারে যাইস। এখন তোর নরুনটা বাইর কর ত। নখগুলি কাইটা দে।

—বলিয়া তিনি এক এক করিয়া হাতের নখগুলি দেখিয়া পায়ের ধূলামাখা জুতার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গিরি নাপিত সুপারির খোলের তৈরি ক্ষুরের চাম্‌টি হইতে নরুন বাহির করিয়া সরকার সাহেবের বাঁ হাতটা টানিয়া লইল।

নখ কাটিতে কাটিতে গিরি বলিল : আমির আলি খাঁ সত্যি কি কার নাম জাল করছে, হুযুর ?

একটা নখে নরুন একটু বেশী দাবিয়া গিয়াছিল। সরকার সাহেব মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন : ও হারামযাদার অসাধ্য কিছুই নাই।

গিরি একথার ইংগিত বুঝিল। বলিল : কি সাহস লোকটার! দিনদুপুরে এমন ডাকাতি করে মানুষে ? জাল করবি ত করলি গিয়া এক্কেবারে গাঁয়ের মুরুব্বি গরিবের মা-বাপ সায়েবের নাম ?

সরকার সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। তিনি গিরির চোখে মুখে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন : এ সব তুই কি বক্‌তাছিস্ ? কে কার নাম জাল করছে ?

গিরি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি সরকার সাহেবের মুখের উপর ফেলিল। লোকটা কত মহৎ! অত বড় দুশ্‌মনের বিরুদ্ধেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে চান না। সে মৃদু হাসিয়া বলিল : হুযুর, কথাটা ত আর গোপন নাই। আপনে লুকাইলে কি হৈব। ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে।

সরকার সাহেব ধমক দিয়া বলিলেন : তা বাজুক। তুই শুনলি কই ?

গিরি সরকার সাহেবের ধমকে উৎসাহিত হইয়া বলিল : এ আৎরাফের সকলেই এ কথা কওয়া-বলা করতাছে।

সরকার সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন : আমার বাড়িতে বুঝি এই গল্প শুইনা আইছস ?

গিরি সে কথা স্বীকার করিল, কিন্তু সংগে-সংগেই বলিল, সে আরও অনেক জায়গায় শুনিয়াছে।

সরকার সাহেব চোখ মুখ গম্ভীর করিয়া ধমক দিয়া বলিলেন : খবরদার, ই কথা তুই আর কারো কাছে কইস না। বুঝলি ?

গিরি বুঝিল, কথাটা বেশী জানাজানি হইলে মামলা-মোকদ্দমার অসুবিধা হইবে বলিয়াই সরকার সাহেব এই সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। সে সরকার সাহেবের হিতৈষী। কাজেই অতি সহজেই বলিল : আচ্ছা হুযুর, আমার মুখ দিয়া ই কথা আর বাইর হৈব না।

ইতিমধ্যে নখ কাটা শেষ হইয়াছিল। সরকার সাহেব উঠিয়া বাড়িমুখী রওয়ানা হইলেন। গিরি আদাব দিয়া অন্য রাস্তা ধরিল।

হঠাৎ সড়কের অপর পাশ হইতে শশী স্তার সড়কে উঠিল এবং নুইয়া সরকার সাহেবকে আদাব দিয়াই বলিল: ইটা কি সাংঘাতিক কথা শুনলাম হুযুর? কথাটা কি সাচা?

—বলিয়া শশী সরকার সাহেবের সামনে দাঁড়াইল। সরকার সাহেব হাসিলেন। এমন মজাদার কথাটা আবার উঠিয়াছে দেখিয়া অদূরে গিরিও থামিয়া গিয়াছিল। সেও ফিরিয়া আসিল। তিন জনের জনতা হইল।

সরকার সাহেব রাগিয়া গেলেন। ধমক দিয়া বলিলেন: এই সব বাজে কথা লইয়া থাকস্ বইলাই ত কাজের সময় তরারে ডাইকা পাওয়া যায় না।

কর্তব্যপরায়ণ লোক বলিয়া এ অঞ্চলে শশীর সুনাম আছে। সরকার সাহেব নিজেও একথা অনেকবার বলিয়াছেন। আজকার এ অভিযোগের কোনো কারণ শশী খুঁজিয়া পাইল না। হাত কচলাইয়া বলিল: হুযুর কি আমারে কোনও কাজে ডাকছিলেন?

সরকার সাহেব মুখ ভেংচি দিয়া বলিলেন: আজ বলবি ডাকা লাগব। কাল বলবি দাওয়াৎ দিয়া আনা লাগব। পরশু বলবি পাল্‌কি পাঠান লাগব। কেন রে হারামযাদা, ডাকা লাগব কেন? একটা লাংগলেরও ফাল নাই। সবগুলি জাকান লাগব। চাষ-বাস বন্ধ। এসব দেখস না, ত করস কি? আগাম ধান নিবার বেলা ত খুব উস্তাদ। কাল রাত থাকৃতে গিয়া আমার লাংগল জাকাইয়া দিয়া আসবি। বুঝলি? আর শোন্। যদি তা না পারস, ত আমার ধান ফেরৎ দিয়া আসবি। আমি অন্য স্তার ঠিক করমু।

—বলিয়া সরকার সাহেব হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। শশী-গিরির আদাবের জবাবও দিলেন না।

সরকার-বাড়ির এক কুড়ি লাংগলের মধ্যে সবগুলির ফাল একসংগে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, এটা সম্ভব নয়। এটা সবেমাত্র অঘ্রাণ মাস, এখনই চাষের তাড়াহুড়া লাগিয়াছে, এটাও ঠিক নয়। সরকার-বাড়ির কোনো লোক

শশীকে ডাকিতে গিয়াছিল, এটাও শশী শুনে নাই। তবে সরকার সাহেব নাহক রাগ করেন কেন?

এজন্য শশী গিরির কাছে দুঃখ প্রকাশ করিল।

গিরি শশীকে প্রবোধ দিল। মহাদেবের মত ঠাণ্ডা মানুষ। রাগ করিতে কখনো কেউ দেখিয়াছে? এখন যে কথায় কথায় রাগ করেন, তার কারণটা শশীর বোঝা উচিত। এতদিনের প্রেসিডেন্টিটা গেল। তার উপর আমির আলি খাঁ সরকার সাহেবের নামে পঁচিশ হাজার টাকার এক দলিল জাল করিয়াছে। তাতে শহরের দোকান ক্রোক হইয়াছে। দুচার দিনের মধ্যে বাড়িতেও ঢোল আসিতেছে। এতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে কার? আহা! দেবতার মত ভাল মানুষ। তাঁরেও ভগবান বিপদে ফেলে!

শশী গিরির সংগে একমত হইয়া বলিল: কলিতে আর ধর্ম নাই।

এ সম্বন্ধে দুইজন একমত হইয়া দুদিকে চলিয়া গেল।

পাঁচ

ওসমান সরকার বাড়ি যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন। আমির আলির নামে এই জালের মিথ্যা বদনাম কে রটাইল? আমির আলির দুশ্‌মনের অভাব নাই, এটা ঠিক। অত সব লোকের টাকা তসরুফ করিলে, অত লোকের সর্বনাশ করিলে শত্রু কার না হয়? তারাই নিশ্চয় এই বদনাম রটাইয়াছে। কিন্তু সে কথা কি লোকে বিশ্বাস করিবে? বরঞ্চ লোকে এটাই ভাবিবে যে, ওসমান সরকার নিজের গলা বাঁচাইবার জন্যই এই বদনাম রটাইয়াছেন। এটাই স্বাভাবিক। অন্য লোকের কি ঠেকা পড়িয়াছে ওসমান সরকারের নাম জালের বদনাম রটাইতে? বদনাম রটাইবার দোষটা শেষ পর্যন্ত ওসমান সরকারের ঘাড়েই পড়িবে।

এখন আমির আলি যদি সরকার সাহেবের নামে মানহানির মামলা দায়ের করে, তবে সরকার সাহেব কি জবাব দিবেন? তিনি অস্বীকার করিবেন ত নিশ্চয়ই, কারণ তিনি এ বদনাম রটান নাই। কিন্তু আদালত সে কথা বিশ্বাস করিবে কেন? গিরি নাপিত ত সরকার বাড়ি হইতেই

এ কথা শুনিয়া আসিয়াছে। শশীও হয়ত এমন লোকের কথাই বলিবে যে সরকার বাড়িতেই কথাটা শুনিয়াছে। গুজবের শিকড় শেষ পর্যন্ত সরকার বাড়িতেই দেখা যাইবে।

না, এ গুজব বন্ধ করিতেই হইবে। এ বদনাম যে মিথ্যা, সে কথা ত তিনি নিজে আর আমির আলি ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই এটা বন্ধ করা সরকার সাহেবেরই একার কর্তব্য। সে কর্তব্য কি তিনি করিয়াছেন? কেন করিবেন না? ঐ ত গিরি নাপিতকে ধমকাইয়া দিয়াছেন। সে যাতে ঐ বদনাম আর না রটায় সে সম্বন্ধেও ত তাকে কড়া হুকুম দিয়া দিয়াছেন। শশীকেও বারণ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। তবে তাকেও যে ধমক তিনি দিয়াছেন, ওতেই কাজ হইয়া যাইবে।

কিন্তু আসল কথা, এ মিথ্যা বদনামটা রটাইল কে? তাঁর বাড়ি হইতে যদি এ কথা বাহির হইয়া থাকে, তবে ত—

সরকার সাহেব মাথা চুলকাইলেন। তবে ত ভারি মুশকিলের কথা। মাত্র বিবি সাহেবের সাথেই ত তাঁর এ ব্যাপারে কথা হইয়াছে। তিনি কি স্ত্রীকে বলিয়াছেন আমির আলি সরকার সাহেবের নাম জাল করিয়াছে? না, নিশ্চয়ই বলেন নাই। ও-কথা তিনি বলিতেই পারেন না। তবে তিনি কি বলিয়াছেন? বলিয়াছেন বটে, আমির আলির জেল হওয়া উচিত। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, সে সরকার সাহেবের নাম জাল করিয়াছে? নয়ই বা কেন? ও অর্থ কি হয় না? ঐ কথা হইতে যদি কেউ জাল করার অর্থ করে, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি? কেন সরকার সাহেব ও-কথা বলিয়াছিলেন? দোষ ত তাঁরই। সত্য বটে, আমির আলির মত বেইমানের জেল কেন ফাঁসি হইলেও সরকার সাহেবের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। যে শয়তান উপকারীর মাথায় লাঠি মারিতে পারে, লাখ টাকা হাতে পাইয়াও যে যামিনদারকে ফাঁসাইবার মতলবে দেনা ফেলিয়া রাখে, তার জেল হওয়া উচিত নয় কি?

কিন্তু তাই বলিয়া সেকথার অর্থ হইবে জাল করা, এটা সরকার সাহেব কিরূপে বুঝিবেন? আমির আলি যত বড় বদমায়েশই হোক না কেন, জালের বদনামটা ত মিথ্যা।

অতএব এ বদনাম বন্ধ করিতেই হইবে। বাড়ী গিয়াই বিবি সাহেবের সহিত এর একটা হেস্তনেস্ত করিতেই হইবে। তিনি কেন ঠোঁট লম্বা করিয়া মরদ মানুষের বিষয়-আশয়ে কথা বলিতে যান? এর ফয়সালা না করিয়া তিনি আজ ছাড়িবেন না।

কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া সরকার সাহেবের দৃঢ়তা আর থাকিল না। আস্তে আস্তে সে দৃঢ়তা বেশ ঢিলা হইয়া আসিল। ঘরের বারান্দায় খড়ম ও বদনা-ভরা পানি যথাস্থানে রাখা ছিল। তিনি হাতের লাঠিটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া জুতা খুলিয়া খড়ম পায়ে দিয়া বদনা হাতে বাড়ির পিছন দিকে গেলেন। সেখানকার কাজ সারিয়া উঠানের এক কোণে ওযু করিতে বসিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক কথা ভাবিয়া ফেলিলেন। ঐ মিথ্যা গুজব রটাইবার জন্য বিবি সাহেবকে তিনি বকিবেন ঠিকই, কিন্তু তা করিতে গেলে যামিন হওয়াটা তাঁর স্বীকার করিতে হইবে। সেটা তিনি এখনি করিবেন কি? এতদিন পরে সোজাসুজি সে কথা বলিলে বিবি সাহেব কি মনে করিবেন? তিনি কি ভাবিবেন? কি বলিবেন? কেন এতদিন এ ব্যাপারটা তিনি বিবি সাহেবের কাছে গোপন করিয়াছেন? কথাটা উঠে নাই বলিয়া? ওটার বিষয় একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া? না, এসব যুক্তির একটাও চলিবে না। মাঝখান হইতে একটা অপ্রিয়তা, একটা অশান্তি শুরু হইবে। বাড়ির অশান্তিকে সরকার সাহেব বরাবর ভয় করেন। খোদার ফযলে এযাবৎ বাড়িতে তাঁর কোনো অশান্তি হয় নাই।

কাজেই এখনই কথাটা তুলিয়া কাজ নাই। বাড়ির শান্তি নষ্ট না করিয়া কিভাবে কথাটা গুছাইয়া বলা যাইতে পারে, সেটা ভাবিয়া লইতে হইবে। অত তাড়াতাড়ি কি? তিনি ত আর এখনি কিছু করিতে যাইতেছেন না। ভাবিয়াই বলা উচিত, বলিয়া ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ওযু সারিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, বিবি সাহেব নাশ্‌তা লইয়া তৈয়ার। তিনি চেয়ারের পিঠে-রাখা তৌলিয়াটায় হাত মুখ মুছিয়া বরতনের ঢাকনি উঠাইলেন।

চেয়ারে বসিতে বসিতে বলিলেনঃ ইস্‌, এতগুলা আন্‌ছ কেন? আমি

তোমরারে কতদিন কইছি আমারে অত দিও না। আজকাল কি আর অত খাইবার পারি? সে বয়স কি আর আছে?

বিবি সাহেব মুচকি হাসিয়া বলিলেন: বুড়াও ত খুব বেশী হৈছেন না।

দুজনেই হাসিলেন। সরকার সাহেব খাইতে বসিলেন। খাওয়ার ভংগি দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না নাশ্‌তা বেশী দেওয়া হইয়াছে। অতি অল্পক্ষণেই নাশ্‌তা চৌদ্দ পনের আনা সাবাড় হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বিবি সাহেব চা'র কাপ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন।

সাহেবের খাওয়া একরূপ শেষ হইতেই তিনি চা ঢালিতে লাগিলেন। সরকার সাহেব নাশ্‌তা শেষ করিয়া গেলাসের পানিটুকু এক ঢোকে গিলিয়া ফেলিলেন।

চা ঢালিতে ঢালিতে বিবি সাহেব বলিলেন: আমির আলির ব্যাপারটার কি করবেন?

সরকার সাহেব তৌলিয়া দিয়া মুখ মুছিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁর সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি ও-কথা তুলিবেন না ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু ও-পক্ষ হইতেই যে কথাটা উঠিয়া গেল! এই আক্রমণের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আতের্কা আক্রমণে মানুষের যা হয়, সরকার সাহেবের তাই হইল। কিন্তু তিনি বেসামাল হইলেন না। চিন্তার জন্য একটু সময় লইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন: আমির আলির কোন্ ব্যাপার?

ব্যাপারটা গুরুতর। রাত্রেই ও-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বিবি সাহেবের ইচ্ছা ছিল। সরকার সাহেবের অনিচ্ছা দেখিয়া এবং প্রেসিডেন্টি ব্যাপারে তাঁর মনের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই বিবি সাহেব বিষয়টা আর খোঁচান নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, নাশ্‌তা খাইবার সময় সরকার সাহেব নিজেই কথাটা তুলিবেন। সেজন্য সারা সকাল চিন্তা করিয়া মেয়ে-বৌ-এর সংগে আলোচনা করিয়া একটা পন্থাও তিনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। মেয়ে যায়েদার বুদ্ধিতে বিবি সাহেবের শ্রদ্ধাও আছে বেশ। দামাদ মিঞা কোর্টের কেরানি ছিলেন কিনা। তাঁর কাছে যায়েদা আইন-কানুনের অনেক কথাই শিখিয়াছে।

কাজেই সরকার সাহেব যখন ঐরূপ ভুলিয়া-যাওয়া-গোছের পাল্টা প্রশ্ন

করিলেন, তখন বিবি সাহেবের মেযাজ খারাপ হইয়া গেল। তিনি একটু বিদ্রূপ-মাখা সুরে বলিলেন: যামিনের ব্যাপার ছাড়া আমির আলির সাথে আরও কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?

সরকার সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন: কখখনই না। ঐ হারামযাদার সাথে আবার সম্পর্ক!

বিবি সাহেবের মেযাজ একটু ঠাণ্ডা হইল। তিনি চা'র কাপটা স্বামীর সামনে দিয়া বলিলেন: বেশ। অখন যামিনের ব্যাপারটার কি করতে চান?

একটু ভাবিবার চেষ্টায় সরকার সাহেব চা'র কাপে একটা লম্বা চুমুক দিলেন। কাপটা নামাইয়া রাখিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন: ওর জন্য তুমি মোটেই চিন্তা কইর না। যা হয় একটা করমু আমি।

কাপটা স্বামীর সামনে দিয়া বিবি মেঝেয় পান বানাইতে বসিয়াছিলেন। মেযাজটা তাঁর আবার বিগড়াইবার উপক্রম হইল। সুপারি কাটার শর্তার আওয়ায বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন: আমি জানবার পারি না?

সরকার সাহেব স্ত্রীর গলায় অভিমানের সুর টের পাইলেন। তিনি স্ত্রীকে শান্ত করিবার মতলবে বলিলেন: কেন পারবা না? যখন কিছু করি, তখন নিশ্চয় জানবা।

কিন্তু স্ত্রী শান্ত হইলেন না। বরঞ্চ উল্টা ফল হইল। তিনি রাগিয়া বলিলেন: ওঃ! কইরা জানাবেন? আগে জানাইতে দোষটা কি?

সরকার সাহেব কিছুতেই ব্যাপারটা এড়াইতে না পারিয়া ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। বিরক্তি-মাখা সুরে বলিলেন: তুমি কি করতে কও?

বিবি সাহেব কোনো ভূমিকা না করিয়া বলিলেন: আমির আলির নামে ফৌজদারী মামলা লাগান।

মেয়ে মানুষ এসব ফৌজদারী-দেওয়ানী মামলার কথা শিখিল কোথায়? তিনি বিবি সাহেবের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন: ফৌজদারী? ফৌজদারী করতে যামু কেন?

সরকার সাহেব হঠাৎ থামিয়া গেলেন। প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 'আমির আলি কি অপরাধ করিয়াছে'? কিন্তু হুশিয়ার হইয়া গেলেন।

বিবি সাহেব গলার সুর উঁচা করিয়া বলিলেন : কেন, যে মানুষে আরেক জনের নাম জাল করতে পারে, আরেকজন বুঝি তার নামে ফৌজদারী করতে পারে না? ইয়াদ আলি কইয়া গেল, ফৌজদারী না করলে আমরারই আয়েব হৈব।

ইয়াদ আলি! এরই মধ্যে সেও আসিয়া গিয়াছে! তার সাথে পরামর্শও হইয়া গিয়াছে! ইয়াদ আলি বিবি সাহেবের বোন-পো। সে উকিলের মুহুরি।

সরকার সাহেব কথাটা অন্যদিকে ঘুরাইবার আশায় বলিলেন : ইয়াদ আলি আবার কখন আসছিল?

বিবি সাহেব কিন্তু হটিলেন না। তিনি সংক্ষেপে জানাইলেন, ইয়াদ আলির বোনের বিয়ার কথা কালই ঠিক হইয়াছে। তাই এক দিনের জন্য সে বাড়ি আসিয়াছিল। আজ শহরে ফিরিবার পথে খবরটা দিয়া গেল। তারপরই তিনি আসল কথায় ফিরিয়া আসিলেন। ইয়াদ আলি নাম-করা মুহুরি। তার সাথে পরামর্শ করিয়া বিবি সাহেব ভাল ছাড়া মন্দ করেন নাই। সরকার সাহেব যে কোনও উকিলের সাথে পরামর্শ করিবেন তিনিই এই মত দিবেন। উপসংহারে তিনি বলিলেন : আপনে আর দেরি করবেন না। শীগ্‌গির শহরে গিয়া ফৌজদারী লাগাইয়া দেন।

সরকার সাহেব বড়ই বিভ্রাটে পড়িলেন। হঠাৎ কোনো জবাব তাঁর মুখে যোগাইল না। কথা বলিতে হয় তাই বলিলেন : কথায় কথায় কি ফৌজদারী চলে? ফৌজদারী বড় কঠিন কাজ।

বিবি সাহেব এই দ্বিধার কোনও কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন : কঠিন কেন?

সরকার সাহেব উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন : তোমরা মেয়ে মানুষ ও-সব বুঝবে না।

বিবি সাহেব অনেক সহ্য করিয়াছেন। আর পারিলেন না। বলিলেন : কি! মেয়ে মানুষ কিচ্ছু বুঝে না? হাঁস্‌লি বেইচা কণ্টাকদারি লৈয়া দিছিল কেটা? সে সময় ত মেয়ে মানষের বুদ্ধি আছিল খুব।

এই খোঁটাটা বিবি সাহেব প্রায়ই দেন। কিন্তু সরকার সাহেব এতে চটেন না। কারণ কথাটা সত্য এবং সেজন্য তিনি স্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। যদিও চল্লিশ টাকার হাঁসুলির বদলে সরকার সাহেব আড়াই শ টাকার চেন দিয়াছেন, এবং আরও প্রায় পাঁচ ছ শ টাকার গহনা দিয়াছেন, তবু সরকার সাহেব বলেন এবং মনেও করেন যে, বিবি সাহেবের দেনা তিনি আজও শোধ করিতে পারেন নাই। বিবি সাহেবও তাই মনে করেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে কম-সে-কম তিন হাজার বার এই খোঁটা স্বামীকে তিনি দিয়াছেন। উপকারের এত খোঁটা দিলে চল্লিশ টাকার চেয়ে অনেক বড় উপকার সম্বন্ধেও উপকৃতের মন বিষাইয়া উঠে এবং উপকার অস্বীকার করে। কিন্তু স্ত্রীর উপকার সম্বন্ধে সরকার সাহেবের মন এততেও বিষাইয়া উঠে নাই। তাই সাপের মাথায় ওষুধ দিবার মতই বিবি সাহেব দরকার-মত ঐ খোঁটাটা ব্যবহার করিয়া এবং সরকার সাহেব ঐ দাওয়াইর গুণ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

সরকার সাহেব আমতা আমতা করিয়া বলিলেন: আহা-হা, আমি কি তাই কইলাম নাকি? আমি কইলাম যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী এক কথা না। দেওয়ানীতে হারলেও কোনও দোষ নাই, কিন্তু ফৌজদারীতে হারলে উল্টা জেল হৈতে পারে।

সরকার সাহেব আশা করিলেন এইবার বিবি সাহেব চুপ করিবেন। কারণ স্বামীর পাল্টা জেল হওয়ার নামে তিনি নিশ্চয় ঘাবরাইবেন। স্বামীকে তিনি সত্যই নিজের জানের চেয়েও ভালবাসেন।

কিন্তু সরকার সাহেবের আশা সফল হইল না। বিবি সাহেব বলিলেন: আমরা হারমু কিসের লাগি? আমির আলি পরের নাম জাল করছে, ইটা ত আর মিছা কথা না। এর আবার সাক্ষী-সাবুদ লাগব কেন?

সরকার সাহেব এবার বিপদ গণিলেন। অথচ তিনি এই সোজা প্রশ্নের উত্তরে সোজা জবাব দিতে পারিতেন, আমির আলি জাল করে নাই। কিন্তু পারিলেন না। কারণ এই কথাটা এইভাবে না বলিবার জন্যই তিনি সারাদিন পাঁয়তারা করিতেছেন। আর যাই হোক, তাঁর স্ত্রী তাঁকে

আহাম্মক বা বদমায়েশ মনে করুন, এটা তিনি বরদাশ্‌ত্‌ করিতে রাযী নন।

সরকার সাহেব দেখিলেন, আজ দিনটাই তাঁর খারাপ যাইতেছে। প্রেসিডেন্টি যাওয়ার পর এটাই প্রথম দিন। আমির আলি হারামযাদার ভোটেই তিনি হারিয়াছেন। তার উপর এই যামিনের বোঝা, স্ত্রীর সাথে বিবাদের সূচনা।

না, সরকার সাহেব আজ আর এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলিবেন না। তিনি 'আচ্ছা দেখি' বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ছয়

জুম্মার নমাযের সময় হইয়া আসিল। প্রথমে একজন দুজন করিয়া এবং ক্রমে দল বাঁধিয়া মুসল্লীরা আসিতে লাগিল।

সরকার সাহেব পুকুরের বাঁধানো ঘাটে গোসল করিতে গেলেন। মুসল্লীদের কথাবার্তায় তিনি বুঝিলেন, সকলের মুখে ঐ এক কথা—আমির আলি সরকার সাহেবের নাম জাল করিয়াছে। কেউ কেউ ঘাটে ওযু করিতে আসিয়া, কেউ আবার শুধু আলাপ করিতে আসিয়া সরকার সাহেবের নিকট ঐ বিষয়ে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। সরকার সাহেব লোক বুঝিয়া কখনও হাসিয়া, কখনও ধমক দিয়া, কখনও অন্য কথা তুলিয়া যথাসম্ভব জবাব এড়াইয়া চলিলেন। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গোসল সারিলেন। তৌলিয়া দিয়া গা মুছিতে মুছিতে তিনি অন্দরে ঢুকিয়া পড়িলেন। অন্যান্য দিন তিনি ঘাটে দাঁড়াইয়াই ভাল করিয়া গা মুছিয়া থাকেন। আজ লোকজন দেখিলেই তাঁর ভয় হয়। অন্দরে ঢুকিয়া তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু সংগে-সংগেই তাঁর নিজের উপর রাগও হইল। লোকজন ছাড়া তিনি এক ঘণ্টা থাকিতে পারেন না। হামেশা দুদশ জন লোক তাঁর চারপাশে থাকে, এটাই তাঁর অহংকার। সেই ওসমান সরকারই আজ লোকজন দেখিয়া ভয় পান! এ সব তিনি কি শুরু করিয়াছেন? লোকজন এড়াইয়া তিনি আর কতক্ষণ কতদিন চলিবেন? জবাব ত

একটা দিতেই হইবে। তিনি নিজে কিছু না বলিলে কি হইবে? লোকেরা ত তাদের কাজ করিয়াই যাইতেছে। যে অল্পক্ষণ তিনি পুকুরের ঘাটে ছিলেন, তাতেই তিনি বুঝিয়াছেন, আমির আলির জালের কথা গ্রামশুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এরই মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার কথাও উঠিয়া পড়িয়াছে। তিনি শুনিয়াছেন, দণ্ডবিধি আইনের কোন্ ধারায় মোকদ্দমা চলিবে, কত বৎসর জেল হইবে, এসব কথাও মুসল্লীদের মধ্যে কেউ কেউ আলোচনা করিয়াছে। কেউ কেউ মন্তব্য করিয়াছে, আমির আলি যে একদিন লাল দালানে যাইবে, এটা তারা আগেই জানিত।

মসজিদে সরকার সাহেব সকলের পরে গেলেন। পিছনের কাতারে দাঁড়াইলেন। নমায শেষে সকলের আগে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া অন্দরে ঢুকিলেন। এইভাবে তিনি লোকজন এড়াইয়া চলিলেন। কিন্তু তিনি যতই লোকজন এড়াইতে লাগিলেন, লোকজনেরাও ততই নিঃসন্দেহ হইতে লাগিল। তারা ধরিয়া লইয়াছে, এরমধ্যে বলিবার আছেই বা কি? একটা লোক সরকার সাহেবের মত ভাল মানুষের নাম জাল করিয়া দশ বিশ হাজার টাকার দলিল করিয়া ফেলিয়াছে, সরকার সাহেব যত বড় লোকই হোন না কেন, ভাবনায় পড়িয়াছেন নিশ্চয়। গল্প-গোযারি কি আর ভাল লাগে?

কেউ বলিতেছে: কিন্তু যাই বল লোকটা কি চাপা! এতবড় বিপদ, তবু লোকটার মুখে একটু হায়-পস্তানি শুনিয়াছ? আমির আলি খাঁ এত বড় দুশ্‌মনিটা করিল, তবু বিরুদ্ধে একটা কথা বলেন?

আরেকজন বলিতেছে: আরে তোমরা বুঝিবে কি? এটা ত আর আমরা-তোমরার মত চাষা-ভূষার কাজ নয় যে শুধু গর্জন করিব, বর্ষণের সময় ফাঁকা। এটা ওসমান সরকারের কাজ। তুফানের আগে দেয়া ঐরকম থমক মারিয়াই থাকে। দেখিয়া লইও আমির আলিকে এমন শিক্ষা উনি দিবেন, আমির আলির চৌদ্দ পুরুষও যা দেখে নাই।

দিনটা কাটিল সরকার সাহেবের বড়ই খারাপ। বাহিরে গেলে লোকজন প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া উত্যক্ত করে। বাড়িতে থাকিলে বিবি ফৌজদারী লাগাইবার তাগাদা করেন।

অগত্যা তিনি খাতা-পত্র লইয়া ঘরে বসিলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের এত বৎসরের হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে। খাতা-পত্র পরীক্ষা করা দরকার। কথা বলিবার বা বাহিরে যাইবার অবসর নাই।

কথাটা খানিকটা সত্য এবং খাতা-পত্র লইয়া তিনি বসিলেনও। কিন্তু খাতায় মন বসাইতে পারেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবেন, মাথায় দাড়িতে হাত বুলান। কি এখন তাঁর করা উচিত? এমন বিপদে যে তিনি সত্যই জীবনে আর পড়েন নাই।

আমির আলির বিরুদ্ধে এই যে মিথ্যা বদনাম বাহির হইয়াছে, এটা বন্ধ করিতেই হইবে এবং তিনি তা যে করিবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমির আলি যত বড় বদমায়েশই হোক্ না কেন, সরকার সাহেব ত তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিতে পারেন না। তা তিনি অবশ্য করেনও নাই। কিন্তু লোকেরা বুঝিবে তিনিই এটা করিতেছেন। অন্য লোকেরা না হয় কিছু জানে না। কিন্তু আমির আলি শুনিলে কি মনে করিবে? মানহানি লাগাইলে বিপদ ত আছেই। আর মানহানি যদি নাও লাগায়, তবু সে সরকার সাহেব সম্বন্ধে কি ধারণা করিবে? সরকার সাহেবের একটা সুনাম আছে। আমির আলি সরকার সাহেবের যতই দুশ্‌মনি করুক, মনে মনে সে সরকার সাহেবকে সৎ বলিয়াই জানে। সেই আমির আলির নযরে সরকার সাহেব নিজেকে ছোট করিতে পারেন না। অতএব তিনি এ গুজবের প্রতিবাদ করিবেনই।

প্রশ্ন শুধু এই যে, কখন করিবেন, কিভাবে করিবেন? সেইটা ঠিক করিতে করিতে এদিকে কথা বাড়িয়া যাইতেছে, এটাও ঠিক। কিন্তু তিনিও ত আর যা তা বলিয়া ফেলিতে পারেন না। স্ত্রীর মনের দিকে চাইতে হইবে; পারিবারিক শান্তির দিকে নযর রাখিতে হইবে। এসব নষ্ট করিয়া তিনি মূঢ়ের মত যা তা বলিতে যাইবেন কেন? আমির আলির সুনামের জন্য? সে হারামযাদা কি ঐ বিবেচনার যোগ্য? সরকার সাহেবের সাথে কী নিমকহারামি সে না করিয়াছে! এই হারামযাদার জন্য তিনি পারিবারিক সুখশান্তি চিরজীবনের জন্য নষ্ট করিতে যাইবেন? শুধু আমির আলির

প্রতিই সরকার সাহেবের কর্তব্য আছে? নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের প্রতি কি তাঁর কোনো কর্তব্য নাই? সরকার সাহেব ত আর দায়িত্বহীন লোকের মত কাজ করিতে পারেন না।

কিন্তু দেরিই বা আর কত করা যায়? ইতিমধ্যেই কি যথেষ্ট দেরি হইয়া যায় নাই? আগে যেখানে একমুখের কথার একটা প্রতিবাদ করিলেই চুকিয়া যাইত, এখন সেখানে দশ মুখের কথার দশটা প্রতিবাদ করিতে হইবে। কাজেই গতকালই এটার প্রতিবাদ করা তাঁর উচিত ছিল।

সরকার সাহেবের সততা, ধর্মভাব ও নীতিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তিনি কেন এই মিথ্যা বদনাম বাড়িতে দিতেছেন? কেন দুইদিন ধরিয়া বলি বলি করিয়াও সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া দিলেন না? তিনি মনের তলায় ডুব দিয়া দেখিলেন, নিজের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে। প্রথম যখন তিনি গিরি নাপিতের মুখে ঐ কথা শুনেন, তখন সোজাসুজি প্রতিবাদ করেন নাই কেন? তিনি তাকে ধমক দিয়াছেন, আর ও-কথা বলিতে বারণও করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ওটাই কি যথেষ্ট? তিনি কেন গিরিকে বলেন নাই, 'জালের বদনাম মিথ্যা, আমি ঠিকই দস্তখত দিয়া যামিন হইয়াছি?' কেন তিনি এই সোজা কথাটা তখন বলেন নাই? গিরি নাপিতের মত ছোটলোকের সাথে বিষয়-আশয় লইয়া কি আর আলোচনা করিবেন—এই জন্য কি? এখন সরকার সাহেব মনকে এই প্রবোধই দিতেছেন বটে, কিন্তু আসল কথা কি তাই? সরকার সাহেবের স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, গিরির প্রথম কথার উত্তরেই তাঁর ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়া দেন, জালের বদনাম মিথ্যা। কিন্তু কিসে যেন তাঁর জিভ আটকাইয়া গিয়াছিল। তাঁর দিব্যি মনে পড়িতেছে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঐ কথাটা চাপিয়া গিয়াছিলেন। কারণ আমির আলির উপর তখনও তাঁর রাগ ছিল। তিনি ঐ বদনাম শুনিয়া বরং খুশীই হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন: বেটা যেমন বদমায়েশ! জালের বদনাম বাহির হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। হোক কিছু শাস্তি শয়তানটার।

গিরি-শশীর কাছে প্রতিবাদ করেন নাই রাগের চোটে। ওসব ছোট-লোকের সংগে বিষয়-আশয়ের আলোচনা করিতে নাই, তাও বোঝা গেল।

কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিবি সাহেবের কাছে সত্য কথাটা বলিতেও ত তাঁর জিভ্ আট্‌কাইয়াছিল। সেটা হইয়াছিল অবশ্য বিবি সাহেবের ভয়ে।

কিন্তু কথাটা ত বিবি সাহেবের কাছে বলিতেই হইবে। তবে আর দেরি করিয়া লাভ কি? না, সরকার সাহেব এখনি এটা শেষ করিয়া ফেলিবেন। এই অনিশ্চয়তার দুটানার মধ্যে তিনি আর থাকিতে পারেন না।

তিনি স্ত্রীকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে বারান্দায় আসিলেন। কারণ হিসাব-পত্রের কাজে কেউ তাঁকে উৎপাত না করে, এই মর্মে তিনি হুকুম জারি করিয়াছিলেন।

বিবি সাহেব বোধ হয় পাকঘরে ছিলেন। তিনি উদ্দেশে ডাকিলেন: এই, কে আছ, বিবি সাবকে এই ঘরে আস্‌তে কও ত।

ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। এতবড় কাজটা এক মুহূর্তের ভাবাবেগে করিয়া ফেলিলেন? পারিবারিক শান্তিতে নিজ হাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন?

কেন, কার জন্য তিনি নিজের এই সর্বনাশ করিলেন?

কল্পনায় আমির আলির মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। সে মূর্তিটা অট্টহাসিতে সরকার সাহেবের সামনে ধেই ধেই নাচিতে লাগিল। করতালি দিয়া সে যেন বলিতে লাগিল: আমার মতলব হাসিল হইয়াছে। ওসমান সরকারের বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিতে পারিয়াছি।

সরকার সাহেব দাঁতে ঠোঁট কামড়াইলেন। না, এটা হইতে পারে না। ঐ শয়তানের মতলব হাসিল হইতে তিনি দিবেন না।

পিছন হইতে বিবি সাহেব বলিলেন: আমারে ডাকছেন?

সরকার সাহেব অমনি ধমক দিয়া বলিলেন: আমারে উৎপাত করতেই বারণ করছি। এক ছিলিম তামাক পাঠাইয়া দিতেও কি বারণ করছি?

বিবি সাহেব জিভে কামড় দিয়া তামাকের হুকুম দিতে চট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সরকার সাহেবের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

সাত

অপরাহ্ন দুইটা। অঘ্রাণ মাসের সুরুজ পশ্চিম দিকে অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছে।

একটি যুবক খুব তেজে সাইকেল মারিয়া শহরের দিক হইতে মুক্তাগাছার সড়ক ধরিয়া পশ্চিম দিকে যাইতেছে। যুবকটির বয়স সাতাশ-আটাশ। পরনে আলিগড়ী পাজামা। সাইকেলের হুইল হইতে বাঁচাইবার জন্য পাজামার খানিকটা মোজার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গায়ে পাঞ্জাবীর উপর পুলওভার, তার উপর গরম কোট। একটা পশমী আলোয়ান মাথায় পাগড়ির মত জড়ানো। ঠাণ্ডার সময়ে বোধ হয় এটা গায়েই ছিল। এখন দুপরের রোদে শীত নাই বলিয়া এবং মাথায় রোদ লাগিতেছে বলিয়া আলোয়ানটা দিয়া পাগড়ি বাঁধা হইয়াছে। যাইতেছেও লোকটা একেবারে সুরুজ মুখে করিয়া। তার চোখ-মুখ ধূলা-মাখা।

সাইকেলওয়ালা যখন কিসমতপুর বাজারের পাশ কাটিতেছে, তখন সড়কের ধারের এক মুদি ডাক দিল: আমির মিঞা, এক ছিলিম তামাক খাইয়া যান।

এইটিই আযমতপুরের আমির আলি খাঁ। আমির আলি সাইকেল না থামাইয়া, কিন্তু বেগ একটু কমাইয়া বলিল: মাফ করবেন, বড় জল্‌দি আছি।

মুদি বলিল: আরে এক মিনিট একটু বইসাই যান না। যরুরী কথা আছে, শুইনা যান।

আমির আলি সাইকেল ঘুরাইয়া মুদির দোকানের সামনে আসিয়া নামিতে নামিতে বলিল: তামাক খাবার রুচিও নাই, সময়ও নাই। বাড়িতে রোগী আছে। সেই সকালে অষুধের লাগি শহরে গেছিলাম, এই ফিরতাছি।

—বলিয়া হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল: ইস্, দুইটার বেশী বাইজ্জা গেছে। কি যরুরী কথা, ভাই?

মুদির নাম হযরত আলি। সে পাঠশালায় আমির আলির ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। সেই খাতিরে আমির আলি শহরে যাতায়াতের সময় এই দোকানে বসে, তামাক খায় এবং সময়মত কিছু কিছু জিনিস-পত্রও কিনে। বি-এ-পড়া ইটের কারখানার

মালিক বড়লোক এবং রাস্তার পাশের মুদির দোকানদারের মধ্যে যে দূরত্ব থাকা উচিত, আমির আলি ও হযরত আলির মধ্যে সে দূরত্ব নাই, যদিও উভয়ে উভয়কে 'আপনি' বলিয়া ডাকে।

হযরত বলিল : নামলেনই যখন সাইকেল থাইকা, তখন এক মিনিট বইসাই যান না। বাড়িতে কার অসুখ ?

একটা কাঠের ফালি তুইটা খুঁটির উপর বসাইয়া দোকানের সামনে বেঞ্চি করা হইয়াছে। এখন একটা গাছের ছায়াও এর উপর পড়িয়াছে। আমির আলি বেঞ্চির এক পাশে সাইকেলটা ঠেস দিয়া আরেক পাশে বসিতে বসিতে বলিল : আমার স্ত্রীর।

হযরত চোখে-মুখে বিশেষ সমবেদনা দেখাইয়া বলিল : আপনার স্ত্রীর কী অসুখ ? খুব বেশী কিছু না ত ?

আমির : না, এই পায়ে একটু শোথ দেখা দিছে খালি।

হযরত : ওঃ, ছেলে-মেয়ে হৈব বুঝি ?

আমির একটু সলজ্জ মুচকি হাসিয়া বলিল : জি।

হযরত : আল্লা ভালা রাখুক। অষুধ আনতে গিয়া তবে অত দেরি করলেন কেন ?

আমির আলি : ব্যাংকেও একটু কাজ আছিল। একটা দলিল তামাদি হৈয়া যায়, সেটা ওয়াসিল দিয়া তামাদি রক্ষা করা দরকার।

হযরত : বউএর অসুখ থুইয়া মহাজনের দলিলের তামাদি রক্ষা করতে আজকাল বড়-কেউ যায় না। আপনে বড় বেশী ভাল খাতক আমির মিঞা।

কথা বলিতে বলিতে হযরত তামাক সাজিয়া ফেলিয়াছিল। এইবার সে টিক্কায় ফুঁ দিতে দিতে বাহির হইয়া আসিল এবং বাজু দিয়া ডাবার মুখটা মুছিয়া আমির আলির দিকে বাড়াইয়া দিল। 'আপনে আগে', 'জি না, আপনে আগে' বলাবলির পর আমির আলিই হুক্কাটা হাতে লইল। টিক্কার উপর নযর বুলাইয়া সে বলিল : কি যরুরী কথাটার লাগি আমারে ডাইকা বসাইলেন, তাত কইলেন না।

—বলিয়া হুক্কা টানিতে লাগিল।

হযরত বলিল : কথাটা ত বেশী কিছু না। আমি ত বিশ্বাসই করি না। তবে সকলের মুখেই এক কথা। তাই আপনেরে জিগ্‌গাস না কইরা পারলাম না। আপনের সাথে কি ওসমান সরকারের খুব বেশী আড়াতাড়ি নাকি ?

আমির আলি : কেন ?

হযরত : সরকার সাব নাকি কইয়া ফিরতাছে আপনি তার নাম জাল করছেন। সে নাকি আপনের নামে ফৌজদারী লাগাইয়া ছাড়ব। এ সব কি কথা ?

আমির আলি সত্যই এ সব কথার কিছুই জানিত না। গতকাল প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের পরে রাত্রে বাড়ি ফিরিয়াই ব্যাংকের চিঠি পায়। স্ত্রীর জন্য ঔষধ আনারও দরকার ছিল। অতএব এক কাজে দুই কাজ সারিবার আশায় সে সকালেই শহরে চলিয়া গিয়াছিল। কাজেই সে আসমান হইতে পড়িল। বলিল : কি কাগযে তার নাম জাল করছি বইলা শুন্‌লেন ?

হযরত : কোন ব্যাংকে নাকি সরকার সায়েবের নামে দশ হাজার না পনর হাজার টাকার এক জাল দলিল কৈরা দিছেন।

আমির আলির আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যামিনের দলিল লইয়াই এই কথাটা উঠিয়াছে। ওসমান সরকারকেও তার মতই একটা চিঠি দেওয়া হইয়াছে, ব্যাংক হইতে আমির আমি তা শুনিয়া আসিয়াছে।

সুতরাং আমির আলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল : ওঃ, এই কথা ?

হযরতের বুকটা হাল্‌কা হইল। সে সত্যই আমির আলির হিতৈষী। সকাল হইতে এই কথা শুনিয়া শুনিয়া তার মনটা একটু খারাপই হইয়া গিয়াছিল। এবার নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল : তবে কথাটা একেবারেই মিছা ?

আমির আলি আবার তেমনি হাসিয়া বলিল : এক্কেবারে বাজে। কিন্তু কথাটা রটাইল কে ? আপনে কি সরকার সায়েবের মুখে ও-কথা শুন্‌ছেন ?

হযরত বলিল, সে তা শুনে নাই। কে যে সরকার সাহেবের নিজ মুখে শুনিয়াছে, তাও হযরত বলিতে পারিল না।

আমির : আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন, ওসমান সরকার নিজ মুখে ও-রকম কথা কইতেই পারে না। কইলে তার নিজেরই ফৌজদারীতে পড়ত হৈব।

আমির আলি হাতের ঘড়ির দিকে আবার চাহিয়া বলিল : না ভাই, এইবার উঠতেই হয়।

হযরত : হেঁ ভাই, উঠেন। কথাটা মিথ্যা হৈলেই ভালা।

আমির আলি আস্‌সালামু আলায়কুম বলিয়া দাঁড়াইল। সাইকেলটা হাতে লইয়া বাঁ পা'টা প্যাডেলে রাখিয়া এক ধাক্কায় সাইকেলে উঠিয়া বসিল এবং মাথা ঈষৎ হেঁট করিয়া সাইকেলের গতি বাড়াইয়া দিল।

শিংমারি বিলের পশ্চিমের গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া আমির আলি বড় সড়ক হইতে বাঁ দিকে একটি ছোট সড়কে নামিয়া পড়িল। এটি ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা। আযমতপুর হইয়া এই রাস্তা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে।

প্রায় মাইল খানেক সাইকেল মারিয়া আমির আলি বাড়ি পৌঁছিল।

পাড়ার অজ দক্ষিণের বাড়িটাই আমির আলির। আমির আলি এক-শরিকী মানুষ। বাড়িটিও তার ছোট। কিন্তু ছোট হইলেও সুন্দর। ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার পশ্চিমে একটি খেতের পরেই তার বাড়ি। প্রথমেই ছোট পাঁচ চালা টিনের ঘর। এটি বৈঠকখানা। ঘরটির তিন দিকের টিনের বেড়ায় নীল রং-দেওয়া কাঠের জানালা। সামনের দিকে কাঠের বেড়া। তার প্রত্যেক খোপে দরজা। এগুলিও নীল রং-করা। বারান্দায় একটি হেলানিয়া বেঞ্চি ও কয়েকটি বাদামী টুল। ঘরের মধ্যে এক দিকে একটি পালঙ, অপর দিকে একটি চৌকি। পালঙে তোষক পাতা। তাতে দুইটি গোল বালিশ এওড়া-কেওড়া হইয়া পড়িয়া আছে। চৌকিতে একটি শতরঞ্জি পাতা। চৌকি ও পালঙের মাঝখানে একটি টেবিল ও খান তিনেক চেয়ার ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে।

আমির আলি বৈঠকখানার সামনে থামিল না। সাইকেল চালাইয়া বৈঠকখানা পার হইয়া একেবারে বাড়ির দেউড়িতে গিয়া পৌঁছিল। সেখানে সাইকেল হইতে নামিল এবং ঘণ্টা বাজাইয়া আন্দরে ঢুকিয়া পড়িল।

'বাজান আইছে' 'বাজান আইছে' বলিয়া একটি ছেলে ও একটি

মেয়ে তাকে ঘিরিয়া ধরিল। এদের একটি বছর পাচেক ও একটি বছর চারেকের হইবে। আরেকটি বছর দুয়েকের ন্যাংটা ছেলেও উঠি-পড়ি করিতে করিতে 'বাদানের' কাছে ভিড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সাইকেলটা ঘরের পিঁড়ার সাথে হেলান দিয়া সে পকেটে হাত দিল এবং একটি ছোট ঠোঙা বাহির করিল। ঠোঙার ভিতরে দুইটি আঙুল ঢুকাইয়া এক-এক করিয়া তিনটি লযেঞ্জ বাহির করিল এবং তিন জনের মধ্যে বিতরণ করিয়া ঠোঙাটি পকেটে ফেলিতে গেল। বড় দুইটি শিশু ফস্ করিয়া লযেঞ্জ মুখে পুরিয়া ঠোঙার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল: আমারে আরো, আমারে আরো।

আমির আলি ঠোঙাটি পকেটে ফেলিয়া বলিল: দিন একটার বেশী খাইলে পেটে সাপ হয়। কাল আরেকটা কৈরা পাবা।

—বলিয়া সে বারান্দায় উঠিয়া পড়িল।

তার স্ত্রী যরিনা বারান্দায় বসিয়া রোদ পোহাইতেছিল। যরিনা ভরা পোয়াতি। দুচার দিনের মধ্যেই হইবে। তার হাত-পা-মুখ পানিতে ঢোসা-ঢোসা।

যরিনা সুন্দরী মেয়ে। বয়স বছর বাইশেক। আমির আলি স্ত্রীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। যরিনা সে হাসিতে যোগ দিল না। তার মনটা খুব চিন্তাযুক্ত।

'শরীরটা এখন কেমন লাগতাছে? খাইছ না?' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষায় না দাঁড়াইয়া আমির আলি ঘরে ঢুকিল।

এটাও টিনের পাঁচচালা। বেশ বড়। কাঠের ফ্রেমের উপর টিনের বেড়া। কাঠের দরজা-জানালা নীল রং-করা। জানালায় লোহার গরাদে।

ঘরে বড় একটি পালঙ। পালঙের উপর মোটা তোষক। তোষকের উপর ময়লা কাঁথা বিছানার চাদর রূপে বিছান হইয়াছে। তাতে ছোট-বড় হরেক রকমের বালিশ কাঁথা লেপ এলোমেলোভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

ঘরে জিনিস-পত্রের এবং কাপড়-চোপড়ের অভাব নাই। কিন্তু অযত্নে সবই ময়লা ও বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে।

আমির আলির শরীরটা তার বাড়িরই প্রতিচ্ছবি। সাতাশ-আটাশ বছরের যুবক আমির আলির মুখে যৌবনের চাকচিক্য নাই। মাথার চুলের এবং দুইদিন-আগে-কামানো দাড়ির দুএকটা পাকিয়া গিয়াছে। সে যেন অল্প বয়সে বুড়া হইতে চলিয়াছে।

তার বাড়ি-ঘরও তাই। পাঁচ ছয় বছর আগেও এখানে বাপের আমলের ছোট ছোট ছনের কুঁড়েঘর ছিল। আমির আলির নিজের উপার্জনে ও উদ্যোগে সেখানে এই সুন্দর বাড়ি-ঘর খাট-পালঙ টেবিল-চেয়ার লেপ-তোষক হইয়াছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় বাড়িখানা সারা দিনরাত তক্‌তক্ করিত। বাড়িতে একাধিক চাকর-চাকরানী ছিল। হামেশা লোকজন আসিত, পান তামাক ও চা'র ধুম চলিত।

কিন্তু তিন-চার বছরের বেশী এ বাড়ির যৌবনও টিকে নাই। বছর খানেক হইল এ বাড়ির মালিকের উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। পাঁচ-ছয় বছর আগে আমির আলি খাঁ এ-অঞ্চলের সব চেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিল। শিল্পে-বাণিজ্যে কাপড়ে-চোপড়ে আত্মনির্ভরশীল হইবার আশার বাণী এ অঞ্চলের লোককে সেই প্রথম শোনায়। গরিব জনসাধারণকে শিল্প-বাণিজ্যের মালিক করিবার উদ্দেশ্যে সে সমবায়-শিল্প-সংঘ গঠন করে। সার্কেল অফিসার, এসিস্টাণ্ট রেজিস্‌ট্রার এবং এস-ডি-ও প্রভৃতি রাজকর্মচারীর আস্থা ও সহযোগিতা অর্জন করে। নমিনেশনে ইউনিয়নবোর্ডের মেম্বর হয়। রাজকর্মচারীদের সহায়তায় লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি করে। পঞ্চাশ হাজারের মত টাকা তুলে। অল্পদিনেই সংঘ জীবন্ত হইয়া উঠে। সংঘের কাপড়ে, দা-কুড়ালে, কাঠ ও বেতের জিনিস-পত্রে বাজার ছাইয়া যায়। সংঘ এই অঞ্চলের কর্ম-কেন্দ্রে পরিণত হয়। আমির আলির তারিফে দেশ মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময় হইতেই আমির আলির বাড়ি-ঘরেরও উন্নতি হয়। নিয়ামতপুরের বিখ্যাত ধনী কাঠের ব্যবসায়ী ডেংগু বেপারীর মেয়ে ধরিনাকে সে ধূমধামের সহিত বিবাহ করে। সে-বিবাহে সার্কেল অফিসার, দারোগা, স্কুল-সাবইনস্পেক্টর প্রভৃতি রাজকর্মচারী এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সকলে যোগদান করেন। এর পর আমির আলির সুনাম আরো

বাড়িয়া যায়। তার অবস্থার আরো উন্নতি হয়। বাড়ির পূবদিকে শিংমারি বিলের ধারে বিশাল ইটের কারখানা খোলা হয়। আমির আলি নিজে কৃষকের ছেলে। উচ্চ-শিক্ষিত আদর্শবাদী যুবক। কাজেই অন্যান্য কারখানার মালিকদের মত সে শ্রমিকদেরে শোষণ করিবার পক্ষপাতী ছিল না। সে রাজ যোগালিয়া প্রভৃতি মজুরদেরে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে থাকে। তাতে পুরান কারখানাসমূহের ভাল-ভাল কারিগররা সকলে আমির আলির কারখানায় যোগ দেয়। তার কারখানার ইটের সুনাম সরকারী ও আধা-সরকারী দফতরে পৌঁছে। আমির আলি তাদের একচেটিয়া অর্ডার পাইতে লাগে। আমির আলির কারখানা ফাঁপিয়া উঠে। অন্যান্য কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া উঠা প্রায় বন্ধ হয়।

এই সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ বাজারে শিল্প-সংঘের তৈরী জিনিস-পত্রের বদ্নাম বাহির হয়। শিল্প-সংঘের জিনিস-পত্র চুরি হইতেছে, তহবিল তসরুফ হইতেছে, এই ধরনের কথা রাষ্ট্র হয়। তাতে বিক্রি কমিয়া যায়। জিনিস-পত্র তৈরিও তাতে হ্রাস পায়। কর্মীদের মাহিয়ানা বাকী পড়ে। শেয়ার-হোল্ডাররা টাকা ফেরত চাহিতে লাগে। দেখিতে দেখিতে একদিন হঠাৎ শিল্প-সংঘ বন্ধ হইয়া যায়। যে আমির আলি একদিন সগর্বে রাস্তায়-রাস্তায় সেলাম কুড়াইয়া বেড়াইত, সেই এখন পাওনাদারের তাগাদায় চোরের মত পলাইয়া ফিরে।

এখন শিল্প-সংঘ নাই, সেখানে আছে তসরুফের বদ্নাম ও পাওনাদারের তাগাদা। থাকিবার মধ্যে আছে এখন ইটখোলাটা। তাতেও আগের মত কাজ হয় না। সেখানেও শ্রমিকদের মাহিয়ানা বাকী পড়িয়াছে। যাদেরে ইট-শুর্কি সাপ্লাই দেওয়া হইয়াছে, তাদের কাছে বহু টাকা বাকী পড়িয়াছে। সেগুলিও ঠিকমত আদায় হইতেছে না। সরকারদের রীতিমত মাহিয়ানা দেওয়া হয় না বলিয়া তারাও নিয়মিত তাগাদায় বাহির হয় না। যারা তহসিলে বাহির হয়, তারাও আদায়ী টাকা ভাঙিয়া ফেলে। কিছু বলিলে বলে: মাহিয়ানায় ওয়াসিল দিয়া দিবেন। সব দিকেই কারবারের অবস্থা খারাপ, টাকা-পয়সার টানাটানি।

এমনি সময়ে যরিনা পোয়াতি। খোদার কথলে যরিনা দেড়-দেড় বছরে এক-একটি করিয়া সন্তান দিতেছে। তুইটি ছেলে একটি মেয়ে। সুতরাং সেদিকে ত খুশিরই কথা। আমির আলি স্ত্রীকে অন্তর দিয়া ভালবাসে। পোয়াতির সময় যত্ন কত। তুধ-দই ফল-মূল যা খাইতে চায়, শহর-বাজার হইতে পুঁটলি বোঝাই করিয়া নিয়া আসে। ডাক্তার লাগিয়াই আছে। পেশাব পরীক্ষা হপ্তায় হপ্তায় চলে। এমনিতে চাকর-চাকরানীর অভাব নাই। তাতে আবার পোয়াতি অবস্থা। যরিনার তখন কিছু ধরিতে-ছুইতেই হয় না।

কিন্তু এবার? মাহিয়ানা দিতে পারে না বলিয়া এখন চাকর-চাকরানীরা প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে। একটি চাকর গিরস্তির কাজ দেখে, গরু-বাছুর রাখে এবং অবসর পাইলে ফুট-ফরমায়েশ খাটে। আর বাড়ির মধ্যে? পড়শী মেয়ে আধ-বয়েসী আকাযের মা সম্পর্কে আমির আলির ফুফু হয়। তাই ভাইপোর সংসার রক্ষার মহদুদ্দেশ্যে নিতান্ত দয়া করিয়া যতদিন ছেলে খালাস না হয় ততদিনের মেয়াদে সে রান্না-বাড়ার কাজটা করিয়া দিতেছে।

আর যরিনার চিকিৎসা? এ্যালোপাথির বদলে এবার হোমিওপ্যাথি ধরা হইয়াছে। ডাক্তারের ভিযিট দেওয়ার অসুবিধা এড়াইবার জন্য লক্ষণ রিপোর্ট করিয়া শুধু ঔষধ আনার ব্যবস্থা চলিতেছে।

আট

আমির আলি কাপড়-চোপড় জুতা-জামা খুলিয়া লুংগি পরিয়া খড়ম পায়ে খালি গায়ে ঘর হইতে বাহির হইল। পাকঘর হইতে এক বাটি সরিষার তেল আনিল। ঘরের বারান্দায় একটা জলচৌকি পড়িয়া ছিল। পা দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সেটা যরিনার সামনে আনিয়া তাতে বসিল।

যরিনার মলিন মুখ দেখিয়া তার দয়া হইল। গায়ে তেল মালিশ করিতে করিতে বলিল : শরীরটা কি খুব খারাপ লাগতাছে?

এ প্রশ্ন সে আগেও করিয়াছিল। যরিনা তার জবাবও দিয়াছিল। কিন্তু

আমির আলি শুনে নাই। একই প্রশ্ন দুইবার করায় যরিনা ত্যক্ত হইল। সে অভিমানে বলিল : খুব ভালা লাগতাছে।

আমির আলি গলায় দরদ দিয়া বলিল : তুমি রাগ করছ যরিনা? অসুখ শরীরে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত না খাইয়া থাকলে রাগ ত হৈবই। মেযাজের আর দোষ কি? তোমারে কতদিন কইছি আমি শহরে-বাজারে দূরে কোনোখানে গেলে তুমি আমার লাগি ইন্তেযার কইর না, খাইয়া উইঠ। অন্তত যতদিন এ অবস্থা আছে। জান ত, মা ভুখা থাকলে পেটের সন্তানের কষ্ট হয়।

যরিনার রাগ ততক্ষণে পড়িয়া গিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল : অত বকৃতিতা না কইরা জলদি গোসলটা সাইরা আস। তাতেই পেটের সন্তানের লাভ হৈব বেশী।

আফাযের মা রাঁধিয়া-বাড়িয়া সব ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল। যরিনা ছেলে-মেয়েদের আগেই খাওয়াইয়া দিয়াছিল। আমির আলি গোসল করিয়া আসিলে দুজনে পাকঘরে বসিয়াই খাওয়া শেষ করিল। যরিনা বিশেষ কিছু খাইতে পারিল না। ছেলে-মেয়েরা উঠানে খেলিতে খেলিতে বাপ-মার হাতের লুকমা নিতেছিল। যরিনা বেশীর ভাগ তাদেরে দিয়াই খাওয়া শেষ করিল। আমির আলির সেদিকে নযর ছিল। তারও ভালরূপ খাওয়া হইল না।

খাওয়ার পর আমির আলি নিজেই ছিলিম সাজিয়া হুক্কা তাজা করিয়া তামাক খাইতে চৌকির পাশে বসিল। বসিবার আগে আলনায় ঝুলানো কোটের পকেট হইতে চারটা কমলা বাহির করিয়া নিজের পাশে রাখিল। ইতিমধ্যে যরিনা বাসন-পত্র ধুইয়া রাখিয়া পান বানাইতে বসিল। আমির আলি কমলা কয়টা যরিনার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল : কিছু খাইলা না তুমি, এই কমলা কয়টা এখনি খাইয়া ফালাও। ছেলে-মেয়েরা দেইখা ফালাইলে তোমার আর খাওয়া হৈব না।

যরিনা কমলার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল : তোমার যে কাণ্ড! আমারে রোগী পাইছ নাকি, রোগীর পথ্য লৈয়া আসছ?

—বলিয়া পান সাজিতে লাগিল।

আমির আলি হুক্কায় দম দিতে লাগিল। যরিনা দুই তিন বার স্বামীর দিকে আড় চোখে চাহিয়া একটু কাছে ঘেষিয়া আসিয়া বলিল: যা শুনতাছি ইটা কি সত্য?

আমির আলি চমকিয়া হুক্কার নল হইতে মুখ সরাইয়া যরিনার মুখের উপর নযর করিল। বলিল: কি শুনতাছ?

যরিনা আমতা আমতা করিয়া বলিল: তুমি তা হৈলে কিচ্ছু শুনছ না? রাস্তায় কারো সাথেই কোনো কথাবার্তা হৈছে না?

কথাটা যরিনা নিজের মুখ দিয়া বাহির করিতে সংকোচ বোধ করিতেছিল স্পষ্ট বোঝা গেল।

আমির আলির মনে পড়িল হযরতের কথা। সেই কথা নয় ত? কিন্তু যরিনার মুখ হইতে কথাটা শুনিবার জন্য সে বলিল: কই, তেমন কোন কথা কারো সাথে হৈছে বইলা ত মনে পড়ে না।

যরিনার পেটে কথাটা হযম হইতেছিল না। আমির আলি বাড়ি ফিরিয়াছে অবধি কথাটা তার পেটে জাউ পাকাইতেছিল। কিন্তু সে কিছু লেখাপড়া জানা মেয়ে। স্বামীর ক্ষুধা-পেটে কোন অশুভ কথা বলিতে নাই, সে-জ্ঞান তার আছে। তাই সে এতক্ষণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া কথাটা পেটে রাখিয়াছে। এখন আর সে-সাবধানতার দরকার নাই। তাই বলিল: তুমি নাকি ওসমান সরকারের দস্তখত জাল কইরা কোন্ ব্যাংক থাইকা দশ হাজার টাকা কর্য করছ, ওসমান সরকার নাকি তার লাগি তোমার নামে ফৌজদারী লাগাইছে?

আমির আলি হো হো করিয়া হাসিতে চাহিল যেমন সে হাসিয়াছিল হযরতের দোকানো বসিয়া। কিন্তু এবার হো হো হাসি আসিল না। হাসিটা অস্পষ্ট হইয়া তার মুখে রাগ দেখা দিল। সে স্ত্রীকে বলিল: তুমি এ কথা শুন্‌লা কার কাছে?

যরিনার সন্দেহ বাড়িল। সে ব্যগ্র হইয়া বলিল: কইতাছে ত পাড়ার সবেই। কথাটা কি তবে সত্য?

আমির আলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল : তুমি ইটা বিশ্বাস কর যরিনা? আমি কারো নাম জাল করবার পারি?

আমির আলির সুরে একটা অসহায় ভাব যরিনার কানে গেল। স্বামীর প্রতি তার দয়া হইল। তার মনে পড়িল কিছুদিন ধরিয়া নানা লোকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে নানা কুকথা বলিয়া বেড়াইতেছে। কত লোক বাড়িতে আসিয়া তাগাদা করিয়া তার স্বামীকে দিনরাত উত্যক্ত ও গালাগালি করিয়া যাইতেছে। এমন কি যরিনা নিজেও নিজের গহনা-বেচা টাকা ও বাপের ধার-দেওয়া টাকার জন্য স্বামীকে কড়া কথা শুনাইয়াছে। তার স্বামী মানুষের হাজার হাজার টাকা তসরুফ করিয়াছে, এ কথা অনেকই বলিতেছে। কিন্তু কারো নাম জাল করিয়া সে টাকা ধার করিয়াছে, বা তেমন কাজ তার স্বামী করিতে পারে, এ কথা এতদিন কেউ বলে নাই। আজই হঠাৎ বাঁশ-ঝাড়ের আগুনের মত কথাটা পাড়াশুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যরিনা এ কথা বিশ্বাস করে নাই। যারা এ সব কথা তাকে বলিয়াছে তাদের সাথে সে তর্ক করিয়াছে। কোথায় তারা এ কথা শুনিল এসব জেরাও সে করিয়াছে। কেউ কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে নাই।

তাই যরিনা বলিল : আমি ইটা বিশ্বাস করবার পারি না, তা তুমিও জান।

আমির আলি তেমনি অভিমানের সুরে বলিল ; তবে সত্য কিনা জিগ্‌গাস করলা কেন?

যরিনা এবার হাসিল। বলিল : তোমার মুখ থাইকা 'না' শুন্‌বার লাগি। তুমি কও 'না'।

আমির আলি বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া যন্ত্রের মত বলিল : না।

যরিনা ওতেই খুশী হইল। একটা পান স্বামীর হাতে দিয়া বলিল : তবে কেন ওসমান সরকার তোমার নামে এই তহমত দিতাছে? কারণ কিছু আন্দায করবার পার?

আমির আলি : ওসমান সরকারই যে এই তহমত দিতাছে, তা কেটা কইল?

যরিনার বুকটা মুহূর্তে হাল্‌কা হইয়া গেল। তাই ত! এটা তার এতক্ষণ মনে পড়ে নাই কেন? সে ত আর খোদ ওসমান সরকারের মুখে শুনে নাই।

অজ্ঞাতসারেই তার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল: তাত ঠিকই।

একটু থামিয়া যরিনা আবার বলিল: তবে কিনা—

আমির আলি: তবে কিনা কথাটা রইল কিসের লাগি—এই ত? সেটা আমিও বুঝবার পারতাছি না। তবে—

কৌতুহলে চোখ বড় করিয়া যরিনা বলিল: তবে কি?

আমির আলি তখন ওসমান সরকারের যামিন হওয়ার কথাটা যরিনার কাছে বিস্তারিত খুলিয়া বলিল এবং উপসংহারে বলিল: হৈতে পারে প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে তার বিরুদ্ধে ভোট দিছি বইলা লোকটা ক্ষেইপা গেছে। অথবা কয়েক হাজার টাকা ভইরা দিতে হৈব ভয়ে লোকটা গলা ফসকাবার চেষ্টা করতাছে।

যরিনা: তুমি নিজে টাকা দিতে না পারলে তবে না যামিনদারের ভরতে হৈব। তুমি দেনা শোধ কৈরা দিলে যামিনদারের কাছে ব্যাংক টাকা চাইব কেন?

আমির আলি জিঘাংসার মুচকি হাসি হাসিয়া বলিল,: ব্যাংক বুঝতে পারছে আমি টাকা দিবার পারমু না। তারা ঠিকই বুঝছে। তাই তারা ধরব ওসমান সরকাররেই।

যরিনা: আমরার কারবার কি এতই খারাপ হৈয়া গেছে যে, এই দুই হাজার টাকাও দিতে পারবা না?

আমির আলি দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল: যরিনা, তোমার কাছে আর লুকাইয়া লাভ নাই। ঐ পরিমাণ টাকা দিবারও আমার সাধ্য নাই।

যরিনা চটিয়া গেল। বলিল: তবে আমার টাকার কি হৈব? অন্তত বাজানের টাকাটাও দিবা না?

যেন বিপদ কাটিয়া গিয়াছে এমনি খোলাখুলিভাবে আমির আলি বলিল: কোনো আশা নাই। আমারে তোমরা মাফ কৈরা দেও। আমি বড় কপালপোড়া। এখন কও তুমি, তোমরার সাথেই ঝগড়া করমু, না ওসমান সরকারের সাথে?

যরিনা এক মুহূর্তে পানি হইয়া গেল। সে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল : আমার টাকার কথা তুমি ভুইলা যাও। বাজানের টাকার লাগিও তুমি ভাইব না। ব্যাংকের ব্যাপারটা তুমি আগে মিটাইয়া ফালাও।

আমির আলি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল : তার উপায় নাই। আমারও টাকা নাই, দলিলও তামাদি হৈয়া যায়। আমি ম্যানেজারের সাথে দেখা করছি। ওসমান সরকার ওয়াসিলে দস্তখত না দিলে ব্যাংক দুচার দিনের মধ্যেই মামলা দায়ের কৈরা দিব।

যরিনা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল : ওসমান সরকারের নামেও করব ত ?

আমির আলি দৃঢ়তার সংগে মাথা ঝুঁকাইয়া বলিল : নিশ্চয়। তারে ধরবার লাগিই ত মামলা করতাছে। আমি ত ওয়াসিলে রাযীই আছিলাম।

যরিনা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল : তবে ত ওসমান সরকারেরই টাকা দেওয়া লাগব।

আমির : তারই লাগি ত সে যামিননামা অস্বীকার করতাছে—যদি কৈরা থাকে।

যরিনা : দস্তখত যদি কৈরা থাকে, তবে 'না' করব কেমনে ?

আমির : কইব দস্তখত করছি না।

যরিনা : কেন, দস্তখতের কি সাক্ষী নাই ?

এইখানেই আমির আলির দুর্বলতা। এই জন্যই কথাটা শুনিয়াছে অবধি তার বুকটা দুড়দুড় করিতেছে। একমাত্র সাক্ষী ওমর বেপারী মারা গিয়াছেন। তবু সে-কথা সে অসুস্থ স্ত্রীকে বলিতে সাহস করিল না। ওমর বেপারীর দস্তখত চিনিবার ও প্রমাণ করিবার লোকের অভাব হইবে না। হ্যাণ্ডরাইটিং একস্‌পার্ট আছে, কত কি আছে। যাইবে কোথায় চাঁদ ?

সে স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়া বলিল : আরে, 'দস্তখত করছি না' কইলেই হৈল ? দেশে আইন-আদালত আছে। 'না' কৈরাই বাঁচবার পারলে কেউ আর দেনা স্বীকার করত না।

কথাটায় যরিনার বিশ্বাস হইল। আশ্বস্ত হইল ; কিন্তু নিশ্চিন্ত হইল না। বলিল : খোদা তাই করুক, ওসমান সরকার 'না' কৈরা যেন ছাড়া না পায়।

স্ত্রীর সহানুভূতিতে আমির আলির বুক ভরিয়া গেল। বিশেষত স্ত্রীর ও শ্বশুরের টাকা লইয়া বাড়িতে একটা অশান্তি হইবে বলিয়া তার যে দুশ্চিন্তা হইয়াছিল, সেটা অত সহজে মিটিয়া যাওয়ায় তার বুকে বল আসিল। স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল : তুমি কোনও চিন্তা কৈর না, যরিনা। 'না' যদি সে করেই, তবে তাকে জেলে পাঠাইয়া ছাড়মু। আমার নামে তার ফৌজদারী করা লাগব না, গবরমেণ্ট তার হাতেই হাতকড়ি লাগাব।

ওসমান সরকারের অতটা অনিষ্ট যরিনা কামনা করিত না। কারণ, ওসমান সরকারকে না দেখিলেও সুনাম শুনিয়া শুনিয়া তাঁর প্রতি যরিনার একটা টান আছে। তবু স্বামীর বিপদ নিবারণের একমাত্র উপায় যদি এটাই হয়, তবে সেজন্য দোওয়া করিতেও যরিনা রাযী আছে। স্বামীর চেয়ে বড় স্ত্রীলোকের আর আছে কি ?

নয়

আমির আলি ব্যাংকে খবর লইয়া জানিয়াছে, ওসমান সরকার তামাদি রক্ষার দস্তখত দিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া ব্যাংক মামলা দায়েরের জন্য কাগয-পত্র উকিলের হাওলা করিয়া দিয়াছে। সে এও শুনিয়াছে যে, যামিন-নামার দস্তখত জাল বলিয়া ওসমান সরকার ব্যাংককে জানাইয়া দিয়াছেন এবং এজন্য ওসমান সরকার শীঘ্রই আমির আলির নামে ফৌজদারী মামলাও লাগাইতেছেন।

সুতরাং আর সন্দেহ নাই যে, ওসমান সরকার আমির আলির সাথে লড়িবার জন্য তৈয়ার হইয়া গিয়াছেন। তার মন একথা আগে হইতেই বলিতেছিল। অনেকে তাকে বলিয়াছিল : যাও না বুড়ার কাছে। সকলের মুরুব্বি, তোমারও ত মুরুব্বি। প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে বিরুদ্ধে গেছিলে বইলাই বুড়া রাগ করছে। একটু খোশামুদ করলেই ঠাণ্ডা হৈয়া যাব।

কিন্তু আমির আলি যায় নাই খোশামুদ করিতে। কারণ সে জানিত, লোকটা তার অনুরোধ রক্ষা করিবে না। নাহক আমির আলি কেন যাইবে তার কাছে অপমান হইতে ?

আজ আমির আলি নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছে, না গিয়া সে ভালই করিয়াছে। তার ইয্‌যৎ বাঁচিয়াছে। এখন লড়াই যখন ঘোষণা হইয়া গিয়াছে, তখন লড়াইর জন্য তৈয়ার হওয়াই ভাল।

লড়াইর জন্য তৈয়ার হইতে আমির আলিকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। একদিন আদালতের নাযির পিয়ন, ঢুলী ও নোটিস লইয়া আসিয়া জানাইলেন, ব্যাংক আমির আলির নামে তিন হাজার টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া অগ্রিম ক্রোক চাহিয়াছে এবং আদালত আমির আলির ইটখোলা, বাড়ি-ঘর-জিরাত অগ্রিম ক্রোক করার আদেশ দিয়াছেন।

আমির আলি দস্তখত দিয়া নোটিস রাখিল। ঢুলী নাযিরের হুকুমমত বেদম ঢোল পিটাইল। পাড়ার লোক জমা হইল। তারা জানিয়া গেল, আজ হইতে আমির আলির বাড়ি-ঘর, ইটের কারখানা, জমি-জিরাত, দোকান-পাট সবই ব্যাংকের সম্পত্তি হইয়া গেল।

নাযির চলিয়া গেলেও আমির আলির বাড়ির সামনের ভিড় কমিল না। নিজে আমির আলি বাড়ির মধ্যে গিয়া বিছানা লইল। কিন্তু গ্রামের দরদী লোকেরা আমির আলির অনুপস্থিতিতেই তার বিপদে হায়-আফসোস করিতে লাগিল। হিতৈষীদের বেশীর ভাগ লোকই এই অভিমত প্রকাশ করিল যে, শত শত গরিবের টাকা মারিয়া যে বাড়ি-ঘর ও ইটের কারখানা হইয়াছে, তার পরিণতি যে এই হইবে, তা তারা আগেই জানিত। মাথার উপর আজো খোদা আছেন ত!

যরিনা একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল। স্বামীর কিছুদিনের কথাবার্তায় সে বিপদের জন্য, দুঃখ-কষ্টের জন্য মনকে প্রস্তুত করিতেছিল। কিন্তু সে বিপদ যে এত তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িবে, তা সে ভাবিতে পারে নাই। স্বামীর অব্যবস্থা ও অবিবেচনার জন্য ইতিপূর্বে স্বামীকে অনেকবার সে ফসিহত করিয়াছে, আজও করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অগ্রিম ক্রোকের ব্যাপারে তার স্বামী এতটা এলাইয়া পড়িয়াছে যে, তাকে সামলানোই দায় হইয়াছে। বকাবকি করিবে কি? স্বামীর কষ্ট দেখিয়া তার দয়া হইল। অনেক বলিয়া-কহিয়া রাত্রে তাকে দুই লুক্‌মা ভাত খাওয়াইল।

রাত্রে শোওয়ার পর স্বামীর বুকের উপর একটা হাত রাখিয়া যরিনা বলিল ঃ আমরার বাড়ি-ঘর নাকি আজ থাইকা ব্যাংকের হৈয়া গেল ? আমরারে কি এ বাড়িতে থাকতে দিব না ? আমার খালাস হওয়া লাগাতও কি আমরা এখানে থাকবার পারমু না ?

আমির আলি বুঝিল, স্ত্রীর দুশ্চিন্তা কতদূর গিয়াছে। তার অনুতাপ হইল। এতটা এলাইয়া পড়া তার উচিত হয় নাই। সেই যদি অমন দুর্বল হইয়া পড়ে, তবে ভরা-পোয়াতি স্ত্রীর কি দশা হইবে ? ভয়ে সে বেচারীর ত কোনো অনিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। না, অন্তত রুগ্ন স্ত্রীকে সাহস দিবার জন্যও তাকে দুর্বলতা দূর করিতে হইবে। সে স্ত্রীর দিকে পাশ ফিরিয়া তাকে বুকে চাপিয়া বলিল ঃ তুমি পাগল হৈছ যরিনা ? এ বাড়ি আমরার ছাড়া লাগব না। কেউ আমরারে এ বাড়ি থাইকা তাড়াবার পারব না। তার লাগি তুমি কোনো চিন্তা কইর না।

যরিনা কথা বলিল না। চুপ করিয়া রহিল। আমির আলি বলিল ঃ চিন্তা এর লাগি না। চিন্তা হৈছে ওসমান সরকার যদি ফৌজদারী লাগায়, তবে মামলা চালামু কি দিয়া ? ফৌজদারীতে খরচ অনেক।

যরিনা আশ্বাস দিয়া স্বামীকে বলিল ঃ যেমনেই হোক, মামলার টাকা যোগাড় করাই লাগব। তুমি তার লাগি ভাইব না। এখনো আমার কিছু গয়না আছে। তা বেচলে কত টাকা হৈব ? সোনা-রূপার ত আজকাল খুব দাম।

আমির আলি স্ত্রীর মহত্বে খুশী হইয়া তাকে আরো জোরে বুকে চাপিয়া বলিল ঃ ক গাছা গয়নাই বা তোমার আছে ? সবই ত নিয়া বন্ধক দিয়া থুইছি। না, তোমার গা একেবারে খালি করবার আমি পারমু না।

একটু ভাবিয়া সে আবার বলিল ঃ একটা কথা কই তোমারে। তুমি রাখবা আমার কথা ?

যরিনা অন্ধকারে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল ঃ কি কথা ?

আমির ঃ এই খাট-পালং টেবিল-চেয়ার যদি আমি বেইচা ফালাই, তবে তাতে তোমার আপত্তি আছে ?

যরিনাঃ তোমার মামলার খরচ চালাবার লাগি কোনটাতেই আমার আপত্তি নাই। তবে এগুলি তোমার অত সখের জিনিস। তাই গয়নার কথা কইছিলাম।

আমির আলি স্ত্রীর গালে একটা চুমা দিয়া বলিলঃ গয়না ত তোমার আরো বেশী সখের।

যরিনাঃ গয়না গেলে গয়না করা যায়। কিন্তু এসব জিনিস একবার গেলে সহজে আর করা যায় না।

আমিরঃ তুমি আমি বাঁইচা থাকলে আবার সবই জুটব।

যরিনাঃ আমি ভাবছি, আমার খালাস হৈয়া গেলে এবার আর চাকর-বাকর রাখমু না। আফাযের মারও দরকার নাই। আমি নিজেই রান্নাবান্না করমু। পরের হাতে চাল-ডাল, তরি-তরকারি সবই তসরুফ হয়। সব দিক থাইকা পয়সা বাঁচাইয়া চলা উচিত, কি কও?

আমিরঃ আরে, না না। ওসব কথা তুমি মুখে আইনো না। তোমার শরীরটা আগে ঠিক হোক, তারপর পয়সা বাঁচাবার কথা ভাবা যাব। আফাযের মা আর কত খাব?

যরিনাঃ কিন্তু মামলা শেষ না হওয়া তক কি ইটখোলা চলব না? তবে আমরার চলব কেমনে?

এটা কঠিন প্রশ্ন। আমির আলি নিজেই এখনো তা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে অবশ্য এখন রুগ্ন স্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে-কোন কাজ করিতে রাযী আছে। কিন্তু সে যে-কোন কাজ যে কি, তা আজো সে ঠিক করিতে পারে নাই। ক্রোকী ইটের কারখানা মোটেই চলিবে কি না, সে সম্বন্ধে নিজেরই ঘোরতর সন্দেহ আছে। জালের বদনাম রাষ্ট্র হওয়ার সংগে-সংগে ইতিমধ্যেই কারখানার কাজ অর্ধেক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কয়লাওয়ালা ধারে কয়লা দেয় না, কাঠওয়ালা কাঠ দেয় না, রাজ-মজুররা অগ্রিম বেতন চায়। এভাবে কারবার চলে না। কাজেই কারখানার কাজ একরকম বন্ধই বলিতে হইবে। তার উপর এখন ক্রোক হওয়ায় ওতে আর কাজ চালান যাইবে কিরূপে? তবেই ওদিককার আশা বৃথা। চারদিকেই আমির আলি অন্ধকার দেখিতেছে।

ঐ জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে সে একটিমাত্র আলোর রেখা দেখিতে পাইল। সে আলোর রেখাটি ক্রমে মোটা হইয়া তার অন্তর আলোকিত করিয়া ফেলিল। সে আলো তার নির্দোষিতা। সে জানে সে নির্দোষ। সে ওসমান সরকারের নাম জাল করে নাই। তার বিশ্বাস ওসমান সরকার শেষ পর্যন্ত মিথ্যা মামলা করিবেনই না।

তাই স্ত্রীর সেই কঠিন প্রশ্নের জবাবে সে বলিল: আমার কি মনে হয় জান যরিনা? ওসমান সরকার মামলা কর্তেই সাহস করব না। শেষ লাগাৎ সে আমার সাথে আপস করতেই আসব।

—বলিয়া আমির আলি যরিনাকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরিল, যেন এই ক্ষীণ আশায় সে একজন সংগী চায়। যরিনাও লুচি-মুচি হইয়া স্বামীর বুকে মিশিয়া পড়িল। ভরা পেটের কথা যেন সে ভুলিয়াই গেল। তার শরীরের উত্তাপে স্বামী মনে বল পাইয়াছে এটা যেন সে বুঝিতে পারিল। সেও স্বামীর নির্দোষিতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। এই নির্দোষী লোকটাকেই জেলে দিবার মতলবে লোকেরা তার নামে মিথ্যা ফৌজদারী লাগাইতেছে। তাই মা যেমন করিয়া আক্রান্ত সন্তানকে বুকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, যরিনাও স্বামীকে তেমনি ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল।

গেল আরও দু'চার দিন। ইতিমধ্যে আমির আলি প্রেসিডেন্ট ইয়াকুব মৌলবি, ওসমান সরকারের শত্রুপক্ষের নেতা শরাফত মণ্ডল এবং অন্যান্য অনেক বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীর সংগে দেখা করিয়াছে। তাঁরা সকলেই বল-ভরসা ও উৎসাহ দিয়াছেন। খাট-পালং বিক্রয় করিয়া টাকা-পয়সা তোলার আলোচনাও হইয়াছে। বাড়ি-ঘরের সাথে ফার্নিচার ও তৈজস-পত্র ক্রোক হয় নাই। নোটিস পড়িয়া সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার পর অনেকে সে সব কিনিতে রাযী হইয়াছে। সুতরাং আমির আলি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

একদিন দুপুরে বাড়ি ফিরিয়া সে যরিনার কাছে শুনিল, শ্বশুর সাহেব আসিয়াছিলেন টাকার তাগাদায়। বলিয়া গিয়াছেন আরেক দিন আসিবেন।

আমির আলি মনে মনে রাগিয়া গেল। লোকটার বিবেচনা দেখ।

শ্বশুর হইয়া জামাইর কাছে টাকার তাগাদা দিবার খুব উপযুক্ত সময়ই পাইয়াছে। সে যরিনাকে জিগ্‌গাস করিলঃ মিঞা সাব কি সব শুইনা গেছেন?

যরিনাঃ আমি সব কইছি। অন্যায় করছি নাকি?

আমিরঃ না, অন্যায় আর কি। দুনিয়ার সবাই জানে। শ্বশুর জানলে আর কত মান যাব? শুইনা কি কইল তানি?

ডেংগু বেপারী এ সব কথা শুনিয়া আমির আলির চৌদ্দপুরুষের বুদ্ধি-আক্কেলের পিণ্ডি চট্‌কাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যরিনা ত আর স্বামীকে সে সব কথা শুনাইতে পারে না। তাই মিছা করিয়া বানাইয়া বলিলঃ খুব খানিকক্ষণ আফসোস করল।

—বলিয়াই তার মনে হইল, তিনি ফের দুচার দিনের মধ্যে তাগাদায় আসিবেন। সে কথা জামাইকে বলিতেও যরিনাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাই যরিনা তাড়াতাড়ি শুদ্ধ করিয়া বলিলঃ আবার কাল-পরশু আসব কইয়া গেছে। না আইসা করবই বা কি? তারও ত ঐ অবস্থা। শুনছ ত তুমি সবই?

আমির আলি শ্বশুরের দুরবস্থার কথা জানিত এবং অনেক শুনিয়াছেও। কিন্তু নিজের ভাবনায় যে বাঁচে না, পরের কথা সে আর কি আলোচনা করিবে? কাজেই যরিনার কথার জবাবে সে শুধু একটা হুঁ বলিয়া চুপ হইয়া গেল।

যরিনা ফের বলিলঃ অহো, ভুইলাই গেছিলাম। ঐ ও-পাড়ার যরিফের মা আসছিল। তারে নাকি অন্তত দশটা টাকা দিবা বইলা ওয়াদা করছিলা। সে দুপুর বেলা পর্যন্ত বৈসা থাইকা কান্নাকাটি কৈরা গেল।

আমির আলি বাইরের দিকে চাহিয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না। বুড়ীর দুরবস্থাটা স্বামী সম্যক্ বুঝিল না মনে করিয়া যরিনা আবার বলিলঃ আহা, বুড়ীটার অবস্থা দেখলে মনে বড়ই কষ্ট হয়। পরনে ছেঁড়া কাপড়। কয়দিন যাবত নাকি ঘরে চাল নাই।

আমির আলি তবু কোনো কথা বলিল না। বৃদ্ধ শ্বশুরের রাগত চেহারা,

বুড়ী যরিফের মার কান্না-বিকৃত মুখ আমির আলির চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। ঐ সংগে ভাসিয়া উঠিল কারখানার কর্মহীন শ্রমিকদের এক কাতারের ছবি। এরা সকলেই আমির আলির পাওনাদার। এরাও সকলে টাকার তাগাদায় তার বাড়িতে হানা দিতে আসিবে।

এদের সকলের কাছে আমির আলি অপরাধী। সত্য বটে, ওসমান সরকারের অভিযোগ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্দোষী। কিন্তু এই সব লোকের অভিযোগ? এ সব ত সত্য। এদের সবাইকে ত সে ঠকাইয়াছে। তারই দোষে ত এরা আজ পথে বসিয়াছে। মাত্র একজনের কাছে নির্দোষী হইয়া শত লোকের কাছে অপরাধী হইলে সে নির্দোষিতার দাম কতটুকু? সে কল্পনায় দেখিল, অত অপরাধের অন্ধকারের মধ্যে ঐ একটিমাত্র নির্দোষিতা একটি নিবু-নিবু বাতির মতই টিমটিম করিয়া জলিতেছে এবং তার তেজ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। জমাট-বাঁধা অন্ধকার যেন তাকে দৈত্যের মত গ্রাস করিতে আসিতেছে। ভয়ে তার চোখ বুজিয়া আসিল। আশ্রয়ের জন্য সে যরিনাকে জড়াইয়া ধরিল, ভীত শিশু যেমন করিয়া মাকে আঁকড়াইয়া ধরে।

অন্ধকারে থাকিতে সত্যই তার ভয় হইল। সে নিজে না উঠিয়া যরিনাকে বলিল: হ্যারিকেনটা একটু জ্বালাবা?

যরিনা উঠিল। বালিশের তলা হইতে দেয়াশলাই বাহির করিয়া হ্যারিকেন ধরাইতে-ধরাইতে বলিল: বাইরে যাবা?

সেজন্য আমির আলি বাতি জ্বালাইতে বলে নাই—ভয়ে বলিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে ও-কথা বলিতে তার মন চাইল না। তাই স্ত্রীর অনুমান সমর্থন করিয়া বলিল: হাঁ। তুমিও যাবা?

যরিনা হাঁ বলিল এবং স্বামী-স্ত্রীতে বাইরের কাজ সারিয়া আসিল। ঘরে আসিয়া যরিনা বলিল: পান খাবা? পান তৈরিই আছে।

যরিনা পান দিতে বাটায় হাত দিল। আমির আলি বলিল: ওসমান সরকার আমার পিছে কেন লাগছে, এখন সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যরিনা।

যরিনা পানের বাটা হইতে হাত না তুলিয়াই স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল : কি ?

আমির : শিল্প-সঙ্ঘের সে চেয়ারম্যান হৈতে চাইছিল। শেয়ার-হোল্ডাররা তারে ভোট দিল না। তার সন্দেহ আমিই তার বিরুদ্ধে ক্যান্ভাস করছিলাম। সেই যিদে সে শিল্পসঙ্ঘের তৈরি জিনিসপত্র বয়কটের গোপন চেষ্টা করে। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি ও-বছর হাইস্কুলের ছাত্রদের হাইবেঞ্চ দিবার প্রস্তাব ওসমান সরকার কেন বাতিল কৈরা দিছিল। মুখে কইছিল বটে স্কুল-ফণ্ডে টাকা নাই, কিন্তু আসল মতলবটা ছিল শিল্প-সঙ্ঘ যাতে অতগুলি টাকা না পায়। বাজারের মসজিদটা পাকা করবার যে প্রস্তাব মার্কেট কমিটিতে পাশ হৈয়া আছে, ওসমান সরকার সেটা টাকার অভাবের অজুহাতে চাপা দিয়া রাখছে। আসল মতলব আমার ইটখোলা থাইকা ইট না কিনা। তার নিজের ইটখোলার সব বন্দোবস্ত ঠিক হৈয়া যতদিন সেখানে ইট না হৈতাছে, ততদিন মস্জিদ পাকা হৈব না, এটা তুমি দেইখা নিও যরিনা। আর, এতদিনে সে নিজে ইটের কারখানা খুলতেই বা গেল কেন ? আমার কারখানাটা ফেল করাবার মতলব ছাড়া আর কোনো মতলব তার নাই।

এইরূপে আমির আলি ওসমান সরকারের অতীতের প্রতিটি কাজে একটি করিয়া কুমতলব আবিষ্কার করিল এবং স্পষ্ট দেখিল, এই সব কুমতলব শুধু তারই বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল।

এই লোকটার শত্রুতার ফলেই আমির আলির সমস্ত কারবার ফেল হইয়াছে। এটা তবে সত্য নয় যে, আমির আলির নিজের বুদ্ধির দোষে কারবার ফেল পড়িয়াছে। ওসমান সরকারের মত প্রতাপশালী লোক তার প্রেসিডেন্টি ক্ষমতা খাটাইয়া যদি কোনো কারবারের বিরুদ্ধতা করে এবং তার ভয়ে যদি দেশের লোকও তার সমর্থন করিয়া যায়, তবে সে কারবার টিকিতে পারে কি ?

আমির আলি এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, তার কারবার ফেল পড়িয়া এই যে শত শত লোকের কষ্ট হইল, এর জন্য আমির আলি দোষী নয়, আসল

দোষী ওসমান সরকার। এতদিন আমির আলি নাহক নিজেকে দোষী করিয়া আসিতেছে।

আমির আলির বুকের উপর হইতে একটা ভারি বোঝা নামিয়া গেল। সে প্রফুল্ল মনে বকিয়া যাইতে লাগিল।

খানিক পরে যরিনার নাক ডাকা শুনিয়া বুঝিল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে তখন বকুনি বন্ধ করিল। ভাবিতে লাগিল, ওসমান সরকারটা কি সাংঘাতিক লোক। সে শুধু আমির আলির সর্বনাশ করে নাই। সে এ দেশের সমস্ত গরিব লোককে পথে বসাইয়াছে। জনসাধারণের মালিকানায় যে শিল্প-সংঘ ও ইটের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাও ধ্বংস এই লোকটাই করিয়াছে। জনগণের এতবড় দুশ্‌মন আর হয় না।

পরদিন সকালে বাহিরে যাইবার সময় ইটের কারখানার সামনে দাঁড়াইয়া সে একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। যে কারখানা শ্রমিকদের প্রাণখোলা গানে ও সোরগোলে একদিন সরগরম থাকিত, তাই আজ নিস্তব্ধ নিথর। ইঞ্জিনের গতি বন্ধ হইয়া আছে দেখিয়া আমির আলির মনে হইল, তার নিজের হৃৎপিণ্ডের গতিই যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সে ভয়ে বুকে হাত দিল। আসমানের দিকে চাহিয়া আল্লার কাছে ফরিয়াদ করিল ঃ হে গরিবের আল্লাহ্‌, তুমি একদিন এর বিচার করিও।

আমির আলির মনে হইল কারখানার দুইটি নীরব চিমনি যেন কারখানার দুইটা হাত। কারখানাটা যেন তার হাত দুইটা উঁচা করিয়া আমির আলির এই মুনাজাতের সমর্থনে 'আমিন' 'আমিন' বলিতেছে।

দশ

যত দিন যাইতেছে, ওসমান সরকারের ভাবনা ততই বাড়িতেছে। তিনি লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ কমাইয়া দিয়াছেন; ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে সামনাসামনি মিছা কথা বলিতে হইবে ভয়ে তিনি শহরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু লোক মারফত বলিয়া পাঠাইয়াছেন,

তামাদি রক্ষার জন্য ওয়াসিলের প্রশ্নই উঠিতে পারে না ; কারণ তিনি ঐ যামিননামায় কোনোদিন দস্তখত করেন নাই।

ব্যাংকের ম্যানেজার সে কথা মানেন নাই। তিনিও কাগযে-কলমে কোনো কথা না লিখিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সরকার সাহেবের কথা তিনি আদালতেই বলিবেন, ওসব কথা এখন তিনি শুনিতে প্রস্তুত নন। ব্যাংকের কাগয-পত্রে সরকার সাহেব যামিন আছেন। তিনি ব্যাংকের চাকর মাত্র। কাগয-পত্র দৃষ্টেই তাঁর কাজ করিতে হইবে।

সরকার সাহেব উকিল-মোক্তারের সাথে দেখা-শোনা না করিয়াও লোক মারফত তাঁদের পরামর্শ জিগ্‌গাস করিয়াছেন। সকলেই বলিয়াছেন, দেওয়ানী মামলার জবাবে জালের প্লী নিয়া বিচারের আশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হাকিম জালের প্লীর তেমন গুরুত্ব দিবেন না। তার চেয়ে সংগে-সংগে ফৌজদারী লাগাইয়া দিলে মোকদ্দমায় জোর হইবে। অনেকে স্পষ্টই বলিয়াছেন, ফৌজদারী না লাগাইলে দেওয়ানীতে সরকার সাহেবের জিতিবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সরকার সাহেব কিছু করেন নাই। যতই দিন যাইতেছে, সরকার সাহেবের আইনের পরামর্শ-দাতারা, হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবরা এবং আত্মীয়-স্বজনরা ততই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অধৈর্য হইয়া পড়িতেছেন। সরকার সাহেব শান্তিপ্রিয় ধার্মিক ভালমানুষ। তিনি মামলা-মোকদ্দমার ঝামেলার মধ্যে সহজে যাইতে চান না। সবই ঠিক। পরামর্শ-দাতারা সবই বুঝেন। কিন্তু মামলা যখন শেষ পর্যন্ত লাগাইতেই হইবে, তখন আর দেরি করিয়া লাভ কি ? ফৌজদারী মামলায় তামাদির কোনো প্রশ্ন নাই, এটা ঠিক। কিন্তু মামলা দায়েরে বিলম্ব ফরিয়াদী পক্ষের মামলার খুব বড় ত্রুটি, এ সম্পর্কে সরকার সাহেবকে হুঁশিয়ার করিতে কেউই ছাড়িলেন না।

কিন্তু সরকার সাহেব অটল। তিনি করি-কচ্ছি করিয়া দিন কাটাইতে-ছেন। আর রাতদিন ভাবিতেছেন। এখন কি করা যায় ? আর কি ফিরিবার উপায় আছে ? তিনি নিজ মুখে অবশ্য আজো কারো কাছে বলেন নাই যে, অমির আলি জাল করিয়াছে। কিন্তু লোকে কি শুধু ঠোঁট

দিয়াই কথা বলে? হাসিয়া, মাথা নাড়িয়া, চোখ ইশারায় তিনি ত জালের অভিযোগ সমর্থন করিয়াছেন। দেশের সবাই ত জানিয়াছে আমির আলির বিরুদ্ধে সরকার সাহেব জালের অভিযোগ করিয়াছেন। আমির আলিও ত সে কথা শুনিয়াছে। সে ত স্পষ্ট ভাষায় যুদ্ধ ঘোষণাও করিয়াছে। বলিয়াছে, ওসমান সরকার দস্তখত অস্বীকার করিলে তারে জেলে পাঠাইয়া ছাড়িব।

এত বড় কথা? তিনি যদি দস্তখত অস্বীকার করেনই, তবে সে বেটা কি দিয়া প্রমাণ করিবে? একমাত্র সাক্ষী ওমর বেপারী মরিয়া গিয়াছে। হাতের লেখা? সরকার সাহেব নিজে স্বীকার না করিলে কেউ বলিতে পারিবে না ওটা তাঁর দস্তখত। সরকার সাহেবের স্পষ্ট মনে আছে, দস্তখতটা করিয়াছিলেন তিনি ইংরাজীতে। তখন সবেমাত্র তিনি ইংরাজী দস্তখত শিখিয়াছেন। সেটা ছিল একেবারে কাঁচা হাতের লেখা। এই কয় বছরে সরকার সাহেব অনেকখানি ইংরাজী শিখিয়াছেন। ইংরাজী হাতের লেখাও পাকা হইয়াছে। লেখার ধাঁচই একেবারে বদলিয়া গিয়াছে। হেঃ, প্রমাণ করা অত সহজ কিনা!

তবু বেটা ছোট লোক অত আস্ফালন করে কেন? আস্ফালন দেখিলে সরকার সাহেবের রাগ হয়। ইচ্ছা হয় দেই বেটাকে এত হাত শিখাইয়া। না যদি সরকার সাহেব একবার করিয়া বসেন, তবে সরকার সাহেব কি পারেন না আমির আলিকে জালের অপরাধে জেলে পাঠাইতে? খুব পারেন।

কিন্তু তিনি তা করিতে চান না। তিনি আমির আলির মত অত ছোটলোক নন। আজ হোক কাল হোক, সত্য তিনি স্বীকার করিবেনই। তবে সবদিক সামলাইতে একটু দেরি হইতেছে এই যা।

কিন্তু—কিন্তু অত জানাজানি, অত কথাবার্তার পরেও কি তিনি আর পিছাইতে পারেন? এখন পিছাইলে দেশশুদ্ধ ঢি ঢি পড়িয়া যাইবে না? লোকে তাঁর মুখে থুথু দিবে না? গ্রামের লোক, আত্মীয়-স্বজন তাঁকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা করিবে না? তাঁর মান-ইয্‌যৎ কোথায় যাইবে? এই সব ধন-

দওলৎ, বাড়ি-ঘর তাঁর কি কাজে লাগিবে? বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তাঁকে কি চক্ষে দেখিবে? তিনি কল্পনায় দেখিতে লাগিলেন, রাস্তাঘাটে লোকেরা বলাবলি করিতেছে: শুনিয়াছ ওসমান সরকার কি করিয়াছে? শহরে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, দোকানে-বৈঠকখানায় লোকেরা একজন আর একজনকে জিগ্‌গাস করিতেছে: শুনিয়াছ ওসমান সরকার কি করিয়াছে? এক জায়গার লোকেরা আর এক জায়গার লোকের কাছে পত্র লিখিতেছে: শুনিয়াছ ওসমান সরকার কি করিয়াছে?

সরকার সাহেবের গা কাঁটা দিয়া উঠিল। অত বড় অপমান, অমন সাংঘাতিক দুর্গতি তিনি বরদাশ্‌ত করিতে পারিবেন না। মানুষের উপকার করিয়া তার প্রতিদানে এই দুর্গতি তিনি মানিয়া লইবেন? এ দুর্গতি, এ অপমান কি তাঁর একার? এতে তাঁর পরিবারের, তাঁর সন্তানদের চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে না? শুধু পরিবারেরই বা কেন, তাঁর দলের লোকেরও?

সারা গ্রামের লোককে সরকার সাহেব দুইটি দলে বিভক্ত দেখিতেন। একদল তাঁর পক্ষে, আরেক দল তাঁর বিপক্ষে। যারা তাঁর পক্ষে, তারাই নিরীহ ও সৎলোক। আর, যারা তাঁর বিরুদ্ধে তারা সকলেই বদমায়েশ। এই সৎলোকদেরে জিতাইয়া দেওয়া এবং বদমায়েশদেরে দাবাইয়া রাখা গ্রামের মুরুব্বি হিসাবে সরকার সাহেবের কর্তব্য।

কিন্তু আজ? আজ তিনি নিজের পক্ষের এই সৎলোকদের মুখে চুনকালি মাখাইতে আর ঐ বদমায়েশদের জয়-জয়কার ঘোষণা করিতে যাইতেছেন? না, তা তিনি পারেন না।

তবে তিনি কি করিবেন? ফৌজদারী না লাগাইলেও দেওয়ানীতে ত যবানবন্দী দিতে হইবে। তা হইলে ফৌজদারী না লাগাইয়াই যে সরকার সাহেবের নিস্তার আছে, তা নয়।

সরকার সাহেব দেখিলেন, আজ কাল করিয়া যত তিনি দিন পিছাইয়া দিয়াছেন, ততই তিনি মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। একটা মিথ্যাকে সমর্থন করিতে গিয়া 'আরো দশটা মিথ্যা বলিতে হইয়াছে; সে দশটার সমর্থনে শ'টা। এই ভাবে মিথ্যার জাল বুনা হইয়াছে। এ জাল তিনি আজ ছাড়াইতে

পারিতেছেন না। একটা মিথ্যাকে বারবার একই রকমে বলিতে হইয়াছে কথার মিল রাখিবার জন্য। সে মিল এখন তাঁর জিভের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যরূপ বলিবার উপায় নাই। এখন ওকথা বলিয়াই যাইতে হইবে। সে মিথ্যা ফুলিয়া-ফাঁপিয়া যতই বড় হইতেছে, সরকার সাহেব ওটাকে ততই ফুলাইতে বাধ্য হইতেছেন। কারণ, ওটার দিকে পিছন ফিরিবার উপায় নাই। সাপুড়িয়া যেমন সাপের দিকে পিছন ফিরিতে পারে না, সিংহ-পালক যেমন সিংহের দিকে পিছন ফিরিতে পারে না, সরকার সাহেবও তেমনি তাঁর স্রষ্ট মিথ্যা হইতে মুখ ফিরাইতে পারিতেছেন না। মুখ ফিরাইলেই যেন ওটা তাঁকে ছোবল মারিবে বা ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

তাই সরকার সাহেবের মেযাজ দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে। কথায় কথায় রাগ। একে-ওকে তাম্বিহ্ তিরস্কার। চাকর-বাকরদেরে গালাগালি লাগিয়াই আছে। সকলেই সরকার সাহেবের জন্য আফসোস করে। এমন ঠাণ্ডা মেযাজের মানুষ, হাসি ছাড়া যাঁর মুখে কথা বাহির হইত না, আমির আলি নাম জাল করিয়া সেই লোকটারই মেযাজের কি দশা করিয়াছে! এমন বিপদে পড়িলে মেযাজ কার না খারাপ হয়? তবু লোকটার অন্তর কত ভাল! এখনও আমির আলিকে ফৌজদারীতে দিতে কত আগ-পাছ ভাবিতেছেন।

অবশেষে সরকার সাহেবের ভাই-পো, দোকানের ম্যানেজার এবং মামলা মোকদ্দমার তদ্বিরকার আকবর আলি একদিন মোকদ্দমার কাগয-পত্র লইয়া আসিল। উকিল-মোক্তাররা সব কাগয-পত্র তৈয়ার করিয়া টাইপ করাইয়া রাখিয়াছেন। এখন শুধু সরকার সাহেবের দস্তখতের ওয়াস্তা। সরকার সাহেব নিজে যাইবেন আশায়-আশায় থাকিয়া তাঁরা অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন। সময় চলিয়া যাইতেছে। মামলা খারাপ হইতেছে। ফৌজদারী লাগাইতে হইবে। দেওয়ানীতে জবাব দাখিল করিয়া ষ্টে অর্ডার করাইতে হইবে। কত কাজ বাকী। সরকার সাহেবের আর দেরি করা উচিত নয়।

আকবর যখন সবিস্তারে ঐ সব কথা বুঝাইতেছিল, তখন বিবি সাহেব, যায়েদা ও বউ-মা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন এবং তাঁরাও যেন

নিজ কানে উকিল-মোক্তারের মুখে ঐ সব কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, এমনি ভাবে মাথা ঝোঁকাইতে লাগিলেন।

আকবর তার বক্তব্য শেষ করিলে বিবি সাহেব বলিলেন: এখ্খনি ঐ কাগয-পত্রে সই কৈরা আজই আকবরের হাতে ফেরত পাঠাইয়া দেন।

সরকার সাহেব বিবি সাহেবের দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন: আমারে তোমরা পাগল পাইছ নাকি? না পইড়া কোনো কাগযে দস্তখত দিতে আছে? এগুলি সাপ না ব্যাং আমার দেখতে বুঝতে হৈব না?

বিবি সাহেব দেখিলেন, কথাটা তিনি অন্যায়ই বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি চুপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সরকার সাহেব কাগয-পত্রগুলি টেবিলের উপরে একটা বড় বই চাপা দিয়া রাখিয়া দিলেন।

আকবর দাঁড়াইয়া রহিল। নড়িল না।

কিছুক্ষণ পরে সরকার সাহেব আকবরকে হঠাৎ ধমক মারিয়া বলিলেন: এখনো গেছস্ না? তালগাছের মত খাড়াইয়া আছস্ কেন?

আকবর জানাইল সরকার সাহেব তাকে কিছু বলেন নাই।

সরকার: জনে-জনে কইতে হৈব নাকি? কইলামই ত পইড়া-শুইনা দস্তখত করমু।

আকবর: আমি কি তবে চইলা যামু?

সরকার সাহেব ভেংচি দিয়া বলিলেন: যাবি না ত দোকান চলব কেমনে?

আকবর: কবে এইগুলা নিতে আসমু?

সরকার: আসা লাগব না। আমি কাউরে দিয়া পাঠাইয়া দিমু।

আকবর: কবে?

সরকার সাহেব আগুন হইয়া গেলেন। গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন: তুই আমারে জেরা করতাছস্ নাকি? আমি কোনো বেটার চাকর নাকি? যখন আমার খুশী পাঠাব। কাল-পরশু-তরশু—একমাস পরে। তাতে তোর কি?

আকবর: উকিল-মোক্তার সাহেবরা কৈয়া দিছে কিনা।

সরকার সাহেব গলা তেমনি উঁচা করিয়া বলিলেন: তুই উকিল-মোক্তারের চাকরি করস, না আমার চাকরি করস?

আকবর মর্মাহত হইল। সে মাসিক বেতন পায় বটে, কিন্তু সরকার সাহেব তার চাচা। তিনিও কোনো দিন তাকে চাকর বলেন নাই, সেও কোনোদিন চাকরি করে বলিয়া ভাবে নাই। অল্প বয়সে বাপ-মা মারা যাওয়ার পর সরকার সাহেবই তাকে লালন-পালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, বিবাহ করাইয়াছেন। দোকানের ম্যানেজার করিয়া মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতন দিতেছেন। এজন্য আকবর সরকার সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ। সবাই বলে,—আকবরও স্বীকার করে, ভাতিজার জন্য এতটা আজকাল কেউ করে না। আকবরও কোনোদিন সরকার সাহেবকে চাচা মনে করে নাই—বাপ বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছে।

কাজেই সরকার সাহেবের মুখে 'চাকর' কথাটা তার বুকে ছুরির মত বিঁধিল। সে আর একটি কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আকবর আলি চলিয়া গেলে সরকার সাহেব মামলার কাগয-পত্রগুলি বাহির করিলেন। কিন্তু তাঁর হাত কাঁপিতে লাগিল। সাহস করিয়া তিনি কাগযগুলি খুলিতে পারিলেন না। এই কাগযেই কালির হরফে লেখা সেই সাংঘাতিক মিছা কথাটা! ঐ মিথ্যা কথাটাকেই সত্য বলিয়া সরকার সাহেবকে ধর্মতঃ হলফ করিয়া বলিতে হইবে এবং দস্তখত দিতে হইবে। না, সরকার সাহেব নিজের চোখে ওটা পড়িতে পারিবেন না।

কাগযগুলি গুটাইয়া তিনি আবার টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

সংগে-সংগেই বিবি সাহেব আবার ঘরে ঢুকিলেন। তিনি যেন চটিয়াই আসিয়াছিলেন। গরম মেযাজে বলিলেন: আমির আলি আমার কোন্ পুরুষের পীর-মুর্শিদ হয় যে, তার নামে মামলা করতে অত ভাবতে হৈব?

সরকার সাহেব ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিলেন: আমির আলির লাগি আমি ভাবতাছি, সে কথা তোমাকে কৈল কেটা? আমি কাগযটা পৈড়াও দেখমু না?

বিবি ঃ উকিল-মোক্তাররা করব মামলা। তারা যেটা ঠিক কৈরা দিছে, তাতে আবার দেখবার কি আছে? দস্তখত কৈরা দিয়া আকবরকে এখনি বিদায় কৈরা দেন।

—বলিয়া বিবি সাহেব দোয়াতে কলম ডুবাইয়া কলমটা সরকার সাহেবের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

সরকার সাহেব বিবি সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কমলটা হাতে নিলেন এবং নিজ নাম দস্তখত করিলেন। কোন্ কোন্ যায়গায় সরকার সাহেবের দস্তখত করিতে হইবে, তাতে উকিল-মোক্তারের মহুরীরা দাগ দিয়াই দিয়াছিলেন। সবগুলি দস্তখত হইলে বিবি সাহেব কাগযগুলি গুটাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিবি সাহেব বাহির হইয়া গেলে সরকার সাহেব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, দস্তখত যখন করিতেই হইবে, তখন না দেখিয়া করাই ভাল হইয়াছে। ক্রমে তিনি একটা সোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। রোগীকে জোর করিয়া একটা বেদনার ঔষধ খাওয়াইয়া দিলে পর যদি বেদনা আস্তে-আস্তে কমিতে থাকে, তবে সে রোগীর মনের যে অবস্থা হয়, সরকার সাহেবের মনের অবস্থা হইল ঠিক সেইরূপ। এতক্ষণে তাঁর মনে হইল জোর করিয়া বিবি সাহেব তাঁর দস্তখত আদায় করিয়া তাঁর একটা মাথার বিষ নামাইয়া দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। কারণ, ঐ দুটানায় থাকা সরকার সাহেবের পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল।

যথাসময়ে আমির আলি খাঁর নামে এক নম্বর জালিয়াতি মোকদ্দমা এস-ডি-ওর কোর্টে দায়ের হইয়া গেল। আকবর আলি ফরিয়াদী পক্ষে ইযহার দিল।

এস-ডি-ও সাহেব সরকার সাহেবকে চিনিতেন। তিনি নিজে একবার ওসমান সরকার সাহেবের বাড়ি গিয়াছেন; পূর্ববর্তী এস-ডি-ওদের মুখেও সরকার সাহেবের অনেক তারিফ শুনিয়াছেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ আসামী তলবের আদেশ দিলেন।

ব্যাংকের দেওয়ানী মোকদ্দমায়ও ২নং বিবাদী ওসমান সরকারের পক্ষে

জবাব দাখিল হইল এবং জালিয়াতি সম্পর্কে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হওয়ার কথা জানাইয়া এক দরখাস্তে ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার শুনানি স্থগিত রাখার প্রার্থনা করা হইল।

দেওয়ানী মোকদ্দমা স্থগিত হইয়া গেল।

ফৌজদারীও দেওয়ানী আদালত-শুদ্ধ এক বিরাট চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেরই মুখে এক কথাঃ বাঘে-মহিষে লড়াই। বহুদিন এমন চমকপ্রদ মামলা দেখা যায় নাই।

আদালত-প্রাংগন ছাড়াইয়া শহর, শহর ছাড়াইয়া পাড়াগাঁয়ে বিদ্যুৎ-বেগে এ খবর ছড়াইয়া পড়িল। কিসমতপুর ইউনিয়ন ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমুহে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল।

এগার

শরাফত মণ্ডলরা এ অঞ্চলের বুনিয়াদী ঘর। তাঁরা তিন চার পুরুষ ধরিয়া এ আতরাফের মাতব্বরি করিয়া আসিতেছেন। কাজে-কর্মে, আপদে-বিপদে লোকজনেরা মণ্ডলদেরেই ডাকিত; ধার-কর্য লোকেরা তাঁদের কাছেই করিত; ঝগড়া-বিবাদে, কাযিয়া-ফসাদে পাঁচ গাঁয়ের লোক মণ্ডলদেরই রায় নির্বিবাদে মানিয়া লইত। পুলিশ দারোগা নাযির ইন্‌স্পেক্টর এ অঞ্চলে আসিলে মণ্ডলবাড়িতেই উঠিতেন। মণ্ডলদের কথামত তাঁরা চলিতেন। মণ্ডলদের বৈঠকখানা হামেশা লোকজনে গমগম করিত। এতে মণ্ডলদের খরচও হইত অনেক।

কিন্তু আজকাল মণ্ডলদের সে প্রতাপ আর নাই। ইদানীং এ অঞ্চলের সমস্ত মাতব্বরি ওসমান সরকারের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছে। ওসমান সরকারই এখন এ আতরাফের একচ্ছত্র নেতা। ধনে-দওলতে, হয়বতে-প্রতাপে ওসমান সরকার এখন মণ্ডলদের উপরে। বাধ্য হইয়া মণ্ডলদেরও সে নেতৃত্ব মানিয়া লইতে হইয়াছে।

সেজন্য মণ্ডলরা মনে মনে অসন্তুষ্ট। কিন্তু প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। মণ্ডলদের অবস্থা এখন খারাপ। এই বংশের অতীত উপকার ভুলিয়া

লোকজনেরা এখন নূতন টাকাওয়ালা ওসমান সরকারেরই তোষামোদ করে। মণ্ডলদের বংশ-মর্যাদারও কোন ইয্‌যৎ করে না। সব লোকই নিমকহারাম হইয়া গিয়াছে। টাকার গোলাম সবাই। দুবেলা পোলাও-কোর্মা খাইবার লোভে সরকারী লোকেরাও আজকাল ওসমান সরকারের বাড়িতে গিয়া ভিড় করেন। মণ্ডলবাড়ির সামনে দিয়াই তাঁরা সাইকেল, ঘোড়াগাড়ি ও মোটর হাঁকাইয়া সরকারবাড়ি যান। মণ্ডলেরা এ সব চাহিয়া-চাহিয়া দেখেন এবং নিজেদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

এইসব কারণে মণ্ডলরা ওসমান সরকারের নিন্দা-সমালোচনাতেই অনেক সময় ব্যয় করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার পরে মণ্ডলদের বৈঠকখানায় যে দরবার বসে, তাতে প্রধানত ওসমান সরকারের কুৎসাই হইয়া থাকে। ওসমান সরকারের বাপ-দাদা কি কি নীচ কাজ করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন, কি কি কুকর্ম করিয়া ওসমান সরকার টাকার কুমির হইয়াছেন, ধর্মের কাঠি বাতাসে নড়িয়া অদূর-ভবিষ্যতে কত দিনের মধ্যে ওসমান সরকারের ধন-দওলৎ উড়িয়া যাইবে এবং মণ্ডলদের রাজত্ব আবার ফিরিয়া আসিবে— এই সব আলোচনাই হইল মণ্ডলদের সান্ধ্য দরবারের প্রধান আলোচ্য বিষয়। নিমজ্জমান বুনিয়াদী ঘরের স্বাভাবিক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে মণ্ডলদের মধ্যেও দিনরাত ঝগড়া-ঝাঁটি ও মামলা-মোকদ্দমা লাগিয়াই আছে। কিন্তু এসব ঝগড়া-ঝাঁটি সত্ত্বেও তাঁরা এক ব্যাপারে একমত ও ঐক্যবদ্ধ আছেন। সেটা হইল ওসমান সরকারের বিরুদ্ধতা।

শরাফত মণ্ডলই মণ্ডল পরিবারের বর্তমান নেতা। নেতা মানে তিনিই সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। পারিবারিক কলহের সময়ে কেউ তাঁকে মানে না বটে, এমন কি, অনেক সময় তিনি অন্য শরিকের দ্বারা অপমানিতও হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু পরিবারের বাইরে, রাজনৈতিক ভাষায় পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, শরাফত মণ্ডলই পরিবারের মুখপাত্র বা ফরেন মিনিষ্টার। এই নীতি অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে বরাবর মণ্ডল-পরিবার তলে-তলে ওসমান সরকারের বিরুদ্ধতা করিয়া অর্থাৎ বিরুদ্ধতার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। এতদিন

সফল হয় নাই। কাজেই স্পষ্ট করিয়া বিরুদ্ধতার কথা বলে নাই। শুধু গুমরিয়া মরিয়াছে।

এবার ইয়াকুব মৌলবিকে ওসিলা করিয়া তারা ওসমান সরকারকে গদিচ্যুত করিয়াছে। মণ্ডল-পরিবার ইয়াকুব মৌলবির জয়কে নিজেদের জয় বলিয়াই মনে করে এবং সুবিধামত প্রচারও করে।

ইউনিয়ন বোর্ডে ওসমান সরকারের পরাজয়ের পর-পরই যেদিন শোনা গেল, আমির আলি খাঁর দেনার দায়ে ওসমান সরকারের সম্পত্তি ব্যাংক কর্তৃক ক্রোক হইতেছে, সেদিন মণ্ডলবাড়ির উল্লাস দেখে কে? কিন্তু দুদিন পরেই যখন শোনা গেল, আমির আলি ওসমান সরকারের নাম জাল করিয়া তাঁকে যামিন বানাইয়াছে বলিয়া ব্যাংক ওসমান সরকারের সম্পত্তি ছুঁইতে পারিবে না, বরঞ্চ আমির আলির নামে ওসমান সরকার ফৌজদারী লাগাইতেছেন এবং তাতে আমির আলির জেল হইতে পারে, সেদিন আবার মণ্ডল-বাড়িতে সার্বজনীন বিষাদের ছায়া পড়ে।

মণ্ডলরা একাধিক সান্ধ্য বৈঠকে এই বিষয়টার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁরা একমত হইয়াছেন যে, ওসমান সরকার নিশ্চয় আমির আলির যামিন-নামায় দস্তখত দিয়াছিলেন, আজ সুযোগ বুঝিয়া অস্বীকার করিতেছেন। ওসমান সরকারের মত ধড়িবাজ লোকের পক্ষে সবই সম্ভব। আমির আলি নিতান্ত ভালমানুষ। জাল করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু বেচারা নিতান্ত সাদাসিধা লোক। তাই ওমর বেপারীর মত বুড়া মানুষকে একমাত্র সাক্ষী করিয়াছিল। তার উচিত ছিল অন্তত তিনটা সাক্ষীর দস্তখত লওয়া। আসল কথা, ওসমান সরকারের বরাত। লোকটা গজ-কপালিয়া।

কিন্তু শরাফত মণ্ডল নিজে অত সহজে ব্যাপারটা মিটিতে দিতে রাযী নন। ওসমান দস্তখত করিয়াছিলেন কি করেন নাই, সেটা শরাফত মণ্ডলের ভাবনা নয়। আমির আলি জাল করিয়াছে কিনা, সেটাও তাঁর চিন্তা নয়। তাঁর চিন্তা এই যে, এমন কায়দায় পড়িয়াও যদি ওসমান সরকার বাঁচিয়া যান, তবে সেটা হইবে বড়ই আফসোসের কথা। যদি তা হয়,

তবে তদবিরের অভাবেই তা হইবে। আমির আলিটা একটা গাধা। সে মামলার তদবির জানে কি? শরাফত মণ্ডলের নিজেরই তদবির করিতে হইবে। একটা লোকও কি দস্তখতের সাক্ষী পাওয়া যাইবে না? না, সাক্ষী যোগাড় করিতেই হইবে। যত টাকা লাগে। কিন্তু সাক্ষী পাওয়া যায় কোথায়? হতভাগা ওমর বেপারী একটা পুত্র-সন্তানও রাখিয়া যায় নাই। এ অবস্থায় সাক্ষী খাড়া করা যায় কারে?

শরাফত মণ্ডল সান্ধ্যবৈঠক ত্যাগ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। একাএকা অনেকক্ষণ হুক্কা টানিলেন। অনেক মাথা চুলকাইলেন। রাজ্যশুদ্ধ লোকের কথা ভাবিলেন।

অবশেষে তাঁর মাথায় এক ফন্দি জুটিল। তিনি তাড়াতাড়ি হুক্কাটা ঘরের বেড়ায় হেলান দিয়া রাখিয়া খড়ম ছাড়িয়া জুতা পরিলেন। গায়ের নিমাটার উপর একটা কোট চড়াইয়া আলোয়ানটায় মাথা ঢাকিয়া হাতে একটা লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

পাড়ার এক প্রান্তে ঈদু শেখের বাড়ি। ঈদু শেখ বরাবর গৃহস্থ-বাড়িতে চাকরি করিয়া জীবন কাটাইয়াছে। মোড়ল-বাড়িতেই চাকরি করিয়াছে বেশী। এখন সে বুড়া হইয়াছে। আর গৃহস্থির কাজ-কর্ম করিতে পারে না। তাই বাড়িতে বসিয়া বাঁশের চাটাই ডুলা ডালা বানাইয়া বাজারে বিক্রয় করে। তাতেই কোনোমতে বুড়াবুড়ীর দিন চলিয়া যায়।

শরাফত মণ্ডল এই ঈদু শেখের দেউড়িতে উপস্থিত হইয়া ডাক দিলেন: ঈদু বাড়ি আছ?

ঈদু ঘরের বারান্দায় আয়লার আগুন তাপাইতেছিল এবং হুক্কা টানিতেছিল। শরাফত মণ্ডলের গলার আওয়ায পাইয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

শরাফত মণ্ডল তার কুড়েঘরে! তাও আবার রাত্রির বেলা! খড়ম খট্‌খটাইয়া সে দেউড়ির দিকে আসিতে আসিতে বলিল: কেটা, বড়মিঞা নাকি? আপনে এত রাতে গরিবের তুয়ারে কেন? কি কাজের লাগি? আমারে ডাইকা পাঠাইলেই ত পারতেন।

শরাফত মণ্ডল তাঁর সমস্ত মোড়লী অহংকার ভুলিয়া গলা অতিশয় নরম

করিয়া বলিলেন : তাতে আর হৈছে কি, মিঞা ? তুমি আমার বাড়ি যাবার পার, আমি তোমার বাড়ি আইবার পারি না ? তাছাড়া, যাইতাছিলাম এই পথে, ভাবলাম একবার ঈছুর খবরটা লৈয়া যাই। কার কাছে যেন শুন্‌লাম তোমার শরীলটা খারাপ হৈছে।

ঈছু কৃতার্থ হইয়া বলিল : জি হাঁ বড় মিঞা, ঠিকই শুন্‌ছিলেন। হৈছিল একটু ঘুসঘুসানি জ্বর। অখন সাইরা গেছে। কাশটায় ছাড়ল না। বুড়া মানষের কাশ। ওটায় কি আর ছাড়ব ? লগেলগে কব্বরে যাব।

শরাফত মণ্ডল আন্দাযী তীর ছুড়িয়াছিলেন। ঈছুর অসুখ-বিসুখের কোনো কথাই তিনি শুনেন নাই। ঈছুর মত গরিব বুড়া মানুষের সত্যসত্যই অসুখ হইলেও সেটা শরাফত মণ্ডলের মত বড়লোকের জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া ঈছুর সত্যই কোনও অসুখ হয় নাই। শরাফত মণ্ডল বলিবার আগে ঈছু নিজেই জানিত না যে, তার অসুখ হইয়াছিল। তবে যখন শরাফত মণ্ডলের কান পর্যন্ত কথাটা গিয়াছে, তখন নিশ্চয় কেউ বলিয়াছে। কেউ বলিয়া যদি থাকে, তবে তার কাশের কথাটাই বলিয়াছে। শীতের দিনে বুড়া-মানুষের কাশটায় একটু জোর দেয়ই। তার সংগে গায়ে একটু জ্বর-জ্বর ভাব খুবই স্বাভাবিক। সেই কথা বোধ হয় ঈছু কারও কাছে বলিয়াছিল। সেই কথা গায়ের মোড়লের কানে উঠিয়াছে। সেকথা শুনিয়া মোড়ল সাহেব নিজে যখন খবর লইতে আসিয়াছেন, ঈছুর কি তখন 'না' বলা উচিত ? কাজেই সে স্বীকার করিল যে, সত্যই তার অসুখ হইয়াছিল। সে খুশী হইয়া বলিল : আসছেন যখন মেহেরবানি কইরা, একটু কি বসবেন না ?

শরাফত মণ্ডল : আসছি যখন, তখন তোমার শরীলটার খবর লৈয়াই যাই।

'তবে বাড়ির ভিতরে আসেন'—বলিয়া ঈছু মোড়লকে বাড়ির মধ্যে উঠানে লইয়া গেল এবং একটা জলচৌকি আনিয়া বসিতে দিল।

ঈছুর স্ত্রী পাকঘরে রান্না করিতেছিল। সে মোড়লের সামনে আসিয়া বলিল : সেলাম বড় মিঞা, কাঙালের দুয়ারে হাতির পাড়া ! আমরার অত বরাত ! একটু পান-টান দিমু ?

মোড়ল সাহেব : না না, অখন আর পান-টান খামু না। ঈদু তামাক সাজ্‌তাছে, তাই দু-এক টান খামু। তুমি তোমার পাক-শাকে গিয়া মন দেও।

বুড়ী আবার রান্নাঘরে ঢুকিল। ঈদু তার আয়লা হইতে ঘসির আংরা তুলিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া মোড়ল সাহেবের সামনে ধরিল। মোড়ল সাহেব ঈদুকে না সাধিয়া বিনা-বাক্যে হুক্কা হাতে নিলেন। কল্‌কির আগুন ঠিক হইয়াছে কিনা এক নযর দেখিয়া লইয়া হুক্কার মুখটা বাজু দিয়া মুছিয়া ছেঁদাটায় একটা ফুঁ মারিয়া হুক্কায় টান দিলেন।

দুই একটা টান দিয়াই বলিলেন : ঈদু, তুমি আমার কাছে বস। তোমার লগে কয়টা খুব যরুরী কথা আছে।

তার সাথে গাঁয়ের মোড়লের যরুরী কথা! ঈদু গর্ব বোধ করিল। সে মোড়লের সামনে হাঁটু বুকে লইয়া মাটিতে বসিল। মোড়ল গলা নীচু করিয়া বলিলেন : তুমি কিছুদিন ওমর বেপারীর চাকরি করছিলা না? মনে আছে?

ঈদু হাসিয়া বলিল : মনে থাক্‌ব না কেন?

শরাফত : বছর ছয়েকের কথা ত?

ঈদু : তা হৈবার পারে। আমরা উম্মি মানুষ, লেখাপড়া ত জানি না। অতশত সন-তারিখ মনে থাকে না।

শরাফত : আচ্ছা, তোমারে ত ওমর বেপারী খুব বিশ্বাস করত?

ঈদু : ইটা কি কন বড় মিঞা! বিশ্বাস করত না? হাজার টাকার তোড়াটা আমার কান্ধে তুইলা দিয়া কতদিন বেপারী সাব বাজারে গেছে পাট কিনবার।

শরাফত : তোমার লগে সংসার ও কায়-কারবারের আলাপ করত ত?

ঈদু : করত না! কি কন? আমারে না জিগাইয়া এক লাছি পাটও তানি কিনত না। নাতনী ছুঁড়ীর বিয়াটা যে দিল তাও আমারে পুছ কইরা দিছে।

শরাফত : আমি সেটা জানি বইলাই ত পুছ করতাছি। আচ্ছা, এইবার মনে কইরা দেখ ত আমির আলির লাগি ওসমান সরকার যে জামিন হইছিল, একথাটা কি তোমার মনে আছে?

ঈদু ঃ হেঁ, শুনতাছি ত হইছিল বলে। আবার কেউ-কেউ কয় আমির আলি নাকি ওটা জাল করছে।

শরাফত ঃ আমি তোমারে সে কথা পুছ করতাছি না। আমিরের যামিনে ওসমান সরকার যখন দস্তখত দেয়, তখন একটা লোক হৈছিল তার সাক্ষী। সে লোকটা হৈল ওমর বেপারী। ওমর বেপারী যদি অত বড় ব্যাপারের সাক্ষী হৈয়া থাকে, তবে সে কথাটা কি একটা মানুষের কাছেও সে কয় নাই? এটা হৈবার পারে না। যদি একটা মানুষের কাছেও কইয়া থাকে, তবে সেটা তোমারে ছাড়া আর কেটা হৈবার পারে? কারণ তোমার মত বিশ্বাস সে ত আর কেউরে করত না। এইবার তুমি ভাইবা দেখ ওমর বেপারী ঐ সাক্ষীর কথাটা তোমার কাছে কইছিল কিনা।

ঈদু শেখ একবার মাটির দিকে একবার আসমানের দিকে তাকাইল। কিছুই মনে করিতে পারিল না। মাথা নাড়িয়া অবশেষে বলিল ঃ না বড় মিঞা, মনে পড়তাছে না। এই ধরনের কোনো কথা বেপারী সাব কোন দিন কইছে বইলা আমার স্মরণ হয় না।

শরাফত ঃ এতদিনের পুরান কথা, অত সহজেই কি মনে হয়? একটু ইয়াদ কৈরা দেখ। নিশ্চয় মনে পড়বো। তোমার মত বিশ্বাসী লোকেরেও ওমর বেপারী এমন কথাটা না কইবার কোনো কারণ থাক্‌তেই পারে না। ভাইবা দেখ, আরো ভাব। না, স্মরণ না হৈলে চলব না। একটা মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করতাছে তোমার উপরে।

ঈদু ঃ আমার উপরে? কেম্‌নে?

শরাফত ঃ ওমর বেপারীর দস্তখত পরমাণ করা যাইতাছে না। কেউ যদি তখন যাইয়া কয় যে, ওমর বেপারী তার কাছে যামিনের কথা কইছে, তা হৈলেই যামিন পরমাণ হৈব, আমির আলিও বাঁইচা যাব, বুঝলা?

ঈদু ঃ জি হ, এখনে বুঝলাম। কিন্তু বড় মিঞা, আমার যে ও-কথাটা মনে পড়তাছে না।

শরাফত ঃ মনে পড়তেই হৈব মিঞা। তুমি আরো ভাবতে থাক। আজ আমি যাই। মনে রাইখো, তোমার উপরেই একটা মানুষের সব নির্ভর কর্‌তাছে।

ভালা কথা, তোমার অসুখের কথা ত পুছ করাই হৈল না। তুমি কাশটার কি তিরকিচ্ছা করতাছ?

ঈডু: ভাতই জোটে না, বড় মিঞা, তিরকিচ্ছা করামু কি দিয়া?

শরাফত: তা ত কথাই। যে দিনকাল পড়ছে, টাকা-কড়ি ছাড়া কোনো দিগি পা বাড়াবার জো আছে! যা হোক, তুমি আর কিছু না পার, মামুদালি কবিরাজের থনে এক দলা চয়বনপেরাশ আইনা খাও।

—বলিয়া শরাফত মণ্ডল দুই টাকার একখানা নোট নিমার পকেট হইতে বাহির করিয়া ঈডুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। বলিলেন: তুমি আপত্য কইরো না। ইটা নেও। কাশি রোগটা ভালা না। রাত অনেক হৈল। আমি অখন উঠি।

—বলিয়া শরাফত মণ্ডল চলিয়া গেলেন।

ঈডুর বিষম ভাবনা হইল। বড় মিঞা বলিয়া গিয়াছেন, আমির আলির জীবন-মরণই নির্ভর করিতেছে তার একটা কথার উপরে। তিনি তাকে আরও ভাবিতে বলিয়া গিয়াছেন। দুই-দুইটা টাকাও দিয়া গিয়াছেন। কথাটা মনে পড়িলে আরও দশ-বিশ টাকা কোন্ না পাওয়া যাইবে?

ঈডু খড়ম খট্‌খটাইয়া পাক ঘরে ঢুকিল। বলিল: তারা শুন্‌ছে কিছু বড় মিঞা কি কইয়া গেল?

ঈডুর স্ত্রী কান খাড়া করিয়া বলিল: কি কইয়া গেল?

ঈডু: আমির আলি খাঁ আর ওসমান সরকারের মধ্যে যে জালিয়াতি মামলা চল্‌তাছে, তা নির্ভর করতাছে আমার মুখের একটা কথার উপরে।

স্ত্রী: মান্‌ষে কয় কি? সাচা না কি?

ঈডু: সাচা না ত কি বানাইয়া কইতাছি? এই যে দেখ আজ দুই টাকা বড় মিঞা বায়না দিয়া গেছে। আমি যদি কথাটা কইবার পারি তবে আরও এককুড়ি টাকা দিব, বড় মিঞা ইশারায় সে কথাও কইয়া গেল।

স্ত্রী সহজে ছাড়িল না। কুড়ি টাকা দামের এই কিম্মতী কথাটা কি, তা স্বামীর কাছে শুনিয়া তবে ছাড়িল।

সব কথা শুনিয়া স্ত্রী বলিল: তারা কি এই কথা কৈব নাকি?

ঈতু : মনে না পড়লে কইই বা কেমনে ? টাকার লাগি ত বুড়া বয়সে মিছা কথা কৈয়া আখের খাবার পারি না ?

স্ত্রী : মিছা কথা কইব কেন মানুষে ? কথাটা যখন হৈছে, তখন একটু ভাইবা-চিন্তা মনে করলেই ত হয়।

স্ত্রীও ঐ কথাই বলিতেছে ? ভাবিলে-চিন্তিলেই ব্যাপারটা মনে পড়িয়া যাইবে তা হইলে ?

ঈতু সকল কাজে-কর্মে কেবল ঐ এক কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। এর উপর শরাফত মণ্ডল রাস্তা-ঘাটে হাটে-বাজারে তাগাদা করিতে লাগিল : কি ঈতু, কথাটা মনে পড়লো ?

কোথায়, কবে ওমর বেপারী তার কাছে ঐ কথাটা বলিয়াছিল ? যখন বাজার হইতে অনেক রাতে দুইজন বাড়ি ফিরিতেছিল তখন ? সে সময় ত কেবল পাট কেনা-বেচারই আলাপ হইত। যখন ঈতু উঠানে ধান মাপিতেছিল এবং ওমর বেপারী তা ছালায় ভরিতেছিলেন ? না, তখনও না। তবে কখন ? কোথায় ? কোথা—?

হাঁ, এইবার মনে পড়িয়াছে। ওমর বেপারী ও ইতু ওমর বেপারীর বৈঠকখানায় গরুর দড়ি পাকাইতেছিল। আষাঢ় মাস। খুব মেঘ পড়িতেছিল। বাইরের কাজ-কর্ম করিবার উপায় ছিল না। অমন বর্ষার দিনেই গিরস্তেরা ঘরে বসিয়া দড়ি-কাছি পাকায়, ধাড়ি-চাটাই বুনে। হাঁ, এইবার বেশ পরিষ্কার মনে পড়িয়াছে। ওমর বেপারী দড়ি পাকাইতেছিলেন। ঈতু নিজেও কি দড়ি পাকাইতেছিল ? না, না। এই বার সব কথা ছবির মত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ওমর বেপারী চৌকির পাশে বসিয়া ঘরের খামে পাট ঝুলাইয়া বাঁধিয়া তাউতা পাকাইতেছিলেন। আর ঈতু চৌকির মাঝখানে বসিয়া ধাড়ি বুনাইতেছিল। ঐ ধাড়িটা দিয়াই ত পরে ধানের মোটকা বানাইয়া বেপারীর শোবার ঘরে উগারের উপর ধান রাখা হইয়াছিল। সব কথা এখন আয়নার মত ঈতুর মনে ভাসিয়া উঠিল। ওমর বেপারী কোন্‌দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁর কোন্ পা'টা কিভাবে ছিল, তন্নতন্ন সব কথাই এবার ঈতুর মনে পড়িয়া গেল।

হাঁ, ঐদিনই ওমর বেপারী তাঁর সংসারের অনেক কথা ঈতুর নিকট বলিয়াছিলেন। তার ছেলে-পিলে কিছু হইল না, হইবারও আর আশা নাই, স্ত্রীকেও অনেক তাবিয-কবয দেওয়া হইয়াছে, কোনও ফল হয় নাই, ইত্যাদি কত কথাই ত বেপারী সেদিন বলিয়াছিলেন। ওসমান সরকারের যামিনের কথাটা ঐ সময় না বলিয়া কি পারেন? নিশ্চয় বলিয়াছিলেন। হাঁ, এই ত স্পষ্ট মনে পড়িয়া গেল। বেপারী সাহেব বলিয়াছিলেন: আজকাল মানুষের উপকার করিতে নাই। আজকালের মানুষের ধর্মই হইল, যে পাতে খাই, সেই পাতে হাগি। যদি যামিনের কথাই না উঠিবে, তবে একথা বেপারী বলিবেন কেন? হাঁ, এই ত এখন স্পষ্ট মনে পড়িয়া গেল। এটা ত ওমর বেপারীরই কথা: গাছে উঠ মরবার, যামিন হও ভরবার। ঈতুর মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিল না।

যথাসময়ে ঈতু মণ্ডলবাড়ি গেল। শরাফত মণ্ডল ঈতুকে দেখিয়া আগ্রহভরে জিগ্‌গাস করিলেন: মনে পড়ছে কথাটা?

ঈতু দাঁত বাহির করিয়া বলিল: এক্কেবারে আয়নার মত, বড় মিঞা।

বড় মিঞা মনে মনে বলিলেন: আমি জানিতাম মনে পড়িবে। যে দাওয়াই দিয়া আসিয়াছিলাম! মুখে বলিলেন: আমি কইছিলাম না, একটু ভাবলেই মনে পইড়া যাব; কারণ কথাটা ত সত্য।

—বলিয়া বড়মিঞা বাড়ির মধ্যে গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ঈতুর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়া বলিলেন: মামলার দিনে আরো পাইবা। ঠিক সময়ে উকিলের বাসায় হাযির হৈবা গিয়া। সমন? তার লাগি তুমি ভাইবা না। আমি সমন করাইয়া রাখমু।

বার

মোকদ্দমার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, ওসমান সরকার ততই বেশী অসোয়াস্তি বোধ করিতেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত কি করিবেন, এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তিনি কোন্ দিক যাইবেন? নিজ হাতে দস্তখত দিয়া যামিন হইয়াছিলেন, একথা কি স্বীকার করিবেন? নাহক তিন

হাজার টাকা জরিমানা দিবেন ঐ বেইমান আমির আলির জন্য ? তাতে বা তাঁর রক্ষা কোথায় ? টাকা পাইয়াই কি আমির আলি তাঁকে ছাড়িয়া দিবে ? আমির আলি ছাড়িলেই বা হাকিম তাঁকে ছাড়িবেন কেন ? মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য তাঁকেই কি হাকিম ফৌজদারীতে সোপর্দ করিবেন না ? দুনিয়া-শুদ্ধ তাঁর বদনাম হইবে না ? মিথ্যাবাদী বলিয়া চারদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ঢি-ঢি পড়িয়া যাইবে না ? এই অসম্মান, এই বে-ইয্‌যতি তাঁর বরদাশ্‌ত হইবে ? তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মাথা হেঁট হইবে না ? কলেজের সহপাঠীরা তাঁর ছেলেকে লইয়া বিদ্রূপ-তামাশা করিবে না ? না, আর ফিরিবার উপায় নাই।

কিন্তু মোকদ্দমা চালাইলে যে তাঁকে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। তিনি খোদার নামে হলফ করিয়া মিথ্যা কথা বলিবেন কিরূপে ? তিনি ঠেকা-বেঠেকায় দুএকটা মিথ্যা কথা যে না বলিয়াছেন তা নয়। প্রয়োজন হইলে এখনও বলিতে পারেন। কিন্তু একেবারে হলফ করিয়া মিথ্যা কথা ? তা ত জীবনে তিনি কখনো বলেন নাই। আর মিথ্যারও ত বেশ-কম আছে। সত্য কথা একটু হেরফের করিয়া বলা, একটু এদিক-ওদিক বলা, সেটা না হয় করা যায়। কিন্তু এটা যে ডাহা মিথ্যা কথা। একেবারে 'হাঁ'-কে 'না', 'না'-কে 'হাঁ'। সরকার সাহেব কি আজ এতই জাহান্নামে গিয়াছেন যে, কয়েক হাজার টাকার জন্য আদালতে খাড়া হইয়া হলফ করিয়া অমন ডাহা মিথ্যা কথা বলিবেন ? না, তিনি তা পারিবেন না।

তবে তিনি করিবেন কি ? তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। সকালে তিনি বাড়ির বাহির হন নাই। সারা বিকাল, সন্ধ্যা এবং অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে-বাহিরে কেবল ছট্‌ফট করিয়া পায়চারি করিতেছেন। একবার বসিতেছেন, একবার উঠিতেছেন, নানা কথা ভাবিতেছেন।

সকল দিক ভাবিয়া তিনি দেখিলেন, ব্যাপারটা আজ আর তাঁর আয়ত্তে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই আজ আর যা-খুশি করিতে পারেন না, যে দিকে খুশি যাইতে পারেন না। তিনি এমন সব কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, এমন কতকগুলি কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, যে-সব কথায় তাঁর জিভ ও যে সব কাজে তাঁর হাত-পা বাঁধা হইয়া গিয়াছে। আজ যেদিকেই তিনি যাইতে

চান, সেদিকেই তাঁর সেই সব কথা ও কাজ দেওয়াল হইয়া তাঁর সামনে পথ রুখিয়া দাঁড়ায়। তিনি যেন আন্ধা-চক্করে পড়িয়াছেন, সে চক্কর হইতে বাহির হইবার আর কোনো পথ নাই। ঐ একটি মাত্র সরু পথ খোলা আছে, সেটা মিথ্যার পথ।

সরকার সাহেবের দম বন্ধ হইয়া আসিল। তাঁর মনে হইল সত্যই বুঝি তিনি দেওয়ালে আটকা পড়িয়াছেন। তিনি নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। জোরে জোরে পা ফেলিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। বাইরের দিকে, খোলা আসমানের দিকে তাকাইলেন। তিনি দেখিলেন, এ সম্পর্কে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সবের ডাল-পালা গজাইয়াছে। সেই সব ডাল-পালা ধরিয়া তাঁর লোক-জনেরা কথা বলিয়াছে। সেই সব কথারও আবার ডাল-পালা গজাইয়াছে। সেই সব কথার গাছ ও তাদের ডাল-পালা মিলিয়া এক বিশাল জংগলের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জংগলের গাছগুলি এমন গায়ে-গায়ে ঘেষিয়া ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে যে, তার একটা না কাটিয়া আরেকটা কাটা যায় না।

সরকার সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। এই সব মিথ্যা কথার কোন্‌টা বাদ দিয়া কোন্‌টা রাখিবেন? জংগল সাফ না করিয়া যে কোনোটাই বাদ দেওয়া যায় না।

তিনি নিতান্ত অসহায় বোধ করিলেন। আবার তিনি বারান্দায় একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, গত কয়দিনে তিনি এক মিথ্যার সমর্থনে অনেক মিথ্যা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সে সব কথার যেন হাত-পা আছে, ওরা যেন এক-একটা মানুষ। ওরাও যেন চলা-ফেরা করিতে পারে, কথা বলিতে জানে। সরকার সাহেবরা যেমন ইলেকশনে দল করেন, এই কথাগুলিও যেন তেমনি একটি দল গড়িয়াছে। এ দল যেন সরকার সাহেবের নিজের দল। ইলেকশনের সময় সরকার সাহেবের দলের লোকেরা যেমন 'এটা করিতে হইবে, ওটা করা চলিবে না' বলিয়া হুকুম চালায়, এই মিথ্যা কথার দলও যেন তেমনি আজ সরকার সাহেবের উপর হুকুম জারি করিতেছে। সরকার সাহেবের ভালর জন্য দলের লোকেরা

যা ঠিক করিয়াছে, তাতেই সরকার সাহেবকে সায় দিতে হইবে। অন্যথা বা আপত্তি করা চলিবে না। এখানে সরকার সাহেবের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত মতের কথা উঠিতেই পারে না। এটা দলের স্বার্থ, এটা দলের অভিমত। সরকার সাহেব দলের নেতা মাত্র। তাঁকে দলের অভিমত মানিয়া চলিতে হইবে, অন্যথায় দল ভাঙিয়া দিতে হইবে, নইলে নেতৃত্ব হারাইতে হইবে।

কি সাংঘাতিক কথা! দলের লোক দুশমন হইলে, সৈন্য-বাহিনী সেনাপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে, দলপতি ও সেনাপতির কি দশা হয়, সেটা সরকার সাহেব চোখেও দেখিয়াছেন, বই-পুস্তকেও পড়িয়াছেন।

সরকার সাহেবের এই মিথ্যার বাহিনী কি চায়? তারা সরকার সাহেবের ভালর জন্যই আমির আলি খাঁর ধ্বংস চায়। সে কাজে যদি সরকার সাহেব বাধা দেন, তবে তারা রণোন্মত্ত ফৌজের মত নিজেদের সেনাপতি সরকার সাহেবকেই ধ্বংস করিবে। তারা আজ খুন চায়। এক পক্ষকে তারা আজ খুন করিবেই।

অত শীতেও সরকার সাহেবের গায়ে ঘাম ছুটিয়া গেল। তিনি পাঞ্জাবীর বোতামের ফাঁক দিয়া বুকে ফুঁ দিতে লাগিলেন।

না, সরকার সাহেবের আর কোনো পথ নাই। তাঁর নিজের সৃষ্টির কাছে আজ তাঁকে হার মানিতেই হইবে; নিজের দলের নির্দেশ তাঁকে বহন করিতেই হইবে। যে পথে তিনি চলিয়াছেন, সে পথেই তাঁকে আগাইতে হইবে। পিছু হটিবার আর উপায় নাই। সে চেষ্টা করিলে নিজের দলের লোকই তাঁকে পিষিয়া মারিবে। উঃ, কি সাংঘাতিক অবস্থা!

কিন্তু সাংঘাতিক হইলেও তাই করিতে হইবে। তাঁকে হলফ করিয়াই মিথ্যা কথা বলিতে হইবে। হইবে? সরকার সাহেবের শরীরটা খারাপ বোধ হইতে লাগিল। তিনি ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

বিবি সাহেব রান্নাঘরে ছিলেন। তাঁকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন: আমার বাতটা এতদিন পরে খুব জোর করছে। আমি শুইয়া পড়লাম। রাতে আর কিছু খামু না। আমারে যেন কেউ ডাকাকাকি না করে।

—বলিয়া তিনি লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সারা রাত একরূপ অঘুমে কাটাইলেন।

পরদিন হইতেই তিনি লক্ষ করিলেন, আসল কথা জানিবার জন্য যেন তাঁর চারিদিকে চর ঘুরাফিরা করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, তাঁকে অতঃপর খুব সাবধানে চলিতে হইবে ; গণিয়া-গাঁথিয়া কথা বলিতে হইবে। এ ব্যাপারে যত কম কথা বলা যায়, ততই মংগল। কারণ কখন মুখের চোটে কোন্ কথা বাহির হইয়া পড়ে।

কিন্তু এক মিথ্যা আরেক মিথ্যা ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না। একটা মিথ্যা বলিলেই তার সমর্থনে আর একটা বলিতে হয়। সেটার সমর্থনে আরেকটা, তার সমর্থনে আরেকটা। এইভাবে ক্রমাগত মিথ্যার স্তূপ দীঘে ও পাশে বড় হইতেই থাকে। ওসমান সরকারের মিথ্যাও দীঘে পাশে বড় হইয়া চলিয়াছে। তাই তিনি এখন এত সাবধানে চলেন যে, নিরীহ সত্য কথা বলিতেও তিনি ভয় পান। কি জানি এই সত্যের সংগে সংগে যামিনের সত্য কথাটাও যদি বাহির হইয়া পড়ে। স্বপ্নের ঘোরে সত্য কথাটা তাঁর মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে ভয়ে তিনি আর সাহস করিয়া ঘুমাইতেও পারেন না।

গোপনে যে যত বেশী পাপ করে, মুখে মুখে সে তত বেশী ধর্ম কথা বলে, শাস্তির ভয়ে সে তেমনি কারণে-অকারণে চমকিয়া উঠে। সরকার সাহেবেরও হইল তাই।

সেদিন ওসমান সরকার খবর পাইলেন, তাঁর আত্মীয় ও ছেলেবেলার বন্ধু নসিম সরকার মারা গিয়াছেন। শোনা অবধি আর তিনি স্থির হইতে পারিতেছেন না। যেদিকে তিনি মুখ ফেরান, সেই দিক হইতেই যেন আজরাইল ফেরেশতা তাঁকে ডাকিয়া বলিতেছেন ঃ ওসমান সরকার, এইবার তোমার পালা।

সারাদিন এই অস্বস্তির মধ্যে কাটাইয়া রাত্রে যখন স্বামী-স্ত্রীতে শুইলেন এবং বিবি সাহেব যখন হারিকেনটা নিবাইয়া দিলেন, তখন তিনি বিবিকে বলিলেন ঃ মানুষের হায়াতের এক লহমার ভরসা নাই ; আজ আছি, কাল নাই। অথচ এই দুদিনের জীবনই আমরা শুধু গোনা কৈরাই কাটাইয়া দেই। একটা তাজ্জবের ব্যাপার না ?

বিবি সাহেব হাই তুলিতেছিলেন। তিনি লেপটা মুখের উপর টানিয়া দিয়া বলিলেন ঃ হাঁ, তাজ্জবই ত।

সরকার সাহেব আরও গম্ভীর স্বরে বলিলেন ঃ আমরা যদি সকলে নিজ নিজ দিলের দিকে চাইয়া দেখি, তা হৈলে দেখা যাব যে, যারারে আমরা গোনাহ্‌গার বৈলা ঘিন্না করি, তারা আমরার চাইয়া বেশী পাপী না। তারারেও আল্লা মাফ করতে পারে।

বিবি সাহেব একটু ভাবিয়া বলিলেন ঃ হেঁ, যদি তারা তওবা করে। খালেস দিলের তওবা আইজো আল্লাহ্‌ কবুল করে।

ওসমান সরকার চুপ করিয়া গেলেন। বিবি সাহেব কি তবে কৌশলে তাঁকেই তওবা করিতে বলিতেছেন? না, না, তিনি নিশ্চয় আমির আলির কথাই বলিতেছেন। আমির আলি খাঁ সরকার সাহেবের মত উপকারীর মাথায় লাঠি মারিতে উদ্যত হইয়াছে কি না। তওবা আমির আলিরই করা উচিত।

সেই কনকনা শীতের রাত্রের অন্ধকারে সরকার সাহেবের চোখের সামনে সারা গ্রামের চেহারা ভাসিয়া উঠিল। গ্রামবাসীর বেইমানির জন্য তাদের উপর এখন আর সরকার সাহেবের রাগ নাই। গরম রাজাইর নীচে হইতে তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন, গ্রামের সমস্ত লোক শীতে, ক্ষুধায় ও রোগে মরিতে বসিয়াছে। সরকার সাহেবের দয়ার দিকে যেন তারা হাত পাতিয়া কাকুতি করিতেছে।

তিনি পাশ ফিরিয়া বিবির দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ আমি আজ কি ভাবতাছি জান?

বিবি আধ-ঘুমা হাই তুলিয়া বলিলেন ঃ না।

সরকার ঃ আমি ভাবতাছি আমরা যে অন্যায় করি, আমরার মরার সাথে-সাথেই সে অন্যায় মুইছা যায় না। আমরার মরার পরেও সেটা অন্যায় কইরাই যাইতে থাকে। ইটা যেন একটা আগুন। আমরা একটা বাড়ি পুড়াবার লাগি যদি কোথাও আগুন লাগাই, তবে সে বাড়িটা ত পুড়েই, আবার সেই বাড়ির আগুনে আরেকটা, তার পরে আরেকটা বাড়িও পুইড়া যায়।

বিবি সাহেব শুধু বলিলেন ঃ হুম্।

সরকার ঃ তা হৈলে মানুষ অন্যায় কইরা কবরে গিয়াও শান্তি পায় না। কি কও?

বিবি ঃ সেটা আল্লার মর্যি। কেটা শান্তি পাব, কেটা পাব না, আল্লা ছাড়া আর কেউ তা কইবার পারে না।

—বলিয়া বিবি সাহেব পাশ ফিরিয়া স্বামীর দিকে পাছ দিয়া ভাল করিয়া শুইলেন এবং অল্পক্ষণেই নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সরকার সাহেবের ঘুম আসিল না। তিনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, আমির আলি তার উপকারী সরকার সাহেবের দুশমনি করিয়া যে অপকর্ম করিয়াছে, আমির আলির ছেলে-পিলে নাতি-পুতি পুস্তের-পর-পুস্ত তার শাস্তিভোগ করিয়া যাইতেছে। একজনের পাপে অত লোকের শাস্তি? ওদের জন্য সরকার সাহেবের মনে দয়া হইল।

কিন্তু তিনি নিজে? তিনিই কি বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবেন? তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ অনেক দূর দেখিলেন। অনেক বিচার-বিবেচনাও করিলেন। কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মাঝে হইতে তাঁর ঘুমটা নষ্ট হইল।

ঘুম তাঁর কেন হয় না? তবে কি তাঁর কোনো রোগ হইয়াছে? মাথাটা তাঁর গরম লাগিতেছে কেন? তিনি মাথায় হাত দিয়া বুঝিলেন আগুন বাহির হইতেছে। তবে কি তাঁকে বায়ুরোগে ধরিয়াছে? এ রোগ লইয়া তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইবেন কি করিয়া? তিনি নিশ্চয় মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া যাইবেন।

ইয়া আল্লাহ্‌, তুমি রহমানুর রহিম। সরকার সাহেব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। অত শীতেও তাঁর বুকের গাতাটায় ঘাম ছুটিয়া গিয়াছে। তিনি তিনবার কলেমা শাহাদত পড়িয়া বুকে ফুঁ দিলেন।

একটু শান্ত হইয়া তিনি নিবু-নিবু হারিকেনটার তেজ বাড়াইয়া দিয়া টেবিলের উপরস্থ টাইমপিসটার দিকে চাহিলেন। সুবহানাল্লাহ্‌, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে! তিনি আর ঘুমাইবেন কখন? পাশে বিবি সাহেব

অঝোরে ঘুমাইতেছেন। বিবির এই শান্ত ঘুম দেখিয়া তাঁর ঈর্ষা হইল। বুড়া মানুষ ছেলেমানুষের মত এমন বেঘোরে ঘুমায় কি করিয়া? তাছাড়া তিনি নিজে সারাদিন গাধার খাটুনি খাটিয়া একটু ঘুমাইতে পারিতেছেন না। অথচ ঘরে বসিয়া-বসিয়া খাইয়া তাঁর স্ত্রীর কি এমন করিয়া ঘুমান উচিত? তিনি কি জাগিয়া স্বামীর প্রতি একটু সহানুভূতিও দেখাইতে পারিতেন না?

সরকার সাহেব রাগে বিবি সাহেবের দিকে পিছন ফিরিয়া শুইলেন। ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না। তার বদলে রাজ্যের চিন্তা আসিয়া মাথার মধ্যে কিলবিল করিতে লাগিল। সব চিন্তার সারমর্ম তিনি এই বুঝিলেন যে, একটা অন্যায় একবার করিয়া ফেলিলে সসম্মানে সেটা হইতে পিছাইতে পারা যায় না। এই যে তিনি আমির আলির বিরুদ্ধে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগটা করিয়া ফেলিয়াছেন, ইচ্ছা করিলেই কি তিনি সেটা প্রত্যাহার করিতে পারেন? না, পারেন না। তিনি কম্বল ছাড়িলেও কম্বল তাঁকে ছাড়িবে না। ধরা যাক, সরকার সাহেব যদি অপরাধ স্বীকারই করেন, মিথ্যা অভিযোগের জন্য যদি ক্ষতিপূরণও দেন, তবু কি আমির আলি ও তাঁর মধ্যে পূর্ব সম্পর্ক ফিরিয়া আসিবে? আসিবে না। বরঞ্চ আমির আলি তখন সরকার সাহেবকে পরাজিত শত্রু মনে করিয়া পাল্টা আক্রমণ করিবে। সরকার সাহেবের তখন আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকিবে না।

তারপর ক্ষতিপূরণ? শুধু যামিনের তিন হাজার টাকা দিলেই ত চলিবে না। লোক-সমাজে আমির আলিকে হেয় করা হইয়াছে, তিন-চার মাস ধরিয়া তার যে মানসিক যন্ত্রণা হইয়াছে, তারও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অত টাকা সরকার সাহেব দিতে পারিবেন? যদি দেন, তবে তাঁর বংশ কি পথে বসিবে না।

ধরা যাক, সরকার সাহেব তাও করিলেন। কিন্তু তাতেই কি সরকার সাহেব মুক্তি পাইবেন? সমাজ কি তাঁকে এবং তাঁর বংশধরকে ক্ষমা করিবে? মিথ্যা কথা বলিয়া তা স্বীকার করিলে আল্লাহ্ মাফ করিতে পারেন, কিন্তু মানুষে মাফ করে না। তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া যে অপরাধ

স্বীকার করিলেন, এ কথা কেউ বিশ্বাস করিবে না। লোকে বলিবে, কোনো বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াই সরকার সাহেব ওটা স্বীকার করিয়াছেন। নিজের বংশটিকে পথে বসাইয়া তিনি যে আমির আলিকে ক্ষতিপূরণ দিবেন, তাতেই কি তাঁর কলঙ্ক মুছিয়া যাইবে? না, যাইবে না। যতদিন সরকার সাহেব বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন লোকে তাঁকে মিথ্যাসাক্ষ্যদেনেওয়ালা বলিয়া খোঁটা দিবে। সরকার সাহেব কল্পনায় দেখিলেন, পথে-ঘাটে লোকেরা তাঁরই দিকে আঙুলের ইশারা করিয়া বলাবলি করিতেছে: ঐ যে মিথ্যা-সাক্ষ্যদেনেওয়ালা যায়। তিনি আরো দেখিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরকে লোকেরা মিথ্যাসাক্ষ্যদেনেওয়ালার খান্দান বলিয়া গাল দিতেছে।

অপরাধ স্বীকার করিবার এই শোচনীয় পরিণাম! এমন বোকামি করিবেন সরকার সাহেব? যদি সসম্মানে এই মিথ্যা হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপায় থাকিত, তবে নিশ্চয় তিনি অপরাধ স্বীকার করিতেন। কিন্তু একটা মিথ্যা কথা বলার অপরাধে তিনি এমন চিরস্থায়ী ভয়াবহ শাস্তি মানিয়া লইবেন কিরূপে? এর কি অন্য কোনো উপায়—

সরকার সাহেব শেষ রাতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল।

তের

পরদিন সারা সকালই সরকার সাহেব মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। চাকরেরা ধান মাড়াইতেছিল, সরিষা কলাই তুলিতেছিল। তাদের কাজের তদারক করিয়া, তাদের ত্রুটি ধরিয়া, গালাগালি দিয়া তিনি আমির আলির কথা ভুলিবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু উন্টা ফল হইল। নিজের এই অফুরন্ত শস্যরাজি এবং দিগন্ত-বিস্তৃত জায়গা-জমি আমির আলির কথা তাঁকে বারে বারে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল।

আমির আলির মত গরিব মানুষ সরকার সাহেবের সাথে কি টক্কর দিবে? তার আছে কি? কি লইয়া সে সরকার সাহেবের বিরুদ্ধে লড়িবে?

হাঁ, হইত যদি শরাফত মণ্ডল, তবে সমানে-সমানে একটা লড়াই হইত বটে। কিন্তু সে বেটাদেরও গায়ে এখন আর তেমন রক্ত নাই, শুধু হাড্ডি কয়টা। তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : হে ওসমান, তুমি আমির আলির মত একটা আধ-মরা এতিমের সংগে লড়িতেছ? আর সে লড়াইটাও করিতেছ কোন ভদ্রলোকের হাতিয়ার দিয়া নয়। একটা ডাহা মিথ্যার দ্বারা, যা নাকি ঠক-প্রবঞ্চকেরই অস্ত্র।

নিজের উপর সরকার সাহেবের ঘৃণা হইল। তিনি নিজেকে যত ভাল মানুষ মনে করেন, আসলে তবে তিনি তত ভাল মানুষ নন?

বিকালে সরকার সাহেব বাহির হইতে পারিলেন না। সর্দিতে মাথা ধরিল; গায় জ্বর-জ্বর ভাব হইল। তিনি লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

উপরাউপরি দুইদিন স্বামীর শরীর খারাপ যাইতেছে দেখিয়া বিবি সাহেবের চিন্তা হইল। বিবাহ হইয়াছে অবধি তিনি স্বামীর অসুখ বড় একটা দেখেন নাই। স্ত্রীর মুখে চিন্তার ভাব দেখিয়া সরকার সাহেব আরো ঘাবরাইয়া গেলেন। তবে তাঁর নিশ্চয় বড় অসুখ করিয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় তাঁর টায়ফয়েড হইবে। সরকার সাহেব নিজেও কিছু কিছু ডাক্তারি জানেন। টেবিলের উপরে কয়েকখানা কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথির বই আছে এবং একটি হোমিওপ্যাথিক বাক্সও আছে। নিজের চাকর-বাকর ও আশে-পাশের গরিব-গুরবাদের মধ্যে তিনি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন।

কাজেই ডাক্তার না ডাকিয়াই তিনি লক্ষণাদি দেখিয়া বুঝিলেন তাঁর জ্বর গুরুতর আকার ধারণ করিবে। এবার আর তাঁর রক্ষা নাই। থার্মোমিটারে তাপ উঠিল না যদিও, তথাপি তিনি বুঝিলেন ভিতরে তাঁর প্রবল জ্বর হইতেছে। তিনি ঘনঘন নিজের নাড়ি টিপিতে লাগিলেন।

দুই তিন দিন গেল এইভাবে। তিনি সত্যিকার রোগীর মতই দুর্বল হইয়া পড়িলেন। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বেশী দূর যাইতে পারেন না। সকালে-বিকালে লাঠি ভর দিয়া পুকুরের চারধারে এবং বড় জোর রোড-বোর্ডের রাস্তার মোড় পর্যন্ত হাঁটিয়া বেড়ান।

অবশেষে তিনি ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন বেড়াইতে-বেড়াইতে তিনি ঠিক করিলেন, আমির আলির ব্যাপারটাই তাঁকে এমন কাবেয করিয়া ফেলিয়াছে। না, ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিতেই হইবে। এ যন্ত্রণা আর তাঁর সহ্য হয় না। তিনি সত্যকথা বলিয়াই ফেলিবেন। প্রথমতঃ স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলিয়া বলিবেন। তারপর নিজে আদালতে গিয়া দরখাস্ত করিবেন এবং ব্যাংকে গিয়া যামিনের টাকা শোধ করিবেন।

এই সিদ্ধান্ত করা মাত্রই তাঁর মনটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বুকের উপর হইতে যেন একটা পাষাণ নামিয়া গেল। ঘাম দিয়া জরটা ছাড়িয়া গেল। তিনি হাতে-পায়ে যথেষ্ট বল পাইলেন। শোকর আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! তিনি পথ দেখিতে পাইয়াছেন।

তিনি জোরে জোরে হাঁটিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা হইলেন। বৈঠকখানার সামনে আসিতেই কেরামত শেখ আসিয়া আদাব দিয়া তাঁর সামনে খাড়া হইল। বলিল: সাহেবের তৈবতটা অখন কেমন আছে?

কেরামত শেখ সরকার সাহেবের খামার-বাড়ির প্রজা। চিরকাল সরকার-বাড়িতে চাকুরি করিয়া কাটাইয়াছে। তখন হইতেই কেরামত সরকার সাহেবের খামারে বাড়ি করিয়া বাস করিতেছে। এখন সে বুড়া হইয়াছে, কাজকর্ম করিতে পারে না; তাই সরকার সাহেবের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু সরকার সাহেব তাকে ভিটাছাড়া করেন নাই। পাঁচ কাঠা জমি কোর্ফা পত্তনে বার্ষিক মবলগে দুই টাকা খাযনায় সে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছে। সে খাযনাটাও প্রায় তিন চার বছরের ধরিয়া বাকী পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকার সাহেব কিছু করেন নাই।

কেরামতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি খুশী হইয়াই বলিলেন: আজ শরীলটা ভালাই লাগতাছে। তুমি কি মনে কইরা?

কেরামত: সাহেবের সাথে আমার একটা গোপন কথা আছে। বৈঠকখানায় এক দণ্ড কি বসবার পারবেন?

'আসি' বলিয়া সরকার সাহেব বৈঠকখানায় ঢুকিলেন। তিনি একটি

চেয়ারে বসিয়া কেরামতকে একটি টুল দেখাইয়া বলিলেন: বস। কথাটা কি?

ঘরে আর কেউ ছিল না। তবু চারিদিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া লইয়া কেরামত ছোট গলায় বলিল: আমি একটা মস্তবড় বেয়াদবি করতে চাই সাব।

সরকার সাহেব কানখাড়া করিলেন: বেয়াদবি? কি বেয়াদবি? আমার কাছে কথা কইতে আর বেয়াদবি কি? বইলা ফেল।

কেরামত: আপনে আমির মিয়ার মামলাটা আপসে মিটাইয়া ফেলেন।

ওঃ এই কথা! সরকার সাহেবের মেযাজ চড়িয়া গেল। তাঁরই এক কালের চাকর, এখনকার প্রজা, আসিয়াছে তাঁকে নসিহত করিতে! যে লোক তাঁর নিমক খাইয়া মানুষ, তিনি দয়া করিয়া বিনা নযরে জমি দিয়াছেন বলিয়া যে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পাইয়াছে, এত বছরের খাযনা বাকী পড়া সত্ত্বেও তিনি যাকে আজো উচ্ছেদ করেন নাই, তিনি ইচ্ছা করিলেই যাকে কালই পথে বসিতে হইবে, সেই ছোটলোকটা আসিয়াছে কিনা তাঁকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে! তাঁর হাতের লাঠিটা কাঁপিয়া উঠিল। বসাইয়া দিবেন নাকি শয়তানের পিঠে দুই ঘা? না, সেটা দেখিতে ভাল হইবে না। এই হাড্ডি-সার বুড়ার গায়ে হাত তুলিয়া কি হইবে? আর, এর উপদেশের দামই বা কি? এর কথা না শুনিলেই ত হইল। উম্মী লোক আর পাগল একই বস্তু। পাগলে কি না কয়, আর ছাগলে কি না খায়!

তিনি শান্ত হইলেন। হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন: কেন? মামলায় আমি হাইরা যামু বইলা তোমার ভয় হৈতাছে?

কেরামত: না সাহেব, মামলায় আপনার হার-জিতের কথা আমি কইতাছি না। আমি কইতাছি এই কথা যে, আমি শান্তিতে মরবার চাই।

সরকার: আল্লা তোমার হায়াত দারায করুক। কিন্তু শান্তিতে মরায় তোমার বাধা দিতাছে কেটা?

কেরামত: বাধা কেউ দিতাছে না। আপনের খেলাফে নিমকহারামি করতে চাই না। আপনে যে উপকার আমার করছেন, পিঠের চামড়া দিয়া জুতা বানাইয়া দিলেও সে ঋণ শোধ দিতে পারমু না।

সরকার: নিমকহারামি করতে কইল কেটা তোমারে?

কেরামত: কেউ কইছে না সাব, আমার নিজেরই আখেরাতের লাগি সেটা করা লাগে।

সরকার সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন: তোমার নিজের আখেরাতের লাগি নিমকহারামি করা লাগবো? এই সব হেয়ালি কথা থুইয়া আসল কথাটা কৈয়া ফালাও ত।

কেরামত: ও-মামলা আপস না হৈলে আপনের খেলাফে আমার সাক্ষী দেওয়া লাগবো।

সরকার সাহেব তড়াক করিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। গর্জন করিয়া বলিলেন: কি, আমার খেলাফে তুমি সাক্ষী দিবা?

কেরামত বিন্দুমাত্র না ঘাবরাইয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া বলিল: জি হ সায়েব, আমি হক কথা না কৈয়া পারমু না।

সরকার সাহেব চোখ গরম করিয়া বলিলেন: কোন্‌টা হক কথা?

কেরামত: আপনে যে আমির আলির যামিন হৈছিলেন এইটা। আমার সামনে হৈছেন।

সরকার সাহেব বজ্রমুষ্টিতে চেয়ারের হাতল ধরিয়া স্প্রীংএর মত খাড়া হইয়া উঠিলেন। বলিলেন: কে তোমারে এই কথা শিখাইছে? আমির আলি তোমারে কত টাকা দিছে?

কেরামত বসিয়া বসিয়াই মুখ উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান সরকার সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল: আমির খাঁ আমারে টাকাও দিছে না, শিখাইছেও না। আমার ঈমানই আমারে কইতাছে এই হক কথা কইবার লাগি।

ব্যঙ্গ করিয়া সরকার সাহেব বলিলেন: ভারি আমার ঈমানদার রে! যা হারামযাদা, আমার সামনে থাইকা দূর হ। নিমক খাইছিস যখন, তখন নিমকহারামি ত করবাই, এটা জানা কথা। যা, উপকারীর খেলাফে

যত পারস মিছা সাক্ষী দে গিয়া। আমার পক্ষে আল্লাই আছে। আমি কোনো সাক্ষীর পরোয়া করি না। বাইর হৈয়া যা আমার বাড়ি থাইকা।

বৃদ্ধ কেরামত কাঁপিতে-কাঁপিতে বাহির হইয়া গেল। আর কোনো কথা বলিল না।

সে যখন দশ হাত দূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন চিৎকার করিয়া সরকার সাহেব বলিলেন : আর শোন্, ভাল ঈমানদারের মত আমার জমিটাও শীগ্‌গির ছাইড়া দিস।

সরকার সাহেব ঐ গমনশীল বৃদ্ধ নিমকহারামের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মানুষ এত নিমকহারাম হইতে পারে, তিনি তা আগে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অথচ সেই কিনা করিয়া গেল ঈমানের বড়াই। ভণ্ডামির একটা সীমা থাকা চাই ত? একটা মূঢ় উম্মী লোক, পরের জমিতে বাউলিয়া থাকে, খাযনা দেয় না তিন বছর ধরিয়া। সে আসিয়াছে কিনা সরকার সাহেবকে ঈমানদারি শিখাইতে! সরকার সাহেবের ঈমান-আমান আছে কি না, সেটার বিচার করিবে আল্লাহ্। এইসব বেনমাযী ছোটলোকেরা তার বিচার করিবার কে? এই হারাম-যাদা কেরামতকে সরকার সাহেব চিনেন না? সারা জীবনই ত সে সরকার সাহেবের চাকুরি করিয়া কাটাইয়াছে। কয় রেকাত নমায সে পড়িয়াছে? কয়দিন সে রোযা রাখিয়াছে? এই বেনমাযী, বেরোযায়ী জাহেলটা আসিয়াছে কিনা সরকার সাহেবকে ধর্ম দেখাইতে! যেমন সে আসিয়াছিল বেতমিযি করিতে, জবাবটাও পাইয়াছে তার উপযুক্ত। সরকার সাহেবকে এরা কি বোকা ঠাওরাইয়াছে নাকি? তিনি কি মেয়ে মানুষ নাকি যে যার-তার ধমকে কাঁপিয়া উঠিবেন?

সরকার সাহেব বৈঠকখানা ছাড়িয়া বিজয়ীর গর্বে অন্দরের দিকে চলিলেন। না, আজই বিবি সাহেবের কাছে সত্য কথা খুলিয়া বলিবার যে সংকল্প খানিক আগে তিনি করিয়াছিলেন, সেটা তবে আজ আর বলা চলে না। বলিতেই যদি হয়, তবে সেটা আরেক দিন বলিলেই চলিবে। আজ এই ঘটনার পর সেটা কিছুতেই বলা চলে না। কেরামত

মনে করিবে, তার ধমকে তাঁর ধর্ম-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে। ঐ নিমকহারাম ছোট লোকটার কাছে সরকার সাহেব নিজেকে অমন ছোট করিতে পারেন না। আর কেরামতের মত লোকের অমন আস্পর্ধা হইলই বা কেমন করিয়া যে, সে আসে নিজের মনিবকে উপদেশ দিতে? উপদেশ ত নয়, দস্তুর মত ডর দেখানো। হয় আমির আলির সাথে আপস করুন, নইলে আমি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিব, আমি নিজে আপনাকে দস্তখত করিতে দেখিয়াছি। এঃ কত বড় আস্পর্ধা! সরকার সাহেবের বাড়িতে আসিয়া ডর দেখাইয়া যায়! এটা কেরামতের মাথায় আসে নাই। আমির আলিই নিশ্চয় তাকে টাকা দিয়া বাধ্য করিয়াছে। তা যদি হয়, তবে আমির আলি মনে মনে হাসিবে। সেটা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করা হইবে না। শুধু আমির আলিরও এত বড় সাহস হইতে পারে কি? নিশ্চয় শরাফত মণ্ডলও এর পিছনে আছে।

এতক্ষণে সরকার সাহেবের মনে পড়িল, একদিন কেরামতকে তিনি শরাফত মণ্ডলের বাড়ির দিক হইতে আসিতে দেখিয়াছিলেন। নিশ্চয় সেই শয়তানটাই কেরামতকে বাধ্য করিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সরকার সাহেবের দুশ্‌মনরা তাঁকে অপদস্থ করিবার জন্য জোট বাঁধিয়াছে। এই জোট-বাঁধা দেখিয়া সরকার সাহেব ভয় পাইবেন? সরকার সাহেব যদি অপরাধ করিয়া থাকেন, তবে আল্লার কাছেই করিয়াছেন। তিনি সে গোনা-খাতার জন্য মাফ চাইবেন, হাজার বার তওবা করিবেন, যতদিন আল্লাহ্‌ তাঁকে মাফ না দেন, ততদিন কাফ্‌ফারা দিবেন। প্রয়োজন হইলে প্রকাশ্যভাবে নিজের অপরাধ স্বীকার করিবেন। সেটা করিবেন তিনি নিজের নাজাতের জন্য, নিজের গরযে, নিজের ইচ্ছায়। তাঁর দুশ্‌মনরা ডর দেখাইয়া তাঁকে সে কাজে বাধ্য করিবে, এটা কিছুতেই হইতে পারে না। তা যদি তিনি করেন, তবে সেটা করা হইবে মানুষের ভয়ে, আল্লার ভয়ে নয়। আল্লাহ্‌ তবে তাঁর গোনাহ্‌ মাফ করিবেন কেন?

না, সরকার সাহেব তা করিতে পারেন না। তিনি আপাততঃ কিছুতেই নিজের অপরাধ স্বীকার করিতে পারেন না। এটা স্থির।

চৌদ্দ

সেদিন রাত্রে খাওয়ার সময় বিবি সাহেব বলিলেনঃ একটা কথা শুন্ছেন? আব্বাস মণ্ডল আমির আলিরে টাকা ও চাউল দিয়া সাহায্য করছে। সে নাকি আমির আলির ছোট ছেলেটাকে পোষ্যিও নিবে। আব্বাস মণ্ডল না আপনার কি রকম ফুফাত ভাই হয়? সে না আপনার দলের লোক? আপনে না তার বহুৎ উপকার করছেন? সেই গেল আজ মামলার সময়ে আমির আলির সাথে কুটুম্বিতা করতে? কলিকালে মানুষ চিনা বড় দায়।

সরকার সাহেব উত্তরে শুধু একটা 'হুম্' বলিলেন। তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন শরাফত মণ্ডলরা নিশ্চয় একটা ষড়যন্ত্র লাগাইয়াছে। শুধু তাই নয়, সেই ষড়যন্ত্রে সরকার সাহেবের আত্মীয়-স্বজনকেও ভিড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। একাদিক্রমে আঠার বৎসর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টি ও এ অঞ্চলের একচ্ছত্র মাতব্বরি করায় অনেক শালারই তিনি চক্ষুশূল হইয়াছেন। এতদিনে সব শালারা জোট বাঁধিতেছে। তাদের জোটের সামনে সরকার সাহেবকে পরাজিত হইলে চলিবে না। তাঁকে সকল দিক দিয়া অতি সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে।

অতএব আমির আলির ব্যাপারে সত্য কথা বলিয়া তওবা করিবার সময় এটা নয়। এখন সেকাজ করিতে গেলে দুশ্‌মনদেরই আশকারা দেওয়া হইবে। তাদের হাতে পরাজয় স্বীকার করা হইবে। সরকার সাহেবের ধর্ম-ভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুশ্‌মনরা তাঁর এবং তাঁর বংশের অনিষ্ট করিবে, এটা তিনি কিছুতেই হইতে দিতে পারেন না। এই সব ছোটলোক নিমকহারামদের মন কত ছোট, সরকার সাহেবের তা অজানা নাই। একবার বাগে পাইলে এরা সরকার সাহেবকে বেইয্‌যতির একশেষ করিবে। সরকার সাহেব যে উচ্চ মন লইয়া এই অপরাধ স্বীকার করিতে যাইতেছিলেন, সে উচ্চমনের কদর এই সব নীচমনা লোকেরা করিবে না। সেটা হইবে উলু বনে মুক্তা ছড়ানো।

না। সে উদারতার উপযুক্ত এরা নয়। সরকার সাহেবের সরল ঈমানদারি দেখাইবার সময়ও এটা নয়। খোদা খোদা করিয়া এই বিপদটা কাটিয়া যাউক, দুশ্‌মনদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাউক, তারা বুঝুক ওসমান সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সোজা ব্যাপার নয়, সব ব্যাটার দাঁত ভাঙ্গুক। তারপর একদিন সকল সত্য প্রকাশ করিয়া আল্লার কাছে তওবা করিলেই চলিবে। তখন সরকার সাহেব একবার 'আল্লার ঘর' যিয়ারত করিয়া আসিবেন।

তারপর সরকার সাহেব একদিন শহরে গিয়া শুনিয়া আসিলেন, তাঁর বরাবরের দুশ্‌মন বুড়া সিরাজুদ্দীন মোক্তার আমির আলির কেস্ নিয়াছেন। সিরাজুদ্দীন মোক্তার দুই তিন বছর ধরিয়া মোক্তারি ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি ডাক্-সাইটে মোক্তার ছিলেন। বাতরোগে আক্রান্ত হওয়ায় এবং দুই ছেলে এখন মোক্তার হওয়ায় তিনি প্রাক্‌টিস্ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন। সেই সিরাজ মোক্তার যখন এতদিন পরে মরিচা-পড়া জিভ্‌টা শানাইয়া এবং ময়লা চাপকান শামলা মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিয়া আদালতে হাযির হইতে যাইতেছেন, তখন নিশ্চয় এর ভিতরে কিছু আছে। সিরাজ মোক্তার শহরে বাড়ীঘর করিয়া থাকিলেও এই অঞ্চলেরই লোক। পাশের গ্রামে তাঁর পৈত্রিক ভিটাবাড়ীও আছে। সরকার সাহেবকে হারাইয়া তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য দুই তিন বার চেষ্টা করিয়াছেন। শিক্ষার গরিমায় তিনি সরকার সাহেবকে অশিক্ষিত মূর্খ বলিয়া বহুৎ প্রচার-প্রচারণাও করিয়াছেন। কিন্তু সরকার সাহেবকে হারাইতে পারেন নাই। সেই রাগে তিনি গ্রামবাসীকে গাল দিয়া গ্রামের বাড়ীতে আসাই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাও আজ ছয় সাত বছরের কথা। এতদিন পরে লোকটা সরকার সাহেবের উপর প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইয়াছে। সিরাজ মোক্তার বড় শক্ত লোক। এ লোকের পাল্লায় যে একবার পড়িয়াছে, তাকে নাজেহাল হইতে হইয়াছে। শুধু সরকার সাহেবকেই তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। এতদিনের রাগ ঝাড়িবার সুযোগ পাইলে তিনি সরকার সাহেবকে অল্পে ছাড়িবেন না। অতএব সরকার সাহেবকে আরো বেশী সাবধান হইতে হইবে।

সিরাজ মোক্তার সম্পর্কে বিবি সাহেবের চাচাতো ভাই। কিন্তু সরকার সাহেবের সহিত দুশ্‌মনি করেন বলিয়া তিনি বহুদিন ধরিয়া চাচাতো ভাইর মুখ দেখেন না। তবু সরকার সাহেব এ খবরটা বিবি সাহেবকে না দিয়া পারিলেন না। আব্বাস মণ্ডল লইয়া বিবি সাহেব যে খোঁটা দিয়াছেন, তারও একটা জবাব দেওয়া চাই।

বাড়ী গিয়াই সরকার সাহেব বলিলেনঃ শুন্‌ছ তোমার গুণের ভাই সিরাজ মোক্তারের কথা? সে আমির আলির পক্ষে মামলা লইছে। সে নাকি জেরা কইরা আমারে কাঠগড়ায় কান্দাইয়া ছাড়ব।

বিবি সাহেব ঘৃণার ভাব গোপন না করিয়া বলিলেনঃ ও শয়তানের নাম আমার সামনে করিয়েন না। তবে আপনেরেও কইতাছি, অখন থাইকাই মামলার তদবিরের দিগি ভালা কইরা মন দেন।

সরকার সাহেব শুধু একটু হাসিলেন। বুঝাইলেনঃ তোমাকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমি আগেই সাবধান হইয়া গিয়াছি।

এরপর সরকার সাহেবের কর্মতৎপরতা ভীষণ বাড়িয়া গেল। নিজের পক্ষের সাক্ষী যোগাড়ে এবং অপর পক্ষের সাক্ষী ভাঙানিতে তিনি দিন-রাত বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি দিন-রাত মামলা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতেন না। এতদিন সরকার সাহেব যে মামলাকে সত্য ও অসত্যের মামলা মনে করিতেন এবং নিজের পক্ষকে অসত্য মনে করিয়া মনে মনে লজ্জা পাইতেন, সেইটাই আজ হইয়া উঠিল দুই প্রবল পক্ষের বৈষয়িক মামলা। কোন্ পক্ষ হক আর কোন্ পক্ষ নাহক, সে প্রশ্ন আর থাকিল না। কোন্ পক্ষ হারিবে আর কোন্ পক্ষ জিতিবে, সেইটাই একমাত্র প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইল। মনে মনে তিনি এ অঞ্চলের সকলের দুইটা তালিকা তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন। একটা তালিকা তাঁর পক্ষের, অপরটা বিপক্ষের। এই তালিকা অনুসারে তিনি বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্ন উপলক্ষে সকলের সাথে দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। পক্ষের লোককে নিজের পক্ষে আরো শক্ত করিতে এবং বিপক্ষের লোককে নিজের পক্ষে ভিড়াইতে তিনি সকলপ্রকার ফন্দি-ফিকির খাটাইতে লাগিলেন।

সরকার সাহেবের মনে শান্তি আসিল। দিনরাত বিবেকের দংশনে যে কষ্ট পাইতেছিলেন, সেটা নিঃশেষে দূর হইল। তাঁর অসুখ-অসুখ ভাব কোথায় চলিয়া গেল। শরীর তাঁর আগের চেয়েও ভাল হইয়া গেল। কর্ম-ক্ষমতা তাঁর আগের চেয়ে দ্বিগুণ হইয়া গেল। যুবকের শক্তি ও উদ্যম লইয়া তিনি ভন্‌ভন্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

মিত্রপক্ষের সকলে এবং শত্রুপক্ষের অনেকে বলাবলি করিতে লাগিল: সরকার সাহেবের মুখে একটা নূরানী জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এতেই বোঝা যায় সত্য কোন্‌ দিকে।

ইতিমধ্যে সরকার সাহেব খবর পাইলেন, ঈদু শেখ ওমর বেপারীর দস্তখত প্রমাণের জন্য আমির আলির পক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজী হইয়াছে। সরকার সাহেব ভিতরে ভিতরে বিস্মিত হইলেও বাইরে উল্লাস দেখাইয়া বলিলেন: এটা নিশ্চয় শরাফত মণ্ডলের কাজ। শরাফত মণ্ডল লড়াইএ নামিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। এবার সমানে সমানে লড়াই হইবে। এতে জিতিয়া আনন্দ আছে। এতদিন আধমরা এতিম আমির আলির সহিত লড়াইএ তাঁর জুত লাগিতেছিল না।

সরকার সাহেবের চরেরা অনেক কথাই তাঁর কানে আনিতে লাগিল। তিনি শুনিলেন আমির আলি তাঁর বিরুদ্ধে নূতন নূতন মিথ্যা বানাইয়া গ্রামময় ছড়াইতেছে। ও-পাড়ার রহমত খাঁ মরিবার সময় নগদ পঁচিশ টাকা ও চার পোড়া খরিদা জমি সরকার সাহেবের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। রহমত খাঁর নাবালক পুত্র হুরমত সাবালক হইলে তাকে উহা ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। সরকার সাহেব সে টাকা গাপ করিয়াছেন; জমিগুলি নিজের নামে বন্দোবস্ত লইয়াছেন। সরকার সাহেবের আপন ফুফাতো বোন বিধবা হওয়ার পর দেবরদের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া তিন শ টাকার জেওরের একটা পোঁটলা ও এক হাঁড়ি টাকা কাপড়ের নীচে করিয়া ডুলিতে চড়িয়া সন্ধ্যার সময়ে মামাতো ভাই ওসমান সরকারের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সে বিধবার ছেলেরা সে টাকা ও গহনার মুখ আর দেখে নাই। এই ধরণের অনেক কথা রোজ সরকার সাহেবের কানে

আসিতে লাগিল। এসব মিথ্যা ও অর্ধ-সত্যের বিরুদ্ধে সরকার সাহেবের লড়াই শুরু হইল।

অল্পদিনের মধ্যেই আমির আলির জামিননামায় দস্তখতের কথা তলাইয়া গেল। ব্যাপার এমন ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইল যাতে সরকার সাহেব ফরিয়াদী ও আমির আলি আসামী থাকিলেন না। তার বদলে শরাফত মণ্ডলের পরিচালিত আমির আলি ফরিয়াদীতে এবং সরকার সাহেব নিজে নিরপরাধ আসামীতে পরিণত হইলেন। দেশের যত বদমায়েশ লোকগুলা যেন একজন নিরীহ বেকসুর ভাল মানুষের বিরুদ্ধে লড়াইর আয়োজন করিতেছে। এ লড়াইএ সরকার সাহেব হারিলে এ অঞ্চলে আর কোনো ভাল মানুষ বাস করিতে পারিবে না। এ অঞ্চলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল ভাল মানুষের জন্য, এ অঞ্চলের সুনামের খাতিরে সরকার সাহেবকে এ মামলায় জিতিতেই হইবে।

এইভাবে সরকার সাহেবের কাছে এ মামলার মর্যাদা বাড়িয়া গেল। এতদিন ছিল এটা দুই প্রবলের বৈষয়িক মামলা, দুই প্রবল পক্ষের একটা ফুটবল খেলা। হার-জিতই ছিল সে মামলার একমাত্র কথা।

কিন্তু আজ আর তা থাকিল না। সরকার সাহেবের বিবেচনায় এটা ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধ। এ অঞ্চলের সুনাম দুর্নামের প্রশ্ন এতে জড়িত। এ আতরাফে ভাল মানুষ থাকিতে পারিবে কি না, এই ইউনিয়নের নেতৃত্ব কতিপয় বদমায়েশের হাতে যাইবে কি না, আজিকার প্রশ্ন সেই প্রশ্ন। এটা সাধারণ হার-জিতের প্রশ্ন নয়। এটা কারবালার ময়দানে এযিদের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে হযরত ইমাম হুসেনের লড়াই।

কেন নয়? একটা বিষয়ে সরকার সাহেব দোষী অপর পক্ষ নির্দোষ, এটা ঠিক। কিন্তু আর বিশটা বিষয়ে অপর পক্ষ দোষী, সরকার সাহেব নির্দোষ। দুই পক্ষের ঝগড়ার কারণগুলি একটা একটা করিয়া আলাদা বিচার করিয়া দোষী নির্দোষ ঠিক করা হয় না। সবগুলি একত্রে বিচার করিয়াই তা ঠিক করা হয়। সে-বিচারে সরকার সাহেবের দুশ্‌মনরাই নিঃসন্দেহে দোষী, সরকার সাহেব নির্দোষ। এই দোষী

নির্দোষের লড়াইএ সরকার সাহেবের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। তাঁকে সত্যের খাতিরেই এ লড়াই ফতেহ্ করিতেই হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের বলও বাড়িয়া গেল। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও আর্থিক বলের সহিত নৈতিক বলও যোগ দিল। অতঃপর সরকার সাহেব নৈতিক স্তরে দাঁড়াইয়া নৈতিক বলেই একমাত্র খোদাকে ভরসা করিয়া সারা গ্রামের এযিদ ও-শিমারদের বিরুদ্ধে ধর্ম-যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

এযিদ শিমারেরা নিত্য নূতন কুৎসার তীর-নেযা সরকার সাহেবের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়া চলিল। এই সব কুৎসার প্রায় সবগুলিই মিথ্যা। দিনরাত এই সব মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়িতে লড়িতে নিজের নির্দোষিতা সম্বন্ধে সরকার সাহেবের ধারণা এত বদ্ধমূল, বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া উঠিল যে, তাঁর সারা জীবনটাই তাঁর চোখে একটি নির্মল সাদা ধপধপে চাদর বলিয়া প্রতীত হইল, তাতে কলঙ্কের একটিও যেন দাগ নাই।

এই নির্দোষিতা-বোধ অবশেষে আমির আলির মামলা পর্যন্ত প্রসারিত হইল। তিনি প্রথমে ভাবিতে, পারে বলিতে এবং অবশেষে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন যে, তিনি আমির আলির যামিননামায় সত্যই কখনো দস্তখত দেন নাই।

নিজেকে তিনি যখন হইতে কারবালার ময়দানে এযিদ-বাহিনী-পরিবেষ্টিত ইমাম হুসেন মনে করিতে লাগিলেন, তখন হইতে তিনি দুশ্‌মনদের তীর-নেযা-খঞ্জরের জন্য নিজেকে চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত রাখিতে লাগিলেন। আসিতও সত্যিসত্যি রোজই তীর-নেযার আঘাত নিত্য-নূতন কুৎসার আকারে। এটাতে তিনি এতই অভ্যস্ত হইয়া গেলেন যে, কোনোদিন সে আঘাত না আসিলে কেমন যেন খালিখালি লাগিত। দুশ্‌মনদের এই অন্যায় আঘাতের মুখে একটা শহিদী-শহিদী মনোভাব সরকার সাহেবের এমনি একটা গর্বের বস্তু হইয়া গেল যে, কোনোদিন শত্রুপক্ষ তাঁর নিন্দা কুৎসা না করিলে তিনি নিরাশ, এমন কি দুঃখিত হইতেন। তাঁর শত্রুপক্ষ কি তাঁর প্রতি হামলা বন্ধ করিয়াছে? তারা কি এত ভালমানুষ হইয়া গিয়াছে? এটা সম্ভব নয়। ওদের পক্ষে এত ভাল হওয়া অসম্ভব, অস্বাভাবিক। ওরা ভাল হইয়া যাক, এটা সরকার সাহেব পসন্দ

করিতেন না। ওরা যে পরিমাণ ভাল হইবে, সরকার সাহেব যেন সেই পরিমাণ খারাপ হইয়া যাইবেন। ওরা খোদার যত নিকটে যাইবে, সরকার সাহেব যেন খোদা হইতে তত দূরে সরিয়া পড়িবেন। তাই ওদের ভাল হওয়াটাতে সরকার সাহেব ভয় পাইতেন। উহু, ওদের ভাল হওয়া অসম্ভব, অস্বাভাবিক।

কাজেই ওরা সরকার সাহেবের কুৎসা রটনা বন্ধ করে নাই। তাঁর চরেরা রিপোর্ট দিতেই শৈথিল্য করিতেছে। চরেরা রিপোর্ট না দিলেও আজ দুশ্‌মনেরা কি বলিয়াছে, সেটা সরকার সাহেব অনুমানেই বুঝিতে পারিতেছেন। সরকার সাহেব বেওকুফ নন। দুশ্‌মনদের হাড়ে হাড়ে চিনিতে তাঁর বাকী নাই। আজ দুশ্‌মনেরা বলিয়া বেড়াইতেছে: আমি নাকি আমার স্ত্রীর ভয়েই জামিননামার দস্তখত স্বীকার করিতেছি না।

ওসমান সরকার তাঁর স্ত্রীর ভয়ে সত্য গোপন করিতেছেন? যে ওসমান সরকার একাদিক্রমে আঠার বৎসর এ অঞ্চল শাসন করিলেন, তিনি ভয় পান তাঁর স্ত্রীকে! হতভাগারা ওসমান সরকারকে চিনে না। স্ত্রী কেন, দুনিয়ার কারো ভয়ে তিনি সত্য গোপন করেন না।

এইরূপ কল্পিত অভিযোগের তিনি রোজই জবাব খাড়া করিতেন। তিনি নিজে টেরই পাইতেন না যে, ঐ সব অভিযোগ তাঁর দুশ্‌মনেরা করে নাই; তিনিই নিজের বিরুদ্ধে ঐ সব অভিযোগ দুশ্‌মনদের মনে পুরিয়া দিতেছেন।

এইভাবে মামলার তারিখ নিকটবর্তী হইল। সরকার সাহেব মামলা চালাইবার এবং নিজে হলফ করিয়া জবানবন্দি করিবার জন্য এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পনের

ঢাকা সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের বিশাল সুরম্য প্রাসাদের এক কামরায় একটি যুবক টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। তার সামনে একটি পুস্তক খোলা। পুস্তকটির খোলা পাতায় রেডক্লু-

পেন্‌সিলের বড় বড় দাগ। কিন্তু যুবকটির সে দিকে নযর নাই। সে অদূরবর্তী মোমিনশাহী-গামী রেল লাইনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

এই যুবক ওসমান সরকারের পুত্র ওয়াজেদ আলি। সে দর্শনে অনার্সসহ এবার বি-এ দিবে। পরীক্ষার পড়া তৈয়ার করিতেছে। সেজন্য এবার বড়দিনের ছুটিতেও সে বাড়ী যায় নাই। বাপ-মাও যাইতে বলেন নাই।

কিন্তু আজ সে পড়া-শোনায় কিছুতেই মন বসাইতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে এবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, বাইরের দিককার বারান্দায় আসিল এবং কোমরের পিছনে তুই হাত বাঁধিয়া ঘাড় নীচু করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পায়চারি করিবার পর সে থামিল। বাঁ হাতের বুড়া আঙুল ও তর্জনীর দ্বারা চোখের ভূরু কচলাইয়া নিজেকে প্রশ্ন করিল : এখন আমি করি কি ? ব্যাপার যে ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠিতেছে।

ওয়াজেদ আলি সুন্দর পাতলা লম্বা একহারা গঠনের যুবক। স্বাস্থ্যটি খুব খারাপও নয়, খুব ভালও নয়। বয়স বছর বাইশেক। কিন্তু হঠাৎ দেখিলে আরও কম বয়সের মনে হয়।

তার চিন্তার কারণ এই : সপ্তাহ খানেক আগে সে মায়ের এক পত্র পায়। তাতেই সে আমির আলির জালিয়াতির মামলার কথা প্রথম জানিতে পারে। মা লিখিয়াছিলেন, এজন্য তার বাবা খুব চিন্তিত ; দিনরাত মামলার তদ্‌বিরে ব্যস্ত। তার বাবার মত এমন ভাল মানুষকেও আল্লা এমন বিপদে ফেলেন ! সবই আল্লার মর্যি। তবে চিন্তার কোনও কারণ নাই। সবাই বলিতেছে সরকার সাহেব মামলায় জিতিবেনই। আমির আলির জেল অবধারিত। ওয়াজেদ যেন নিশ্চিন্ত মনে পড়া-শোনা করে। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়া তার বাপের মুখ রক্ষার জন্য যেন আল্লার দরগায় মুনাজাত করে।

এই পত্র পাইয়া ওয়াজেদ অবাক হইয়া যায়। তার যেন মনে পড়ে তার বাবা একদিন তাকে বলিয়াছিলেন : আমির আলিটা আমার একটা

দস্তখত নিয়াই ছাড়িল। কোথায়, কবে, কেন বাবা একথা বলিয়াছিলেন, ওয়াজেদের তা এখন মনে পড়িতেছে না সত্য, কিন্তু একথা তার স্পষ্টই স্মরণ হইতেছে যে, আমির আলি খাঁর কোনো ঋণের জন্য বাবা যামিন হইয়াছিলেন। যামিন হওয়ার কথা ওয়াজেদ যাতে আর কারো কাছে, বিশেষতঃ মার কাছে না বলে, সেজন্য বাবা ওয়াজেদকে পুনঃ পুনঃ মানা করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া এই কারণেই ব্যাপারটা ওয়াজেদের এত স্পষ্ট মনে আছে। মাকে যাতে সে ব্যাপারটা বলিয়া না দেয়, সে উদ্দেশ্যে ওয়াজেদকে কয়েকদিন খুবই হুঁশিয়ার থাকিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাকে অনেক চেষ্টা করিয়া বাক্-সংযমও অভ্যাস করিতে হইয়াছিল।

নিজের বাপের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি সৎলোক, তাতে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিয়া মিছা কথা বলিতেছেন, এটাও সম্ভব নয়। তিনি হয়ত ব্যাপারটা ভুলিয়া গিয়াছেন। অথবা কোনও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে। তাই ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে ওয়াজেদ বাপের কাছেই পত্র লিখিয়াছিল। সে পত্রের জবাব আজই আসিয়াছে। বাবা লিখিয়াছেন, ওয়াজেদ আলি যা লিখিয়াছে সব ভুল। তিনি কস্মিনকালেও আমির আলি খাঁর কোনো যামিন হন নাই। কোনো যামিননামায় বা আমির আলির কোনো দলিলে দস্তখত দেন নাই। এটা ওয়াজেদ আলির কল্পনা মাত্র। সে বোধহয় স্বপ্ন দেখিয়াছে। এমন কুস্বপ্ন দেখা ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ওয়াজেদ বোধহয় পড়াশোনায় অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ করিতেছে। সেটা উচিত নয়। স্বাস্থ্যের দিকেও ওয়াজেদের নযর রাখা উচিত। রোজ আধসের করিয়া দুধ খাইতে তিনি ইতিপূর্বে ওয়াজেদকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ওয়াজেদ সে উপদেশ পালন করিতেছে কিনা, পত্রোত্তরে সে যেন তাঁকে তা জানায়।

সত্যই কি এটা ওয়াজেদের কল্পনামাত্র? সে কি সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছে? স্বপ্ন এটা কি করিয়া হইতে পারে? তখন ওয়াজেদের মনে পড়ে নাই, কিন্তু এখন দিব্য মনে পড়িতেছে, একদিন ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়া বাবা তাকে

ঐ কথাটা বলিয়াছিলেন। ঘোড়ার গাড়িতে সে বাবার সঙ্গে চড়িয়াছিল কবে? কেন চড়িয়াছিল? সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আরো খানিক ভাবিল। হ্যাঁ, এইবার মনে পড়িয়াছে। সে তখন জিলা স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। সে সাইকেলে যাতায়াত করিত। একদিন সাইকেল খারাপ হইয়া যায়। মেরামতের পয়সার জন্য ওয়াজেদ দোকানে গিয়াছিল। বাবা তখন সেখানে ছিলেন। তিনি জানান যে, তাঁরও সাইকেলটা খারাপ হইয়া যাওয়ায় তিনি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়াছেন, ওয়াজেদ তাঁর সঙ্গে চলুক। তিনি দোকানের কর্মচারীকে সাইকেলটা মেরামতের জন্য দিতে বলিয়া ওয়াজেদকে লইয়া গাড়িতে উঠেন। গাড়িটা যখন আফসর ভিলার সামনে আসে, তখন আমির আলি খাঁকে দেখিয়া বাবা কোচমানকে গাড়ি থামাইতে বলেন। ঘটনার এইটুকু ওয়াজেদের চোখের সামনে ছবির মত ভাসিতেছে। বাবার সাথে আমির আলি মিঞার কি কথাবার্তা হইয়াছিল, তা ওয়াজেদের মনে পড়িতেছে না সত্য, কিন্তু গাড়ি থামাইবার সময়েই বাবা যে আমির মিঞাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: তোমার কাজ হৈছে ত?—একথাটা ওয়াজেদের কানে আজো লাগিয়া আছে। আমির মিঞা ঐ প্রশ্নের কি জবাব দিয়াছিল, তা অবশ্য ওয়াজেদের মনে পড়িতেছে না। কিন্তু এটা ওয়াজেদের আবছা আবছা মনে পড়িতেছে যে, আমির মিঞা খুব হাসিমুখে জবাব দিয়াছিলেন এবং বাবাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর জবাব শুনিয়া বাবাও খুব খুশী হইয়াছিলেন। এর পরের ঘটনাটাই ওয়াজেদের স্পষ্ট মনে আছে, যেন কয়েক দিনের আগের কথা। আমির মিঞার কথার মধ্যে বাবার কি একটা দস্তখতের কথা ছিল। তাই আমির মিঞা বিদায় হইলে এবং গাড়ি আবার চলিতে শুরু করিলে ওয়াজেদ নিজেই দস্তখতের কথা জিজ্ঞাস করিয়াছিল। ওয়াজেদের সেই প্রশ্নের জবাবেই বাবা এই কথাটা বলিয়াছিলেন: আমির আলিটা আমার একটা দস্তখত নিয়াই ছাড়িল। বাবা আরো যেন কি কি বলিয়াছিলেন। আমির আলির কান্না-কাটি, মেয়েটার জন্যই বাবাকে এ কাজ করিতে হইল,—এই ধরণের আরো কি কি কথা বাবা বলিয়াছিলেন, সে সব ওয়াজেদের স্পষ্ট মনে নাই।

কিন্তু এ কথা মাকে বলিতে তিনি যে মানা করিয়াছিলেন, এটা তার খুব স্পষ্ট মনে আছে।

এসব কথাই স্বপ্ন হইতে পারে না। গাড়ি চড়াটাও কি স্বপ্ন? দিব্য মনে পড়িতেছে বাবা পিছনের সীটে ওয়াজেদ সামনের সীটে বসিয়াছিল। এটাও কি স্বপ্ন? আফসর ভিলার সামনে গাড়ি থামানো, আমির আলির সঙ্গে দেখা, সবই কি স্বপ্ন? না, হইতে পারে না। সে যতই ভাবিতেছে, ততই ঘটনাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সে পুনরায় কামরায় ঢুকিয়া চেয়ারে বসিল। টেবিলের বইগুলির উপর চোখ ফিরাইল। এখন তবে আমি করি কি?—ঘুরিয়া ফিরিয়া এই একই প্রশ্ন ওয়াজেদ নিজেকে করিল। প্রশ্নের উত্তর সোজা নয়, এটা সে বুঝিল। ধর, যদি আমির আলি মিঞা নির্দোষ হইয়া থাকেন, এবং ওয়াজেদই যদি একমাত্র সাক্ষী হইয়া থাকে যে তাঁকে বাঁচাইতে পারে, তবে ওয়াজেদের কর্তব্য কি? বোধ হয় সেই একমাত্র সাক্ষী। মা ত তাঁর পত্রে স্পষ্টই লিখিয়াছেন, আমির আলি বাবার দস্তখতের একটা সাক্ষীও জোগাড় করিতে পারেন নাই। তবে ওয়াজেদ কি করিবে? মামলার তারিখ তার মার পত্রে লেখা ছিল। দেওয়ালে লটকানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয়া দেখিল সে তারিখের আর বেশী দেরি নাই। কাজেই তার কর্তব্য ঠিক করিতেও বেশী বিলম্ব করিবার উপায় নাই।

বাবা লিখিয়াছেন যে, তিনি কোনো কালে কোনো ব্যাপারে আমির আলির জন্য কোনো দস্তখত দেন নাই। কাজেই এই মামলার বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের দস্তখতের কথা ওয়াজেদের মনে হইতে পারে বলিয়া সে এতদিন নিজের বাবাকে সমর্থনের যে চেষ্টা করিতেছিল, বাবার এই মুখ-পুছা 'না'-তে তার সে যুক্তিও আর টিকিতেছে না।

বাবা বুড়া হইয়াছেন, এখন তাঁর স্মৃতি-শক্তি দুর্বল হইয়া থাকিতে পারে, এটা দর্শনের ছাত্র ওয়াজেদ সেদিনও বই-পুস্তকে পড়িয়াছে। এইটাই সম্ভব। তিনি ইচ্ছা করিয়া—ওয়াজেদ আর ভাবিতে পারিল না। সাংসারিক অনেক বিষয়ে বাবার কাজ-কর্ম তার পসন্দ হয় নাই,

তাঁর অনেক কথা অনেক কাজ আদর্শবাদী দর্শনের ছাত্রের বুকে বাজিয়াছে সত্য। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়া এমন—এই ধরণের কাজ করিতে পারেন? উঁহু, কিছুতেই না।

ভয়ে ওয়াজেদের চোখ বন্ধ হইয়া আসিল।

কিন্তু যদি সাক্ষীর অভাবে নিরপরাধ আমির আলির জেল হয়, তবে ওয়াজেদ কি জীবনে আর সুখী হইতে পারিবে?

সে আর চেয়ারে বসিয়া থাকিতে পারিল না। চৌকির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া মাথার পিছনে হাত বাঁধিয়া ভাবিতে লাগিল।

ধর, যদি ওয়াজেদ আলি বাড়ি গিয়া বাবাকে সব কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা করে। এতে কি হৈচৈ পড়িয়া যাইবে না? বাবা কি এতে শরম্ পাইবেন না? আর যদি বাবা সব জানিয়া-শুনিয়াই কোনো বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে এই পন্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে কি তাঁকে সে পথ হইতে ফেরানো সম্ভব হইবে?

যদি তিনি না ফিরেন? ধরা যাক, তিনি ফিরিলেন না। তবে ওয়াজেদ কি করিবে? সে বাড়ি-খাওয়া কুত্তার মত লেজ গুটাইয়া চলিয়া আসিবে? না বাবার বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিয়া দুনিয়ার কাছে চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিবে: তোমরা দেখ আমার বাবা কেমন মিথ্যাবাদী?

ওয়াজেদের মাথা ঘুরিয়া গেল। তা যাক। তবু সে যদি এ ব্যাপারে একবার হস্তক্ষেপ করিতে যায়, তবে যতই অপ্রিয় হোক, ফলাফল যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাকে অগ্রসর হইতেই হইবে। মাঝখান হইতে সরিয়া পড়ার কোনো মানে হয় না। এদিক কি ওদিক, একদিক তাকে বাছিয়া লইতেই হইবে।

একদিকে দাঁড়াইয়া আছেন তার বাবা। সেই সৌম্য-মূর্তি স্নেহময় বাবা তাঁর মান-ইয্যত, সুনাম-সুযশ, ধন-দওলৎ লইয়া দাঁড়াইয়া পুত্রের মুখের দিকে কাকুতি-ভরা নয়নে চাহিয়া আছেন। আর অপরদিকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ওয়াজেদের কর্তব্য তাকে হাত ছানি দিয়া ডাকিতেছে। ওয়াজেদ আলি কোন্ দিকে যাইবে? সে স্পষ্ট শুনিতে

পাইল কে যেন তাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেঃ ন্যায়ের পথে থাকা সোজা কথা নয়। বই-পুস্তক পড়িয়া নীতিকথা ত খুব আওড়াও। এখন কেমন সোনার চাঁদ? নিজের পারিবারিক বিষয়ে প্রথম পরীক্ষাতেই যে তুমি হারিয়া যাইবে, তা আগেই জানিতাম। হোঃ হোঃ হোঃ! বিদ্রূপকারী গলায় গাম্ভীর্য আনিয়া আবার ওয়াজেদের কানে কানে যেন বলিলঃ এখানে অত ভাবিবার কি আছে? এটা তোমার বাপ না হইয়া যদি আরেক জনের বাপ হইত, তবে তুমি কি করিতে? এতক্ষণ তোমার মুখে ন্যায়-নীতির বক্তৃতায় ফেনা ছুটিত না কি?

ওয়াজেদ কঠোর নীতিবাদী। দুর্নীতি, কালাবাজার, মন্ত্রীদের আত্মীয়-প্রীতি প্রভৃতি ব্যাপারে ছাত্র-সভায় ও সাধারণ বক্তৃতা-মঞ্চে সে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করে এবং তার প্রত্যেক কথাই সে অন্তরের সংগে বিশ্বাস করে। ওয়াজেদ সেই শ্রেণীর তরুণ যারা বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে রাষ্ট্র-নায়ক ও সমাজ-নেতা প্রভৃতি সকল স্তরের মুরুব্বিদের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। আমাদের মুরুব্বিদের সকল আদর্শ-নিষ্ঠা স্বার্থ-চিন্তা ও আত্মীয়-প্রীতির পাষাণ-প্রাচীরে আছাড় খাইয়া ভাঙিয়া খান্-খান্ হইয়া পড়িতেছে, ইহাই ওয়াজেদের স্থির সিদ্ধান্ত।

কাজেই ওয়াজেদ নিজেকে গোড়াতেই হুঁশিয়ার করিয়া দিলঃ যাই কর ওয়াজেদ আলি, নিজের পারিবারিক সুখ-সুবিধার কথা এখানে তুলিও না। নির্ভাঁজ ন্যায়ের নিক্তিতেই ব্যাপারটা ওজন করিয়া নিজের কর্তব্য স্থির কর। আদর্শ-নিষ্ঠা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখ-সুবিধার ঊর্ধ্বে উঠিবে কিনা, তারই পরীক্ষা আজ তোমাকে দিতে হইবে। তুমি মন্ত্রীদের আত্মীয়-প্রীতির যে কঠোর নিন্দায় সেদিন আর্মানীটোলার ময়দানে পঞ্চাশ হাজার লোকের করতালি পাইয়াছিলে, সেটা ভণ্ডামি ছিল, না আন্তরিক ছিল, আজ তারই পরীক্ষা। তুমি এই সামান্য ব্যাপারে যদি ন্যায় ও সত্যকে কোরবানি দিতে পার, তবে এর চেয়ে বড় স্বার্থের ব্যাপারে মন্ত্রীদের ও এম-এল-এ-দের নিন্দা কর কোন্ মুখে? ধিক্ তোমাকে!

কে যেন আসিয়া ওয়াজেদের টুটি চাপিয়া ধরিল। সে যেন বলিলঃ

হে কাপুরুষ! সত্য বড়, না তোমার বাবার সুনাম-সুবিধা বড়? সত্যের জন্য নবীরা কি তাঁদের বাবাদের বিরুদ্ধে যান নাই?

না। ওয়াজেদ আর দ্বিধা করিবে না। একদিকে সত্য ও কর্তব্য, অপরদিকে স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতার মধ্যে দ্বিধা করিবার আছে কি? সে আজই বাড়ি যাইবে। বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বাবাকে অন্যায়ের পথ হইতে ফিরাইতে পারে ভাল, না হয় সে আদালতে সত্য কথা বলিয়া আমির মিঞাকে অন্যায় শাস্তি হইতে এবং বাবাকে আরো পাপকার্য হইতে রক্ষা করিবে। সে আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ি যাইবে।

সে প্রোভোষ্টের নিকট ছুটি লইবার জন্য কামরা হইতে বাহির হইল। সে থাকে দুতালার এক কামরায়। প্রোভোষ্ট বসেন একতালায়। সে লম্বা বারান্দা অতিক্রম করিয়া যখন সিঁড়ির মুখে আসিল, তখন সিঁড়িতে পা বাড়াইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তার মনে হইল এই সিঁড়ি যেন তাকে কোন অন্ধকার পাতালে লইয়া যাইবে। সে এক পা আগাইতে গিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিল। হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল।

সামনের বিস্তৃত আঙ্গিনা পার হইয়া তার দৃষ্টি সলিমুল্লাহ্ হলের চক-মিলানো বিশাল অট্টালিকার বারান্দায়-বারান্দায় ঘুরিয়া ফিরিয়া, সেখান হইতে তার দৃষ্টি আরো উচ্চে উঠিয়া সুউচ্চ সোনালী গুম্বজগুলির উপর নিবদ্ধ হইল। একটা একটা করিয়া অনেকগুলি গুম্বজ বেড়াইয়া তার দৃষ্টি ফের দুতালায় এবং দুতালা হইতে একতালায় নামিয়া আসিল। সকল কামরায় ও বারান্দায় ওয়াজেদের সহপাঠীদের কেউ পড়িতেছে, কেউ খেলিতেছে, কেউ গল্পগুযারি করিতেছে, কেউ পায়চারি করিতেছে। সবাই কর্মব্যস্ত। হলের সর্বত্র জীবনের চাঞ্চল্য। এই জীবনের এই কর্মচাঞ্চল্যের গোড়ায় কি? কিসে এই হল চলিতেছে? কার টাকায় এই বিশাল প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে? ওয়াজেদ কল্পনায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল এই বিশাল অট্টালিকার এক একটি ইট—ইট ত নয়—বাংলার ছোট বড় বাবাদের এক একটি হাড্ডি।

নিজেদের সন্তানদের সভ্য ও শিক্ষিত করিবার আশায় বাংলার

লক্ষ লক্ষ বাবা নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থের দ্বারা এই সুরম্য হর্ম্য নির্মাণ করিয়াছেন। আজো তাঁরা মাসে মাসে নিজেদের ছেলেদের জন্য টাকা পাঠাইয়া দিতেছেন। সে টাকা কোথা হইতে আসে, বাবারা কি উপায়ে সে টাকা যোগাড় করেন, ওয়াজেদরা তার খবর রাখে না, সে খবর রাখিতে কেউ তাদের উপদেশ দিলে তারা চটিয়া যায়। ছেলের প্রয়োজনের জন্য কত বাবা কত উপায়ে রোজগার করিতেছেন, কত বাবা বাড়ি বন্ধক দিয়া কর্জ করিতেছেন, কত বাবা হয়ত অন্যায় উপায়েও রোজগার করিতেছেন। কিন্তু সবই করিতেছেন তাঁরা নিজেদের সন্তানদের জন্যই।

ওয়াজেদ কল্পনায় দেখিল, বাংলার বাবারা ছেলেদের নামে টাকা মনি-অর্ডার করিবার আশায় পোষ্টাফিসের সামনে প্রচণ্ড রৌদ্রে কি করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ওয়াজেদ নিজের বাবাকেও সেই ভিড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল। তিনি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের সবল লোকদের ঠেলাঠেলিতে অতিকষ্টে কাতারে নিজের জায়গা রক্ষা করিতেছেন। তিনি কাকুতি-মিনতি করিয়া পাশের লোকদের বলিতেছেনঃ আমার ছেলের টাকা যথাসময়ে না পৌছিলে কলেজে তার নাম কাটা যাইবে। হোষ্টেলে তার খানা বন্ধ হইবে।.........

ওয়াজেদের চোখ আঁসুতে ঝাপ্সা হইয়া আসিল। সে কি করিতে যাইতেছে? এই বাবার বিরুদ্ধেই সে লড়াই করিতে যাইতেছে? সে বাপের একমাত্র পুত্র। তার জন্য বাবা কিনা করিতেছেন? তাঁর আশা-ভরসা, বংশের উন্নতি-অবনতি সবই নির্ভর করিতেছে ওয়াজেদের উপর। ওয়াজেদ বড় হইয়া বাবার মুখে হাসি ফুটাইবে, বংশ উজ্জল করিবে—এই রকম কত স্বপ্নই না বাবা দেখিতেছেন। সেই ওয়াজেদ কিনা বাবাকে দুনিয়ার কাছে মিথ্যাবাদী সাজাইবার, তাঁকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে! তারপর তার মা? তিনি কি একেবারে ভাঙিয়া পড়িবেন না? কেন সে মাকে এত বড় আঘাত দিবে? তাঁর অপরাধ কি? যে বাপ-মার পায়ের তলে বেহেশ্ত, সেই বাপ-মার এমন চরম দুশ্মনি সে করিবে?

কিসের জন্য? শুধু এইজন্য যে, একটা ঘটনা ওয়াজেদের মনে এক-

রকমে স্মরণ আছে। ওয়াজেদের স্মৃতিশক্তি কি অভ্রান্ত? সেকি কোনো কথা ভুলে না? তার কি ভুল হইতে পারে না? এ অহঙ্কার কেন? সে কি পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পায়? পরীক্ষার খাতায় ত সে অহরহই কত ভুল করিতেছে। আর তার বাবা? স্মৃতি-শক্তি কি তাঁর এতই খারাপ? মাসের ঠিক পয়লা সপ্তাহে টাকা মনিঅর্ডার করিতে তিনি কোনো দিন ভুল করিয়াছেন? কতদিন কত ব্যাপারে ত ওয়াজেদ বাবার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির প্রমাণ পাইয়াছে। তবে এই ব্যাপারটায়ই বা তিনি ভুল করিবেন কেন? ভুল যদি না হয়, তবে ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা তিনি বলিতেছেন? কাল জোরের সাথে বাবা লিখিয়াছেন, ওয়াজেদ হয় স্বপ্ন দেখিয়াছে, নয়ত ওটা তার কল্পনা। পাকা বদমায়েশ ছাড়া এত জোরের সাথে কেউ মিথ্যা বলিতে পারে? তার বাবাকে কি সে এত বড় পাকা বদমায়েশ মনে করে? ছিঃ, ওয়াজেদ বাবাকে কোনোদিন দেখিয়াছে এত বড় বদমায়েশি করিতে?

তারপর আদালত আছে, আইন আছে। আদালতের আইনজ্ঞ হাকিমরা সত্য-মিথ্য বুঝিবেন না, ওয়াজেদই সত্য-মিথ্যা বুঝিবার একমাত্র যোগ্য লোক, এতবড় দেমাগ তার আসিল কোথা হইতে? সুতরাং ব্যাপারটায় অপরিপক্ক ওয়াজেদের হস্তক্ষেপ করা কি উচিত? তার বদলে পাকা-মাথা আদালতের উপরই উহার বিচার-ভার ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত নয় কি?

ওয়াজেদ দর্শনের ছাত্র। লজিকে সে বরাবরই ভাল ছেলে। ছাত্র-মহলে সে র‍্যাশন্যালিষ্ট বলিয়া খ্যাত। সব জিনিসেরই দুদিক দেখার ক্ষমতার তার সুনাম আছে।

কাজেই যুক্তিবাদী চিন্তার ধারাপথে অতি সহজেই সে নিজের জ্ঞান-গর্বের ত্রুটি ধরিতে পারিল। এতক্ষণ সে যাকে নিজের আদর্শ-নিষ্ঠা মনে করিতেছিল, এখন সেটাই তার কাছে নিতান্ত উগ্র অহংকার ও সত্যনিষ্ঠার দাম্ভিকতা মনে হইতে লাগিল। বি-এ-তে তার সেকেণ্ড ল্যাংগুয়েজ ফারসী। মহাকবি সাদীর অমর উক্তি তার মনে পড়িয়া গেল: তাকাব্‌বুর আযাযিলেরা হারে কর্দ—দাম্ভিকতাই আযাযিল ফেরেশ্‌তার অধঃপতন ঘটাইয়াছিল। তরুণ বয়সেই ওয়াজেদের মনে সেই তাকাব্বরি ঢুকিয়াছে? কি শরমের কথা!

ওয়াজেদের মনে শান্তি আসিল। সে বাড়ি যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিল। সুতরাং প্রোভোষ্টের সঙ্গে দেখা করারও আর দরকার নাই। সে নিজের কামরায় ফিরিয়া আসিল।

তার কামরায় কায়েদে-আজম, মহাত্মাজী, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ, নযরুল ইসলাম প্রভৃতির ছবি দেওয়ালে লটকানো ছিল। শেষোক্ত ছবিটাই ছিল তার টেবিলের উপরে। সে কামরায় ঢুকা মাত্র নযরুলের ছবিটা যেন অট্টহাসি করিয়া উঠিল। ওয়াজেদ নিজ কানে কাযী সাহেবের গান বহুবার শুনিয়াছে; তার দিল্‌খোলা হো-হো-ও অনেক শুনিয়াছে। এ যেন ঠিক সেই গলা। কাযী সাহেব যেন ওয়াজেদকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন: এবার ঠিক সিদ্ধান্ত করিয়াছ। তোমার বাবার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিও না। কারণ তাতে পরিণামে লোকসান হইবে তোমার নিজেরই। তোমার বাবার টাকা গেলে সে তোমারই টাকা গেল; তুমি যে বাপের একমাত্র পুত্র। নিজের স্বার্থ দেখিবে না ত কি করিবে? তুমি কি একটা গাধা যে পরের জন্য নিজের ক্ষতি করিতে যাইবে? ঠিক করিয়াছ, বন্ধু, ঠিক করিয়াছ। ধর্ম-কথা, ন্যায়-নীতির কথা? সে সব ত পরের জন্য। পরের বেলা বড় বড় কথা বলিও; পরে একটু ভুল করিলে, ন্যায়বিচারের একচুল এদিক-ওদিক করিলে সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া তাদের কশিয়া গাল দিও; খবরের কাগজে বড় বড় বুলি কপ্‌চাইয়া বিবৃতি দিও। কিন্তু নিজের বেলা সে সব কথা বেমালুম চাপিয়া যাইও। আস্তে আস্তে চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়া পাশ কাটাইয়া যাইও, ডুব দিয়া পানি খাইও। কেউ জানিতে পারিবে না। তারপর নিজের ব্যাপারটা মিটিয়া গেলেই আবার বুক টান করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইও এবং টেবিলে থাপ্পড় মারিয়া আবার ধর্ম-কর্ম, ন্যায়ের বুলি আওড়াইতে শুরু করিও। ধন্য ওয়াজেদ! জিতা রহো বন্ধু! তুমি বুদ্ধিমান। তুমি উন্নতি করিতে পারিবে। তুমি মন্ত্রী হইবে। হোঃ হোঃ হোঃ!

ওয়াজেদ আর এক পা নড়িতে পারিল না। নযরুল ইসলামের বিদ্রূপের কশাঘাত তার হাড়ে গিয়া বিঁধিতে লাগিল। দরজায় দাঁড়াইয়া সে কামরার ভিতরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিল। কায়েদে-আজম, গান্ধী,

রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল একে একে সবারই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সবাই যেন মৃদু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া নযরুল ইসলামের সমর্থন করিলেন।

ওয়াজেদের কান ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল ; সে চোখে অন্ধকার দেখিল। উত্তেজনায় তার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। সে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সে আস্তে-আস্তে হাত বাড়াইয়া বিছানা স্পর্শ করিল এবং তাতে ভর করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

সে ভাবিল : যদি আজ বাবার খাতিরে আমি ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন না করি, তবে সারা জীবন আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে ; আর কখনো কোনো ব্যাপারে আমি ন্যায়-নীতির কথা মুখে আনিতে পারিব না। এ শাস্তি, এ অধঃপতন আমি কি মানিয়া লইব ? না, না। খোদা ! আমাকে এতবড় শাস্তি দিও না। বাবা বাবা ! আমায় মাফ করুন।

সে লাফাইয়া উঠিয়া ক্ষিপ্তের মত এটা ওটা টানিয়া সুটকেস ভরিতে লাগিল। সে সন্ধ্যার ট্রেণ ধরিবেই।

আবার বাবা-মার মুখের ছবি তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বাবা, মা, ভাবী, ভাতিজা, ফুফু, চাকর-বাকর, বাড়ি-ঘর, পুকুর, বাগান, গাছপালা, গরু-ঘোড়া একে একে সকলের ছবি বায়স্কোপের মত তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সকলেই যেন করুণ নয়নে তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে যেন নিষ্ঠুরের মত তাদের সকলের কাছে বিদায় লইতেছে।

কে যেন তার কানের কাছে আসিয়া বলিল : ওয়াজেদ ! এখনো ফিরো। এদের সকলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে চাও ? এদের ছাড়িয়া তুমি থাকিবে কাকে লইয়া ? মনে রাখিও, দীর্ঘ জীবন তোমার সামনে পড়িয়া আছে। বাপ মা, আত্মীয়স্বজন সকলকে ছাড়িয়া তুমি একাই নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবন ঐ একটি মাত্র সত্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে ? হয় তোমাকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে, নয় ত আত্মহত্যা করিতে হইবে।

হাতের কাপড়টা সে দূরে ছুঁড়িয়া মারিল। ধাক্কা মারিয়া সুটকেসটা

উল্টাইয়া দিয়া সে বলিল : না, না, আমি তা পারিব না। এ কঠোর জীবন আমি সইতে পারিব না।

পরক্ষণেই সে আবার বলিল : কি, পারিব না? সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য নিজেকে কোরবানী করিতে—না, না, আর যে ভাবিতে পারি না। খোদা! আমাকে পথ দেখাও।

—বলিয়া সে বিছানায় পড়িয়া গেল।

ষোল

ওসমান সরকারের বাড়ির অদূরে কিসমতপুরের বাজার। বাজারের একপাশ দিয়া জামালপুরের রেললাইন এবং অপর পাশ দিয়া টাঙ্গাইলের রাস্তা।

বাজারের উত্তর দিকে মাদ্রাসা, পশ্চিম দিকে স্কুল এবং দক্ষিণ দিকে টাঙ্গাইল রোডের অপর পাশে খেলার মাঠ। খেলার মাঠের অদূরে শিব-মারির বিল। বারমাস পানি থাকে। এই বিলের চারদিকে বড় বড় ইটখোলা গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্বশেষ দক্ষিণের ইটখোলাটাই আমির আলির। আমির আলির বাড়িও ঐ ইটখোলারই একটু পশ্চিমে।

বাজারের মাদ্রাসাটি পুরাতন নিসাবের, যাকে বলে ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাটিকে নূতন নিসাবের মাদ্রাসা করিবার জন্য গ্রামের অনেক উৎসাহী লোক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরকার সাহেবের বিরুদ্ধতায় তা হইতে পারে নাই। সরকার সাহেবের আশঙ্কা ছিল ওল্ড স্কিম মাদ্রাসাটি নিউ-স্কিমে পরিণত হইলে হাইস্কুলটির ক্ষতি হইবে। এই লইয়া এ অঞ্চলে দস্তর মত দুইটি দল হইয়া গিয়াছে। অবশ্য সে দলাদলি মাদ্রাসা ভাল, কি স্কুল ভাল—সে বিষয় লইয়া হয় নাই। সরকার সাহেব যখন স্কুলের সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাঁর প্রতিপক্ষেরা চক্ষু বুজিয়া স্কুলের অনাবশ্যকতা প্রচার করিয়াছে। তদনুসারে সরকার সাহেব যখন বলিয়াছেন : ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা ওল্ড স্কিমই থাকুক, তখন তাঁর প্রতিপক্ষেরা বলিয়াছে : না, নিউ স্কিমই করিতে হইবে। এই দলের নেতা শরাফত মণ্ডল। কিছুদিন হইতে আমির

আলি ও ইয়াকুব মৌলবি এই দলে যোগ দিয়াছেন। এই দলাদলিকে ভর করিয়াই এবারের ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে ইয়াকুব মৌলবি সরকার সাহেবকে হারাইয়া দিয়াছেন।

এই দলাদলিতে গ্রাম্য রাজনীতির অবস্থা যাই হোক, মাদ্রাসাটি অন্য দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠে। পুরাতন নিসাবের মাদ্রাসা এ অঞ্চলে বেশী নাই। কাজেই হাদিস কোরআন পড়ার জন্য চারিদিক হইতে তালেবুল্‌ইল্‌ম এই মাদ্রাসায় আসিয়া থাকে। বাজারের আশেপাশে গৃহস্থ বাড়িতে তারা জায়গির থাকে। সরকার বাড়িতেও দুই জনের জায়গির আছে। এই সব তালেবুল্‌ইল্‌ম ও মাদ্রাসার মুদার্‌রেসরা সর্বদা ধর্ম-চর্চা ও হাদিস-কোনআনের আলোচনা করিয়া এই বাজারটাকে এ অঞ্চলে একটা কাল্‌চারেল সেণ্টার দারুল উলুমে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।

মাদ্রাসাটির এই উন্নতির মূলে আছেন মাদ্রাসার মুদার্‌রেসে আউয়াল বা হেড মৌলবি মওলানা মুসা সাহেব। মওলানা সাহেরের বাড়ি নোয়াখালি হইলেও এ অঞ্চলের ছোট-বড় জওয়ান-বুড়া মরদ-আওরৎ সকলের তিনি আপন জন হইয়া গিয়াছেন। বহুদিন হইতে তিনি এই মাদ্রাসার প্রধান মৌলবি। মাদ্রাসার লাগাও বাসাবাড়িতে তিনি থাকেন। একটি চাকর তাঁর রান্নাবাড়া করিয়া দেয়। দুইজন তাল্‌বিলিম বিনা খরচে তাঁর বাসায় থাকে এবং মওলানা সাহেবের খিদমত করে। মওলানা সাহেব রমযানের ছুটিতে বছরে একবার বাড়ি যান। তাও আবার কয়েক বছর ধরিয়া ঈদের দুইদিন আগে ফিরিয়া আসেন। কারণ এই কয়েক বছর হইল তিনি ঈদের জমাতের ইমাম নিযুক্ত হইয়াছেন।

মওলানা মুসা শুধু নামেই মওলানা নন, কাজেও তিনি একজন সত্যিকারের আলিম। হাদিস কোরআনে কাবিলিয়তের জন্য তিনি মশহুর, দিনদারি পরহেযগারিতে তিনি সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র। লোকেরা তাঁকে কামিল লোক বলিয়াও বিশ্বাস করে এবং আপদে-বিপদে অসুখে-বিসুখে তাঁর কাছ থেকে দোওয়া-তাবিয নিয়া থাকে। গ্রাম্য দলাদলিতে তিনি যান না। বরঞ্চ এ অঞ্চলের অতি পুরাতন হানিফী-মোহাম্মদী ঝগড়া

মিটাইয়া তিনি উভয় দলের সমান শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। এজন্য সকল দলের লোকই তাঁকে সমান মান্য করে। ওসমান সরকার ও শরাফত মণ্ডল সমান উৎসাহে মওলানা সাহেবের তারিফ করিয়া থাকেন। আমির আলি খাঁ মোল্লা-মৌলবিদের দুচক্ষে দেখিতে পারে না; তাদেরে সে সমাজের দুশ্‌মন বলিয়া গাল দেয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেও মওলানা মুসার একজন অনুরক্ত ভক্ত। মওলানা সাহেবও আমির আলি খাঁকে পর্যন্তও পিয়ার করিয়া থাকেন। অনেক মৌলবি সাহেব আমির আলিকে নাস্তিক অভিহিত করিয়া অনেকবার মওলানা সাহেবের কাছে নালিশ করিয়াছেন। মওলানা সাহেব সেসব কথা কানে তুলেন নাই। বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে হাসিয়া বলিয়াছেন: বয়স হইলেই ও সব দোষ সারিয়া যাইবে। আসলে আমির আলি মিঞা লোক ভাল।

ওসমান সরকার ও আমির আলি খাঁর মামলার কথা যথাসময়ে মওলানা সাহেবের কানে গিয়াছিল। উভয়েই প্রিয় লোক। কাজেই উহাদের মধ্যেকার বিবাদে তিনি ব্যথা পাইয়াছেন খুবই। কিন্তু নিজের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আছেন। দুনিয়াবি মামলায় হস্তক্ষেপ করার বিপদ অনেক, তা তিনি জানেন। কাজেই অনেক সাগরিদের অনুরোধ সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তিনি কোনো পক্ষে কোনো কথা বলেন নাই।

কিন্তু মোকদ্দমার তারিখ যতই ঘনাইয়া আসিল, দুই পক্ষের ক্যান্‌ভাসের চোটে এ অঞ্চল ততই গরম হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত সারা গ্রাম দুইটি যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, মাদ্রাসার ছাত্র ও মৌলবিরা পর্যন্ত দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। দিনরাত তাঁরা এই ব্যাপারে বাহাস-মুবাহেসায় কাটাইতে লাগিলেন।

এতদিনের নির্লিপ্ত মওলানা সাহেবও শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। মোকদ্দমার আগের দিন তিনি নিজেই স্থির করিলেন, এই মামলা আপস করাইয়া দিতেই হইবে।

সেদিন বাসায় আছরের নামায পড়িয়া তিনি লাঠি হাতে বাহির হইলেন। কার বাড়ি আগে যাইবেন, কিছুই ঠিক নাই। বড় রাস্তায়

উঠিয়া তিনি ডাইনে আমির আলির বাড়ি ও বাঁয়ে ওসমান সরকারের বাড়ির দিকে একবার তাকাইলেন। আমির আলির বাড়ি বিলের দক্ষিণ ধারে ধুধু করিয়া দেখা যাইতেছে। আর ওসমান সরকারের বাড়ি? ঐ ত রেল লাইনের অপর পারে পাঁচ সাত খানা বাড়ির পরেই সে বাড়ি দেখা যাইতেছে। দূরের কাজটাই আগে সারা উচিত।

অতএব মওলানা সাহেব বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া আমির আলির বাড়ির দিকে রওয়ানা হইলেন। খানিকদূর গিয়া তাঁকে বড় রাস্তা ছাড়িতে হইল। ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া তিনি আমির আলির ইটখোলার কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন।

আর সব ইটখোলার চিমনীতে ধোঁয়া উঠিতেছিল; লোকজনও কাজ করিতেছিল। কিন্তু আমির আলির ইটখোলার চিমনীও বন্ধ, লোকজনও নাই।

—দেখিয়া মওলানা সাহেবের মনে কষ্ট হইল। আহা! বেচারা আমির আলি! কত ধূমধামের সাথে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতেছিল। ইটখোলাও বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ কারবারটা ফেল পড়ায় আজ বেচারার কি দুর্গতি হইয়াছে! তার উপর এই মোকদ্দমা! মওলানা সাহেবের মতে ইটখোলাটা বন্ধ হওয়া কিছুতেই ঠিক হয় নাই। তিনি মনে মনে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিলেন: যদি আমির মিঞা সত্য-সত্যই দোষীও হন, তবু এতবড় শাস্তি তাঁর হওয়া উচিত নয়। আর যদি তিনি নির্দোষ হন, তবে ত ইটখোলা বন্ধ হওয়া কিছুতেই উচিত ছিল না। এতে বরঞ্চ লোকের মনে এই ভুল ধারণা হইতেছে যে, আমির আলি সত্যই দোষী, তা না হইলে ইটখোলা বন্ধ হইবে কেন? লোকটার মনে উৎসাহ দেওয়া খুবই দরকার। লা তাক্‌নাতু মির্‌রহমতিল্লাহ্।

মওলানা সাহেবের কোমল অন্তর আমির আলির জন্য অকৃত্রিম দরদে ভরিয়া উঠিল। তিনি আমির আলির বাড়ির দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি আমির আলির বাহির বাড়িতে কোন লোক দেখিলেন না। বাড়ির মধ্যে কান্নাকাটি শুনিতে পাইলেন। বাহির বাড়িতে ছেলেরা খেলা করিতেছিল।

মওলানা সাহেবকে তারা চিনিত। তাঁকে দেখিয়া নাচিতে নাচিতে তারা "বড় মওলানা সাবের" কাছে আসিল। তাদের মধ্যে একজনকে তিনি আদর করিয়া বলিলেনঃ আমির আলি মিঞাকে খবর দাও ত। একজনকে বলিলেও সকলে মিলিয়া ছুটিয়া গেল আমির আলির বাড়ির মধ্যে।

আমির আলি বাহির হইয়া আসিল। মওলানা সাহেবকে সালাম আলায়কুম দিয়া বৈঠকখানায় নিয়া বসাইল। আমির আলির বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া মওলানা সাহেব প্রথমেই পুছ করিলেনঃ বাড়ির খবর সব ভাল ত?

আমির আলি শোক গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলঃ দিন কয়েক হয় আমার একটি ছেলে হইছিল; আজ সকালে সে মারা গেছে।

মওলানা সাহেব 'ইন্নালিল্লাহ্' পড়িলেন এবং আমির মিঞাকে সবর করিতে উপদেশ দিলেন। অবশেষে বলিলেনঃ কি অসুখ হইছিল?

আমির আলিঃ অসুখ কিছু ধরা গেল না। তবে মায়ের দুধের দোষেই ইটা হইছে বৈলা সকলের মত।

একটু থামিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিলঃ সে বেচারীরই বা দোষ কি? দুশ্‌মনদের চেষ্টায় কিছুদিন ধইরা সংসারের উপর দিয়া যে তুফান যাইতাছে, সব ত পড়ছে গিয়া তারই ঘাড়ে।

মওলানা সাহেব বুঝিলেন, আমির আলি ওসমান সরকারের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে এবং এই ছেলে মরার জন্যও সরকার সাহেবকেই সে দায়ী করিতেছে। আহা! বেচারা দুশ্চিন্তায় একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। আপস করিয়া দিয়া এর উপকার করিতেই হইবে।

তাঁর উদার সরল মনে চটপট একটা সরল বুদ্ধি যোগাইল। তিনি আমির আলিকে বলিলেনঃ আমির মিঞা, মেহেরবানি কইরা আপনে আমার সাথে একটু যাবেন?

আমির আলিঃ কই?

মওলানাঃ যেখানে আমি লৈয়া যাই।

আমির আলিঃ শুন্‌তে দোষ আছে?

মওলানাঃ ওসমান সরকারের বাড়ি।

আমির আলি চমকিয়া উঠিল। চোখ বড় করিয়া সে বলিল: ওসমান সরকারের বাড়ী!

মওলানা: জি, হাঁ।

আমির আলি: কেন?

মওলানা: আপনাদের মামলাটা আপস কইরা দিতে চাই।

আমির আলি মুচকি হাসিল। সে মনে মনে বলিল: ওসমান সরকার তবে ঘাবরাইছে। মামলায় সে হারবেই ইটা সে বুঝতে পারছে বুঝি। প্রকাশ্যে বলিল: ওসমান সরকার আপনার গিয়া ধরছে বুঝি?

মওলানা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন: না, না, ওসমান সরকার আমারে কিছু কইছে না। আমি নিজে থাইকাই আসছি।

আমির আলি বিশ্বাস করিল না। তবু বলিল: আমি কেমনে আপস করব? ফৌজদারীটা লাগাইছে ত ওসমান সরকারই। সে যদি আপস করতে চায়, তবে মামলাটা তুইলা আনুক। আপসের কথা এখানে আসে কই থাইকা?

মওলানা হাসিয়া বলিলেন: ওটা ত বাবা আইনের কথা। আমি অতশত আইন জানি না। আপস হৈলে ফৌজদারী-দেওয়ানী সব এক সাথেই হৈব। তার লাগি আট্‌কাবে না। আগে আপসের কথাটা ত হৈয়া যাক।

আমির আলি: এর মধ্যে আপসটা কি? আমি ত কোনো দোষ করছি না।

মওলানা: বাবাজী, নির্দোষের পক্ষে উদার হওয়া বেশী সম্ভব। যে অন্যায় করে না, সেই আগে কইতে পারে, আমার কসুর হৈছে, আমারে মাফ করেন।

আমির আলি: বুঝলাম, অখন আমারে কি করতে বলেন?

মওলানা: আমার সাথে আপনে ওসমান সরকারের বাড়ি যাবেন। আপনার কিছু কইতে হৈব না। যা কইবার আমিই কইমু।

আমির: আপনে সরকারের কাছে কি কইবেন, সেটা না জানলে আমি আপনের সাথে যাবার পারি না।

মওলানা : আপনের ইয্‌যৎ বাঁচাইয়াই আমি কথা কইমু। আমি কইমু : আমি আমির মিয়াকে ধইরা আন্‌ছি। আপনেরা হাত মিলান। দুজনে দুজনরে মাফ কইরা দেন।

আমির আলি : সরকার যদি আপনের কথা না রাখে ?

মওলানা : সেটা আমার উপরে ছাইড়া দেন। সেটা পরে দেখা যাব। ওসমান সরকার আমার কথা ফেইলা দিব না বইলাই ত আমি আশা করি।

আমির আলির এবার দৃঢ় বিশ্বাস হইল মওলানা সাহেব ওসমান সরকারের সাথে কথাবার্তা ঠিক করিয়াই আসিয়াছেন।

সে বলিল : বেশ, তারপর কি করা লাগব ?

মওলানা : ফৌজদারী দেওয়ানী দুই আদালতেই আপস-নামা দাখিল হৈব।

আমির আলি : যামিনের টাকা ওসমান সরকার দিয়া দিব ত ?

মওলানা সাহেব অত ভাবিয়া আসেন নাই। তিনি চট করিয়া এ কথার জবাব দিতে পারিলেন না। তিনি জালিয়াতির কথাই ভাবিয়াছেন। এর মধ্যে আবার তিন হাজার টাকার দেনা-পাওনার প্রশ্ন আছে, সে কথা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তিন হাজার টাকা অনেক টাকা। মওলানা সাহেব জীবনে অতটাকা চোখে দেখেন নাই। কাজেই ও সম্বন্ধে নিজে ঝুঁকি লইয়া কোনো কথা বলিতে তাঁর ইচ্ছা বা সাহস হইল না। অথচ এই কথার উপর আপসের চেষ্টা ভাঙিয়া যাইবে এ সম্ভাবনা তাঁর মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

তাই তিনি একটু উঁচুস্তরে উঠিয়া গেলেন। বলিলেন : বাবা আমির আলি, দুনিয়াতে টাকাটাই সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। আপনার ও ওসমান সরকারের মত দুইজন মাতব্বরের মধ্যে আপসটাই বড় কথা ; তার দাম তিন হাজারের চেয়ে অনেক বেশী।

আমির আলি এই নীতিকথায় ভুলিল না। তার মন এ ব্যাপারে উত্যক্ত ও খুবই চিন্তাগ্রস্ত ছিল। সে গম্ভীরভাবে বলিল : ব্যাংক ত টাকা ছাড়া আপস-নামায় দস্তখত দিব না।

মওলানা ভাবনায় পড়িলেন। আপস-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায় বুঝি। যদি হয়, তবে এটা হইবে তাঁরই পরাজয়। পরের ব্যাপারে তিনি মাথা

দেন খুব কম। কিন্তু যেখানেই মাথা দিয়াছেন, সফল হইয়াছেন। তাঁর কোনো আপস-চেষ্টাই এ পর্যন্ত নিষ্ফল হয় নাই। বুড়া বয়সে এইবার বুঝি প্রথম তাঁর মুখে কালি পড়িল! তাঁর মনে একটু খিদের ভাব দেখা দিল। তিনি মস্তবড় ঝুঁকি লইয়া বলিয়া বসিলেনঃ সে বন্দোবস্ত আমি করমু। আমি ওসমান সরকারকে হাতে ধইরা কইমুঃ 'সরকার সায়েব, আপনে যদি আমির মিঞার যামিন আগে না হৈয়া থাকেন, তবে অখন হন; আমির মিঞার তরফে ব্যাংকের পাওনাটা আপনে দিয়া দেন।' আমি আজতক নিজের লাগি সরকার সায়েবের কাছে কিছু চাইছি না। আমার জোর বিশ্বাস, ওসমান সরকার আমার এই অনুরোধ ঠেল্‌তে পারব না।

আমির আলি হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিলঃ আপনের বিশ্বাস লৈয়া আপনে থাকেন। কিন্তু আপনে কি মনে করছেন আমি যামু তার কাছে টাকা ভিক্ষা চাইবার? যে ব্যক্তি নিজের দস্তখত অস্বীকার করবার পারে, যে নিজের ওয়াদা খেলাফ করবার পারে, যে আমারে শুধু ঠকাইছে না, আমারে জেলে পাঠাবারও তদবির করতাছে, তারই কাছে যামু আমি ভিক্ষার লাগি হাত পাতবার? না মওলানা সায়েব, আমি গরিব হৈবার পারি, কিন্তু অত ছোট লোক না।

মওলানা সাহেব আমির আলির রাগ দেখিয়া অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তার অত রাগের কারণ বুঝিতে পারিলেন না। যামিনদার যদি যামিন ইন্‌কার করে, তবে তাতে মহাজনকে ঠকান হয় সত্য, কিন্তু খাতককে ঠকান হয় কেমনে, এটা মওলানা সাহেব বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু আপসের চেষ্টা ব্যর্থ না হয় সেদিকে নযর রাখিয়া নরম যবানে তিনি বলিলেনঃ কে দোষী, সে বিচার করবার আমি আসছি না। দোষীর বিচার করব বিচারের মালিক আল্লাহ্‌।

আমির আলির মনে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। ব্যঙ্গ করিয়া সে বলিলঃ ওটা বল্‌তেই শোনা যায় মওলানা সায়েব! আল্লা হক বিচার করছে কোনোদিন? তা যদি করত, তবে ওসমান সরকারের মত ধাপ্পা-বাজেরা আজো দুনিয়ায় রাজত্ব কইরা বেড়াইতে পারত না। আল্লার বিচার

বহুৎ দেখছি। যত সব চোর-চোট্টা যালিম ধাপ্পাবাজরারেই সে মালদার বানায়, ক্ষমতা দেয়। যে হক পথে থাকবার চায়, যে গরিবের পক্ষ হৈয়া দুটা কথা বলবার চায়, তার বিপদের সীমা নাই। খোদা বড়লোকদেরই তাবেদার।

'আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ্‌', 'নাউযবিল্লাহ্‌' বলিয়া মওলানা সাহেব কানে আঙুল দিলেন। ব্যথিতস্বরে বলিলেন ঃ ওটা ঈমানের কথা আমির মিঞা। যারার ঈমানে জোর নাই, দুঃখ তারারই ভোগা লাগে।

আমির আলি আরো চটিয়া গেল। বলিল ঃ ঈমানের জোর আমারও আছিল একদিন মওলানা সায়েব। আমার সে ঈমানে কমজোরি আন্‌ছে এই ওসমান সরকারই। সে আমার কত রকম দুশ্‌মনি করছে জানেন? মেয়ে বিয়া দিবার লাগি ফুসলাইয়া আমারে নামাইছে ইটের কারবারে। না হৈলে আমি নিজের কারবার ফেইলা আস্‌তাম এই কারবারে? তার পর তার মেয়ে মারা গেল, সেটা কি আমার দোষ? আমি অন্যখানে বিয়া করছি, সেটাও কি আমার অপরাধ? কি দুশ্‌মনি আমি করছিলাম তার? সে শুধুশুধি আমার অনিষ্ট করবার মতলব আঁটতে লাগলো কেন? সে আমার ইটখোলার পাশে ইটখোলা খুললো। আমার রাজদেরে বেশী মাইনা দিয়া ভাঙাইয়া নিল। কাঠ-কয়লাওয়ালাদেরে ক্যানভাস কৈরা ধারে সাপ্লাই বন্ধ করাইল। মহাজনকে ফুসলাইয়া নালিশ করাইল। তদবির কইরা আমার সমস্ত সম্পত্তি অগ্রিম ক্রোক করাইয়া আমারে বেইয্‌যত করল। আমি অন্যত্র টাকা ধার কইরা ব্যাংকের দেনা শোধ দিবার বন্দোবস্ত করলাম, ওসমান সরকার কুটনামি কৈরা সেটাও ভাঙানি দিল। আমার শ্বশুরের ওয়ারিশদেরে আসাম থাইকা টুকাইয়া আইনা আমার স্ত্রীর দুশ্‌মনি করল। কি সে না করছে মওলানা সায়েব? এসব খবর আপনে হয়ত রাখেন না। কিন্তু আল্লাও কি রাখে না? সে কি এসব যুলুম দেখে না? এ সবের কি বিচারটা আল্লাহ্‌ করছে, আপনেই কন ত? আপনারা আলেম, ধর্ম লৈয়া আপনেরা কারবার করেন, ইন্‌সাফের কথা খুব জোর গলায় পরচার করেন। আপনেরাই বা এর কি ইন্‌সাফটা করছেন? জেল-জরিমানা

আপনেরা করবার পারেন না জানি। কিন্তু সমাজে তারে এক ঘইরা করবার পারতেন ত? করছেন সেটা? একটা ফতোয়া তার খেলাফে বাইর করছেন? কিচ্ছু করছেন না। আজো আপনের মৌলবিরা তার বাড়িতে গিয়া তার হারাম টাকার পোলাও-কোর্মা খাইয়া আসেন, তার সুদের টাকার যাকাৎ-ফেৎরা-খয়রাতে পকেট বোঝাই কইরা আসেন। এইত আপনারার ধর্ম। ও-সব কথা আর আমার কাছে কইবেন না মওলানা সায়েব। অন্য জায়গায় গিয়া এসব সরফরাযি মারান। আলেমরার মুরাদ আমি জানি। আপনেরা সব বড় লোকরার কেনা গোলাম।

অন্য কোনো লোক হইলে গোস্বায় চটিয়া উঠিয়া যাইতেন। গোস্বায় না হউক, অন্ততঃ নিরাশ হইয়া উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা একবার মওলানা সাহেবেরও হইল। কিন্তু তিনি একজন সত্যিকারের আক্কেল-মন্দ বুযর্গ আলেম। রাগ সামলাইবার শিক্ষা তাঁর অনেক হইয়াছে। গোমরাহ্ লোককেই বেশী হেদায়েত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন। কাজেই তিনি আমির আলিকে পথে আনিবার চেষ্টায় বলিলেন: আপনের সব কথাই আমি মানলাম আমির মিঞা। কিন্তু আপনেরে আমি একটা কথা পুছ করি। আপনে নিজেও কি কোনো দিন কারো অন্যায় করছেন না? আপনে এক্কেবারে বেগোনা, একথা কি আপনে বুকে হাত দিয়া কইতে পারেন?

সাপের মাথায় দাওয়াই পড়ার মত আমির আলি একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। সুর নরম করিয়া বলিল: আপনের ঐ সওয়ালের জবাব আমি এখন দিবার চাই না। আমি শুধু এই কথা কইবার চাই যে, এই মামলার ব্যাপারে আমি নির্দোষ, ওসমান সরকারই অপরাধী। আর আপনে জাইনা রাখেন মওলানা সায়েব, আপনেরার মত সমস্ত মোল্লা-মৌলবিরা ওসমান সরকারের পক্ষে গেলেও এবার সে জেল ছাড়াইতে পারব না। কারণ এ বিচারের ভার আলেমরার বা আল্লার উপরে নাই, এর বিচার হৈব আদালতে। আর যাই হোক, আইন-আদালতে আজো

বিচার আছে। ওসমান সরকার শুধু জেলে গিয়াই রেহাই পাব না। আমারে যে সে এমন কইরা সাতাইতেছে, তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় কইরা তবে আমি ছাড়মু।

মওলানা সাহেব ভাবিলেন, দেখা যাইতেছে টাকা পাইলেই লোকটা সব সাতানি ভুলিতে রাযী আছে। সব শেকায়েৎ তা হইলে টাকার লাগি। বুঝিলাম এই লোকটাই দোষী। ওসমান সরকার যে নির্দোষ, এতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

তিনি বলিলেন: আমি তা হৈলে উঠি আমির মিয়া। খোদা আমরার গুনাহ্ মাফ করেন না বইলা আমরা তাঁর দোষ দেই। কিন্তু মাফ করাটা যে কত কঠিন কাজ, এতদিনে সেটা বুঝলেন ত?

মওলানা সাহেবকে ওসমান সরকারই ঘট্‌কালি করিতে পাঠাইয়াছেন, এ বিশ্বাস আমির আলির তখনও দূর হয় নাই। তাই ওসমান সরকারের কানে দিবার মতলবে সে বলিল: কঠিন গুনাহ্ কইরা মানুষ সহজে রেহাই পাউক, এটা আমি চাই না। আমি ব্যাপারটা যতই ভাবতাছি, ততই বুঝতাছি যে, ওসমান সরকারের জেল থাইকা রেহাই পাওয়া উচিত না।

মওলানা সাহেব লোকটার নীচতায় ঘোরতর অসন্তুষ্ট লইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন: একটা ভদ্রলোককে জেলে পাঠাইবার জন্য লোকটার যিদ কত! ওসমান সরকার যদি সত্যই নির্দোষ হন, তবে তিনি খারাপ লোকের পাল্লায়ই পড়িয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁকে এই লোকটার হাত হইতে হেফাযত করুন। যে লোক নির্দোষ সে কিছুতেই এত মগরুর, এত বেতমিয, এত নীচ হইতে পারে না। অতএব এই লোকটাই দোষী।

মওলানা সাহেব এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হইলেন।

তিনি উঠিয়া আস্‌সালামু আলাইকুম বলিলেন এবং আমির আলি মিঞার সহিত মুসাফেহা করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। আমির আলিও মওলানা সাহেবের পিছে পিছে ঘরের বাহির হইতে হইতে বলিল: ব্যাপারটা আর শুধু আমার ও ওসমান সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই মওলানা সাব। এটা

অথন পাবলিকের স্বার্থের প্রশ্নে দাঁড়াইয়া গেছে। পাবলিকর ভালর লাগি ওসমান সরকারের জেল হওয়া দরকার।

মওলানা সাহেবেরও ধৈর্যের সীমা ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি ব্যঙ্গ করিবার ইচ্ছা দমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিলেন: জি হাঁ, আজকাল সকলেই ঐ কথাটা বল্‌তে শিখ্‌ছে। কারো দাঁতের বেদনা হৈলেও বলে, পাবলিকের স্বার্থ বিপন্ন হৈছে। তাঁর দাঁতটা পইড়া গেলে পাবলিকের পক্ষে কথা কৈব কেটা? আজকালকার মানুষের ঈমান এত কমজোর হৈয়া গেছে যে, নিজের দুঃখও তারা আর একা বরদাশ্‌ত করতে সাহস পায় না, তাতেও সঙ্গী চায়।

মওলানা সাহেব ততক্ষণে বেশ দূরে চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই আমির আলি গলা উঁচা করিয়া একথার জবাব দিল: জি হাঁ, ওসমান সরকারকে জানাইয়া দিবেন যে, আমির আলি আজ আর এক্‌লা না; তার পক্ষেও অনেক লোক আছে।

মওলানা সাহেব তখন আমির আলির আংগিনা ছাড়াইয়া মাঠে নামিয়া পড়িয়াছেন। সুরুজ তখন লাল হইয়া গিয়াছে। মগরেবের ওয়াক্ত হইতে আর বেশী দেরি নাই। মওলানা সাহেব জোরে হাঁটিতে লাগিলেন। মাঠের খোলা হাওয়ায় একটু শীত শীত লাগিল বটে, কিন্তু মাথাটায় বেশ আরাম লাগিল। লোকটার সাথে আলাপ করিয়া তাঁর পাতলা আদ্দির টুপিটার নীচেও যেন মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল।

মাথা ও নাকে-মুখে আরাম লাগাতে মওলানা সাহেবের মনটাও তার সাবেক স্থৈর্যে ফিরিয়া আসিল। তাঁর মনে পড়িল, আমির আলির দুর্দশায় মনে ব্যথা পাইয়াই তিনি লোকটার উপকার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ওসমান সরকার প্রভাবশালী ধনী লোক বলিয়া লোকজনেরা সবাই বোধ হয় তাঁর পক্ষে। আমির আলির পক্ষে বোধ হয় তেমন লোকজন নাই। ঘরে বসিয়া যতটা খবর তিনি পাইয়াছিলেন, তাতেই তাঁর এই বিশ্বাস হইয়াছিল। তাই সহায়হীন আমির আলির প্রতি তাঁর মনে আপনা হইতেই একটা দরদ পয়দা হইয়াছিল। এখন তিনি জানিলেন, আমির মিঞা অসহায় একলা

লোক নয়। তার পক্ষেও অনেক লোক আছে। মামলায় জিতিবার আশাও সে করিতেছে।

যাক, তা হইলে আমির আলি মিঞার জন্য ভাবিবার কোনো দরকার নাই। সমানে সমানে লড়াই হইবে। যে হারে যে জিতে, তাতে মওলানা সাহেবের ভাবিবার বা করিবার কিই বা আছে? তিনি একটু সোয়াস্তি পাইলেন।

আপসের চেষ্টা বার্থ হইলে মওলানা সাহেব যতটা নিরাশ হইবেন বলিয়া গোড়ায় মনে করিয়াছিলেন, সত্যসত্যই সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর সে নৈরাশ্যের কণামাত্রও তাঁর মনে থাকিল না। এই চেষ্টা হইতে তিনি দুইটা নতুন জ্ঞান লাভ করিলেন; প্রথমতঃ, এ মোকদ্দমায় ওসমান সরকারই নির্দোষ; দ্বিতীয়তঃ, আমির আলি অসহায় লোক নয়।

মওলানা সাহেবের মন শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ শান্ত হইল। তিনি হাতের লাঠিটা ঘুরাইয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন। বাসায় ফিরিয়া আউয়াল ওয়াক্তে তাঁর নামাজ পড়া চাই।

মওলানা সাহেবকে যতক্ষণ দেখা গেল, বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমির আলি ততক্ষণ তাঁর দিকে চাহিয়া রহিল। এতক্ষণে তার মনে হইল লোকটার মতলব হয়ত নিতান্ত খারাপ ছিল না। কিন্তু এই ভাবটা মনে আসা মাত্র আমির আলি তাকে দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কারণ মওলানা সাহেবের মতলব ভাল ছিল স্বীকার করিলে ওসমান সরকারকেও কিছুটা ভাল মনে করিতে হয়। ওসমান সরকারকে কিছুটা ভাল মনে করিলে তাঁর বিরুদ্ধে আমির আলির কেস দুর্বল লইয়া যায়। না, ওসমান সরকারের মধ্যে ভালর লেশ আছে, এটা আমির আলি মানিতে পারে না। সুতরাং মওলানা সাহেব নিজে যত ভাল মানুষই হোন না কেন, তিনি ঐ বদমায়েশ ওসমান সরকারের চর-রূপেই আমির আলির কাছে আসিয়াছিলেন।

কি আশ্চর্য! আমির আলির এতদিনের দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ আজ সে হাতে-কলমে পাইল। আমির আলির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দুনিয়ার

সব মোল্লা-মৌলবিই ধনীদের তাঁবেদার। একমাত্র মওলানা মুসাই তার এই বিশ্বাসের মধ্যে মাঝে মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করিতেন। আজ আমির আলির সন্দেহ দূর হইল। বুঝিল মওলানা মুসাও তাই। মওলানা মুসা সহ দুনিয়ার সব মোল্লা-মৌলবিই ধনীদের দালাল। এদের কাজই হইল গরিবদের আরো গরিব ও ধনীদের আরো ধনী করা, বড় লোকদের কাছে কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করা।

চলমান মওলানা সাহেবের দিকে সে যতই তাকাইয়া থাকিল, তাঁর পরনের তহবন্দ, হাঁটুর নীচে তক ঝুলিয়া-পড়া কোর্তার উপরে মখমলের সদরিয়া এবং মাথার উপরের গুম্বযী টুপির প্রত্যেকটি সে যতই তন্ন তন্ন করিয়া চিন্তা করিল, ততই তার মনে হইতে লাগিল, ধনীদের একটি ধূর্ত দালাল ধর্মের ছদ্মবেশে তাকে ঠকাইতে আসিয়াছিল, পরাজিত হইয়া লেজ গুটাইয়া ঐ ফিরিয়া যাইতেছে। নিশ্চয় নূতন ফন্দি করিয়া আরেক বেশে তাকে আবার আক্রমণ করিতে আসিবে। হুঁশিয়ার, আমির আলি হুঁশিয়ার!

আলেমদের প্রতি আমির আলির নূতন করিয়া ঘৃণার উদ্রেক হইল। দুনিয়াতে কি এমন কোনো কুকর্ম নাই, যার সমর্থনে মোল্লা-মৌলবিরা তাদের ধর্ম, খোদা ও কোরআন-হাদিস বিক্রয় করে না?

আমির আলি আজ নিঃসন্দেহ হইল, না, নাই।

ধনী হইবার সকল চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া যারা সাম্যবাদী হইয়া উঠে, আমির আলি সেই শ্রেণীর লোক। নিজেদের অযোগ্যতা ও পরিচালনে অব্যবস্থার জন্যই যে তাদের কারবার ফেল হইয়াছে, সেটা গোপন করিবার জন্য এই শ্রেণীর লোকেরা বলিয়া বেড়ায়, শ্রমিকদের ভাল করিতে গিয়াই তাদের কারবারে লোকসান হইয়াছে। আমির আলিও ঠিক এই বিশ্বাসই করিত। এটা ঠিক যে, তার ইটখোলার রাজ-যোগানিয়ার মজুরি সে কিছুটা বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং প্রচলিত আট ঘণ্টার জায়গায় সাত ঘণ্টার দিন করিয়াছিল। কিন্তু সেটা শ্রমিক-কল্যাণের উদ্দেশ্যে ততটা ছিল না, যতটা ছিল লোক জোগাড়ের উদ্দেশ্যে। তবু যখন তার কারবারে লোকসান যাইতে শুরু করিল, তখন এটাকে সে প্রতিদ্বন্দী ইটখোলার মালিকদেরই

ষড়যন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইল। ওসমান সরকারের নিজের জলজ্যান্ত দস্তখতটা অস্বীকার করা এবং পাল্টা তার নামে ফৌজদারী দায়ের করাকেও সে এ অঞ্চলের ধনীদের ষড়যন্ত্র বলিয়াই ধরিয়া লইল।

কাজেই সে এখন নিজেকে ধনীদের শত্রু ও গরিবদের একমাত্র বন্ধু মনে করিয়া থাকে। মনে করিতে করিতে কালে সে হইয়াও গিয়াছে তাই। সত্যসত্যই এ অঞ্চলের জমিদার ও জোতদারদের প্রজা ও বর্গাদার-পীড়নের বিরুদ্ধে, মহাজনদের খাতক-পীড়নের বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়া কথা বলিবার লোক এখন একমাত্র আমির আলি খাঁই।

আসলে এ অঞ্চলের গরিবদের সব চেয়ে বেশী ঠকাইয়াছে আমির আলি খাঁ নিজে। সে সমবায় ভিত্তিতে দশ টাকা শেয়ারের শিল্প-সঙ্ঘ গঠন করিয়া তার শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে গরিব চাষী-মজুরের কাছেই বেশী। তখন সে বক্তৃতা করিয়াছে, বড়লোকদের হাত হইতে শিল্প-বাণিজ্য কাড়িয়া কৃষক-প্রজা-রাজ প্রতিষ্ঠার এইই একমাত্র পথ। এই বক্তৃতায় দেশের গরিব লোকেরা খুব মাতিয়াছিল। অনেক গরিব ছাগল মুর্গী বিক্রয় করিয়া, তামা-কাঁসার বাসন-পত্র, এমন কি স্ত্রীর হাঁসুলি বন্ধক দিয়া শিল্প-সঙ্ঘের শেয়ার কিনিয়াছিল। ঐ সময় ইটখোলার মূলধনে টান পড়ায় ইটখোলাও সমবায় আইনে রেজিষ্টারি করিবে বলিয়া ঐ তহবিলেও সে কিছু টাকা তুলিয়াছিল। শিল্প-সঙ্ঘে তাঁত-চরকা হাপর-হাতুড়ি চলিয়াও ছিল বেশ কিছুদিন। শিল্পসঙ্ঘের লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি, দাও, কাঁচি, কুড়াল কিছুদিন এ অঞ্চলের লোকে ব্যবহারও করিয়াছে। অন্যান্য জিনিসপত্রও মন্দ তৈয়ার হইত না।

তারপর শিল্পসঙ্ঘ ফেল মারে। শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে হা-হুতাশ ও কান্নাকাটি পড়িয়া যায়। তহবিল তসরুফের মামলা দায়েরের চেষ্টা কেউ কেউ করিয়াছে। কিন্তু তেমন প্রমাণ পায় নাই।

ইটের কারবারের অবস্থাও ইদানীং খারাপ হইয়া গিয়াছিল। এখন ব্যাংকের অগ্রিম ক্রোকের ফলে কারখানা তালাবন্ধ। এত গরিব লোকের টাকা নষ্ট করিয়াছে বলিয়া আমির মিঞা আগে এদের ডরাইয়া চলিত। পারত-

পক্ষে এদের সাথে দেখাই করিত না। রাত্রির অন্ধকারে হাটবাজার করিত। ঘণ্টায় দশ মাইল বেগের কম কদাচ সাইকেল চালাইত না। পথে লোকজন দেখিলে সেটা পনর মাইল করিত।

কিন্তু আজ সে ভয় তার কাটিয়া গিয়াছে। সে আজ মনে-প্রাণে গরিব-দুঃখীর বন্ধু। তাদের পক্ষে একমাত্র সেই জমিদার-জোতদার-মহাজনের সাথে লড়াই করিতেছে। এইজন্যই ওসমান সরকার প্রভৃতি জোতদাররা ও জমিদারের দালালরা আমির আলির বিরুদ্ধে জোট পাকাইয়াছে, তাকে নাজেহাল ও নাস্তা-নাবুদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব সে ঐ সব গরিব দুঃখীরই সমদুঃখী। ওসমান সরকারের সঙ্গে তার মামলা একটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত বিবাদ নয়—এটা এ অঞ্চলের, শুধু এ অঞ্চলেরই বা কেন, সারা দেশের, গোটা দুনিয়ার ধনী-দরিদ্রের চিরন্তন শ্রেণী-সংগ্রামের একটা অচ্ছেদ্য অংশমাত্র।

সুতরাং তার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, তার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, তার হার-জিত তার একার নয়। তারই লাভদেশের লাভ, তার ভালই কৃষক-মজুরের ভাল, তার জিতই জনগণের জিত। এর উল্টা হইলে শুধু তার একার ক্ষতি হইবে না, দেশেরই ক্ষতি হইবে।

অতএব ঐ যে মওলানা ধনী ওসমান সরকারের দালালি করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁর মনের কোণে গরিব শোষিত জনসাধারণের জন্য এতটুকুও কি দরদ নাই? কি আফসোসের কথা! অথচ ঐ লোকটাও কি চাষী-মজুরের শ্রমের কামাই খাইয়া জীবনধারণও করিতেছেন না?

মোল্লা-মৌলবির এই নগ্ন স্বরূপ দেশের সাধারণের সামনে খুলিয়া ধরা দরকার। তাদের বুঝাইয়া দেওয়া দরকার তারা কি শ্রেণীর লোকের হাত ধরিয়া বেহেশ্‌তে যাইবার আশা করিতেছে। আমির আলি খবরের কাগযে এ বিষয়ে শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ লিখিবে স্থির করিয়া ফেলিল।

আর ওসমান সরকার? সে যত ভাড়াটিয়া মওলানাই আমির আলির কাছে পাঠাক না কেন, তার কপালে নিশ্চয়ই জেল আছে।

সতর

পরশু মোকদ্দমার দিন। আজ কোর্ট বন্ধ। সারাদিনই মোক্তারের ফুরসৎ। ওসমান সরকার সাক্ষী সাবুদ লইয়া প্রায় সারাদিনই মোক্তারের বাসায় কাটাইলেন; কোন্ সাক্ষীকে দিয়া কি বলাইতে হইবে তা ঠিক করা, যার যার কথা ঠিকমত বলিতে পারিবে কি না তা যাচাই করা, এই ভাবে সাক্ষীদের ঝাড়াই বাছাই করা, সরকার সাহেবের ও তাঁর সাক্ষীদের অপর পক্ষ কি কি জেরা করিতে পারে, করিলে তার কি কি উত্তর দিতে হইবে তার মহড়া দেওয়া—ইত্যাকার কাজে দিন শেষ হইয়া গেল। কাজে কর্মে ছিদ্র না রাখা সরকার সাহেবের বরাবরের অভ্যাস। মোক্তারের পয়েন্টগুলি তিনি টুকিয়া লইলেন। আগামী কাল তিনি নিজে সেগুলি আবার মহড়া দিবেন।

এই সব করিয়া অবশেষে যখন তিনি সাক্ষীদের লইয়া মোক্তারের বাড়ির বাহির হইলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সাক্ষী তদ্বিরকার লইয়া লোক প্রায় কুড়ি জন। সকলকে লইয়া তিনি সমিরের রেষ্টুরেণ্টে ঢুকিলেন। তাদের দাবীমত খাওয়াইয়া, পকেট খরচার নামে তাদের সাক্ষ্যের কিছু কিছু বায়না দিয়া বিদায় করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সারাদিনের একটানা খাটুনিতে শরীরটাও ক্লান্ত বোধ হইল। দোকানে না গিয়া সোজা বাড়ি চলিয়া যাওয়াই তিনি স্থির করিলেন।

নয়াবাজারের আব্বাস কোচমানের আড়গাড়াতেই তাঁর গাড়ী। আব্বাসের সাথে তাঁর মাসিক বন্দোবস্ত। যতক্ষণ সরকার সাহেব শহরে থাকেন, আব্বাস ঘোড়ার দানাপানি খাওয়ায়।

আব্বাসের আড়গাড়া হইতে এক্কা বাহির করিয়া সরকার সাহেব সোজা বাড়িমুখে রওয়ানা হইলেন। শহরের ভিড় ছাড়াইয়া কেশব বাবুর বাংলো পার হইয়া তিনি ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশিলেন। ঘোড়া বেদম চলিতে লাগিল। তিনি নিরুদ্বেগে রাশ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁর মনটা পরিস্থিতিটা আগাগোড়া ঝালাইয়া লইবার সুযোগ পাইল।

মামলার তদবির, কাগজ-পত্র দাখিল, সাক্ষী যোগড়ে প্রভৃতি ঝামেলায় গত কয়টা দিন তাঁর কি কঠোর পরিশ্রমই না করিতে হইয়াছে! একে যোগাড় করেন ত ও ফসকিয়া যায়, এ এই কথা বলিতে রাযী হয় ত ও ঐ কথা বলিতে চায় না। থাপাইয়া থোপাইয়া মোক্তারের পছন্দমত সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করিতে তাঁকে কি বেগই না পাইতে হইয়াছে? কত জনকে কত ভাবেই না টাকা দিতে হইয়াছে। লোকগুলাও যেন তাঁকে আরিং পাইয়াছে। যারা যা খুশি খরচ দাবী করিয়া বসে। তিনি যেন এম-এল-এ-গিরির ক্যানডিডেট হইয়াছেন। তার চেয়েও বেশী গরয সরকার সাহেবের। এটা যে ফৌজদারী মোকদ্দমা। সবাইকে খুশী রাখিতে হইবে। অমুকের ঘরে চাউল নাই, চাউল যোগাড়ে বাহির হইতে হইবে; কাজেই সে মামলার তারিখে শহরে যাইতে পারিবে না। দাও তাকে আধমণ চাউল। অমুকের বৌএর কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, বৌ ঘরের বাহির হইতে পারে না, কাজেই পানি-কাঞ্জি তাকে নিজ হাতে টানিতে হয়; অতএব সে বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবে না। আচ্ছা দাও তার বৌ-এর শাড়ী কিনিয়া। এইভাবে কত বাহানায় কতলোক যে সরকার সাহেবের টাকা লুটিতেছে, তার ঠিকানা নাই। এত করিয়া এই এক ডজন লোককে আজ তিনি মোক্তার-বাড়ি জমায়েত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যবানবন্দির যা মহড়া হইয়াছে, তাতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যাক, টাকা-খরচা ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। অনেক সময় তিনি উত্যক্ত, বিরক্ত ও নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। দুত্তর ছাই! আপসই করিয়া ফেলি আমির আলির সাথে—এও অনেক সময় তাঁর মনে হইয়াছে।

আজ তাঁর মনে হইল, সবুরে সত্যই মেওয়া ফলে। মওলানা মুসার চেষ্টা সফল হইলে সরকার সাহেবের ঠকাই হইত।

এইসঙ্গে তাঁর মনে পড়িল আমির আলির তদবিরের ব্যর্থতা। আমির আলির মোক্তারের বাসায় চর পাঠাইয়া সরকার সাহেব খোঁজ নিয়াছেন। আমির আলি তিন জনের বেশী সাক্ষী যোগাড় করিতে পারে নাই। তার মধ্যে ঈদু শেখই বড় সাক্ষী।

সরকার সাহেব তাঁর কোটের বাম পকেটে হাত দিলেন। ঐ পকেটে ওমর বেপারীর রুগ্ন শয্যাশায়ী বিধবার দস্তখতী এক ঘোষণা-পত্র আছে। এটি সরকার সাহেবের তুরুপ। এই একই তুরুপে ঈদু-শেখের সব কথা মাত হইয়া যাইবে।

পকেটের মধ্যে সরকার সাহেবের হাত এই ঘোষণা-পত্রটি স্পর্শ করিতেই তাঁর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এটি তিনি শেষ মুহূর্তে দাখিল করিবেন। মোক্তারের পরামর্শ এই যে, ঈদু শেখকে তিনি যখন জেরা করিতে থাকিবেন, তখন আদালতের অনুমতিক্রমে ঈদুর সামনে ইহা তুলিয়া ধরিবেন। এতে লেখা আছে ঃ যামিননামায় ওসমান সরকারের তথাকথিত দস্তখতের তারিখের ছয়মাস আগে ঈদু ওমর বেপারীর চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়া আসাম চলিয়া গিয়াছিল। তারপর আর কখনো সে ওমর বেপারীর চাকুরি করে নাই। সুতরাং যদি ঈদু তার যবানবন্দিতে ঐ ধরণের কোনো কথা বলে, তবে এই পত্র দিয়া তার মাথায় বোমা মারা হইবে। আর শরাফত মণ্ডল? সে বেচারার মুখটা একেবারে চ্যাপটা হইয়া যাইবে। সেই ত ও-পালের সর্দার। তার মুখে কালি দেখিতে সরকার সাহেবের কতই না আনন্দ হইবে! কত তদবির করিয়া কত পয়সা খরচ করিয়াই না শরাফত মণ্ডল ঈদুকে দিয়া ঐ মিথ্যা কথা বলাইবার আয়োজন করিয়াছে। এক খোঁচায় বেচারার বেলুনটা ফাটিয়া যাইবে। উহু! লোকগুলি কি বদমায়েশ! ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষী যোগাড়ে কি উস্তাদ! কিন্তু ধর্ম আছে ত?

সরকার সাহেবের মনের স্ফূর্তি বাড়িয়া গেল। তিনি রাশে খেচনি দিয়া ঘোড়ার গতি বাড়াইয়া দিলেন। ঘোড়া তীরবেগে ছুটিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে এক্কা জেলখানার সামনে দিয়া ছুটিতেছিল। জেলখানার উঁচু দেওয়াল সরকার সাহেবের প্রাণে এক মুহূর্তের জন্য ভীতির সঞ্চার করিল। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। পর মুহূর্তেই তাঁর মনে হইল, না, ওটা আমির আলিরই জন্য। তখন তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিলেন, ঐ উঁচা দেওয়ালের মধ্যে আমির আলি হাঁটুর উপর জাঙ্গিয়া পরিয়া ঘানি ঠেলিতেছে। উৎসাহের চোটে তিনি আমির আলির হাতে হাতকড়ি ও কোমরে বেড়িও

দেখিতে পাইলেন। কি একটা অজানা দুশ্চিন্তার হাত হইতে যেন তিনি রক্ষা পাইলেন। একটা ভারী পাথর যেন তাঁর বুকের উপর হইতে নামিয়া গেল। তিনি ওপেনব্রেষ্ট কোটের একটা বোতাম খুলিয়া দিলেন। শার্টের দুই বোতামের ফাঁকে গঞ্জিটা উঁচা করিয়া দেখিলেন বুকটা তাঁর এত শীতেও ঘামিয়া গিয়াছে। তিনি 'কুল্‌হু আল্লাহু' সুরা তিনবার পড়িয়া বুকে ফুঁ দিলেন। এতে আফত-বালা দূর হয়, একথা তিনি নক্‌শে সোলেমানীতে কিম্বা ঐরকম কোনো ফযিলতের পুঁথিতে একবার পড়িয়াছিলেন। সেই হইতে সময় বিশেষে তিনি ইহা আমল করিয়া থাকেন।

এতদিন সরকার সাহেব সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়া আর কিছুরই কথা ভাবিতে পারেন নাই। কারণ 'হারি-কি-জিতি' এই ভাব তাঁর মনকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখিয়াছে। আজ যখন জিত একরূপ হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তাঁর মন সাক্ষী-সাবুদ ছাড়াও অপর পক্ষের উদ্দেশ্য-মতলব সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর পাইল। ওরা সকলে মিলিয়া সরকার সাহেবের সঙ্গে এই যে লড়াইটা করিতেছে, এতে তাদের উদ্দেশ্য কি? কি তারা চায়? তারা কি ইন্‌সাফ চায়? কিছুতেই না। তাদের আসল উদ্দেশ্য যেন-তেন প্রকারে সরকার সাহেবের ক্ষতি করা, লোক চক্ষে সরকার সাহেবকে অপদস্থ করা।

একসময়ে দস্তখতের দৃশ্যটা তাঁর মনে বড়ই পীড়া দিত। কিন্তু আমির আলি জোরের সাথে বলিতেছে সরকার সাহেব সমিরের রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া যামিন-নামায় দস্তখত করিয়াছিলেন। আমির আলির এই উক্তিতে সরকার সাহেবের বিবেক একেবারে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। এ কথা তিনি কোরআনশরীফ হাতে লইয়াও বলিতে পারেন, সমিরের রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া তিনি আমির আলির যামিন-নামায় সই করেন নাই। সেখানে যদি কোনো দলিলে তাঁর নাম লেখা হইয়া থাকে, তবে সেটা নিশ্চয়ই জাল। অবশ্য দস্তখতের জায়গার এই এধার-ওধারে তাঁর বিবেক আগে আগে সব সময় সন্তুষ্ট হইত না। কিন্তু এখন হয়। কারণ আমির আলিও ত কম বদমায়েশ লোক নয়। সেও ত এই মামলায় জিতিবার জন্য কম মিথ্যার আশ্রয় লয়

নাই। বিশেষতঃ ঐ মামলাবাজ শরাফত মণ্ডলটা ; সে শয়তানটা লোককে কত মিথ্যা কথা শিখাইতেছে! সরকার সাহেবের সাচ্চা সাক্ষীগুলিকে কতভাবে ভাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে! তার তুলনায় সরকার সাহেব কোনো অন্যায়েরই আশ্রয় নেন নাই বলা যাইতে পারে। সমিরের রেষ্টুরেণ্টে তিনি যামিন-নামায় দস্তখত করেন নাই, এটা ত খাটি সত্য কথা। অন্য কোথাও যদি তিনি কিছু করিয়া থাকেন, তবে সেটা গলা বাড়াইয়া না বলিলে মিথ্যা বলা হয় না।

হাঁ, সত্য নিশ্চয় তাঁরই পক্ষে। এ মামলায় তাঁর জিত মানেই সত্যের জিত।

সরকার সাহেবের এক্কা তাঁর পুকুর পাড়ে আসিয়া হাজির হইল। বরাবরের মতই সহিস আসিয়া এক্কার ভার লইল। তিনি অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি হাত পা ধুইয়া হুক্কা নিয়া বসিলেন। এমন সময় বাহির বাড়িতে সাইকেলের ঘণ্টার আওয়াজ হইল। পরমুহূর্তে আকবর সাইকেল ঠেলিয়া উঠানে হাজির। সাইকেলটা ঘরের পিড়ায় ঠেস্ দিয়া রাখিয়া সে সোজা সরকার সাহেবের ঘরে ঢুকিল এবং সরকার সাহেবের হাতে একটা টেলিগ্রাম দিল। এই টেলিগ্রাম দোকানের ঠিকানায় আসিয়াছে। ওয়াজেদ ঢাকা হইতে তার করিয়াছে। রাত্রি দশটার গাড়িতে সে পৌছিবে। ষ্টেশনে লোক রাখিতে বলিয়াছে।

সরকার সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। সে বেটা হঠাৎ কেন বাড়ি আসিতেছে? তার টেষ্ট পরীক্ষার আর মাত্র এক মাস বাকী আছে যে।

টেলিগ্রামের খবর পাইয়া বিবি সাহেব পাকঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের ধারণা টেলিগ্রামে মরার খবর ছাড়া আর কিছু থাকে না। বিবি সাহেব আল্লাহ্, আল্লাহ্, করিতে করিতে উঠি-পড়ি করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন: কার টেলিগ্রাম? খবর ভাল ত?

সরকার সাহেব ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন: খবর ভালই; তোমার সাহেবযাদা ওয়াজেদ আলি মিঞা আজ রাত দশটার গাড়িতে তশরিফ আন্‌তাছেন।

বিবি সাহেব সরকার সাহেবের বিদ্রূপে অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন:

আপনের যে কথা! ছেলে বাড়িতে আস্‌তাছে। আপনের ত খুশী হওয়ার কথা। আপনে ত তার বাড়ি আসার কথা শুন্‌লে বরাবর খুশীই হয়েন।

তিনি মনের কথা বিবিকে বলিতে পারিলেন না। বলিলেন: ছেলের পরীক্ষার আর একমাস মাত্র বাকী। সেদিকে খেয়াল আছে?

বিবি: তা থাক। একদিনের লাগি কিছু হৈব না।

সরকার সাহেব জবাব দিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন: তবে কি সে মামলায় মাতব্বরি করিতে আসিতেছে? চিঠিতে সে যা লিখিয়াছিল, কাজেও কি সে তাই করিতে চায়? নিজের ফরযন্দ তাঁর পিঠে ছুরি মারিবে? তাঁর নিজের ছেলে ওয়াজেদ? এটা কি সম্ভব?

সে কি আগে তার মার সাথে দেখা করিয়া তাঁকে সব কথা বলিয়া দিবে? সরকার সাহেব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি তাকিয়ায় কাৎ হইয়া হাতে মাথা রাখিয়া হুক্কা টানিতেছিলেন। চট্ করিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন: অত রাত্রে ভাড়াটিয়া গাড়ি এতদূর আস্‌ব না। ভাড়া চাইয়া বসব তিন চার টাকা। এক্কাই পাঠাইতে হৈব। আকবর! আকবরটা গেল কই?

'জি' বলিয়া আকবর ছুটিয়া আসিল।

সরকার সাহেব বলিলেন: সহিসকে কও, ঘোড়ারে দানা খাওয়াইয়া রেডি থাকৃতে। আর তুমিও তাড়াতাড়ি চারটা খাইয়া লও। আটটা বাজে। নটার মধ্যে গাড়ি লইয়া বাহির হৈয়া পড়তে হৈব। বুঝলে?

দিনের বেলা হইলে সরকার সাহেব নিজেই ছেলেকে আনিতে যাইতেন। কারণ তাঁর আগে ওয়াজেদ আলির সাথে আর কারো দেখা হয়, এটা তিনি পছন্দ করিলেন না। কিন্তু রাতের বেলা এই বয়সে এক্কা চালাইতে তাঁর সাহস হয় না। কাজেই আকবরকে পাঠান স্থির করিলেন। আকবর পাক্কা কোচওয়ান। আর ওয়াজেদ নিশ্চয়ই এতটা পাগল হয় নাই যে, সে আকবরের সাথেই ঐ গুরুতর ব্যাপারে আলাপ শুরু করিবে। এক ভয় তার মার। তাঁর কাছে বলিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু ওয়াজেদকে তিনি যতদূর জানেন, তাতে সে ভয়ও তাঁর নাই। তবু তাঁকে সাবধান থাকিতে হইবে।

তার মার সাথে কথা হইবার আগে তিনি যাতে ওয়াজেদের সাথে আলাপ করিতে পারেন সেজন্য তাঁর জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে এবং কোথায় কিভাবে তাকে একা পাওয়া যায়, তার একটা ফিকির করিতে হইবে।

আঠার

ওয়াজেদের বিবেক ও ন্যায়নিষ্ঠারই শেষ পর্যন্ত জয় হইয়াছিল। দুইদিন সংগ্রামের পর শেষ পর্যন্ত যখন বাড়ি আসিবার সিদ্ধান্ত করিল এবং প্রোভোষ্টের অনুমতি লওয়ার পরে রমনা পোষ্টাফিসে টেলিগ্রাম বুক করিয়া হোষ্টেলে ফিরিল, তখন তার মনে হইল সে জীবনের নামে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছে; সে যেন পিছনের নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছে, আর যেন ফিরিয়া যাইবার কোনো রাস্তা রাখে নাই। সে তখনও মনকে এই স্তোক দিয়াছে যে, বাপকে বুঝাইয়া রাযী করিতে হয়ত বা সে পারিবে। কিন্তু মন সে প্রবোধ মানে নাই। সে যে একটা মহাপরীক্ষা দিতেই যাইতেছে, এভাব সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই।

গাড়ি খানিকটা লেট্ হইয়াছিল। ওয়াজেদ যখন মোমিনশাহী ষ্টেশনে নামিল, তখন এগারটা। টেলিগ্রাম ঠিকমত পৌছিয়াছে কিনা, পৌছিলেও এত রাত্রি পর্যন্ত ষ্টেশনে কেহ আছে কিনা, সে বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। কজেই মনে মনে একরূপ ঠিকই করিয়া রাখিয়াছিল, রাত্রে দোকান ঘরেই গিয়া শুইয়া থাকিবে।

কিন্তু ষ্টেশনের বাহিরে আকবরকে দেখিয়া এবং আকবর এক্কা লইয়া আসিয়াছে শুনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

তারপর ওয়াজেদের লাগেজটা পিছনের সীটে বাঁধিয়া ওয়াজেদকে পাশে বসাইয়া আকবর যখন বাড়ির দিকে গাড়ি ছুটাইল, তখন ওয়াজেদ মুহূর্তের জন্য বর্তমান ভুলিয়া গেল। বরাবরের মতই বাড়ি ফেরার পুলক তার মনকে নাচাইয়া তুলিল। বিদেশ হইতে বাড়ি ফেরার, বিশেষতঃ মায়ের কোলে ফেরার যে বেহেশ্তী পুলক, সেটা কেবল সেই বুঝিতে পারে যার ঘরে মা আছেন।

ওয়াজেদ এই পুলকে ডুবিয়া গেল। বাড়ির গরম হাওয়া অতদূর হইতেও তার বুকে মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। মার আদর-যত্ন ও তাঁর এটা-ওটা জিজ্ঞাসাবাদের মনোরম চিত্র ওয়াজেদের মনকে নাচাইয়া তুলিতে লাগিল। মার কথা মনে হইতেই বাপের কথাও মনে আপনি আসিল। তার মন হঠাৎ বাপের চিত্রের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। মামলার কথা মনে পড়িল। বাড়ির এই যে পুলকানন্দের পরিবেশ এবং তার গরম হাওয়া সে উপভোগ করিতেছে, গত দুইদিন সে এই পুলকানন্দের বিরুদ্ধেই প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছে। এই আনন্দই আজ তার দুশ্‌মন।

আকবরের সঙ্গে এক্কায় চড়িয়া সে আরও কয়েকবার বাড়ি ফিরিয়াছে। সে-সব দিনের মনোরম স্মৃতি তার মনে উদিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ গত ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফিরিবার পথে তাদের এক্কার সঙ্গে সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার সুলেমান সাহেবের গাড়িও একই সাথে গিয়াছিল। সে গাড়িতে ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী ও মেয়ে লুৎফুন যাইতেছিলেন। লুৎফুন বিদ্যাময়ী স্কুলের ক্লাস নাইনে পড়ে। লুৎফুনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কি অপূর্ব সুযোগটাই না সেদিন ঘটিয়াছিল। লুৎফুনরা ছিল এক ভাড়াটিয়া গাড়িতে। সে গাড়ির ঘোড়াটা রেলঘুন্টির কাছে ভয়ানক হট করে। কোচওয়ান কিছুতেই সামলাইতে পারে না। ওয়াজেদ ও আকবরের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত ঐ গাড়ির কোচওয়ান ঘোড়াটা বশে আনে। এইসব হাঙ্গামার সময় মেয়েদের গাড়ি হইতে নামিতে হয়। নইলে গাড়ি উল্টাইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। আকবর যখন কোচওয়ানের সঙ্গে ঘোড়া সামলাইতে ব্যস্ত, তখন ওয়াজেদ মেয়েদের সামলাইবার কাজে নিয়োজিত। ভদ্রমহিলাদের ত আর রাস্তায় দাঁড় করাইয়া রাখা যায় না। তাই সে বুদ্ধিমানের মত তাঁদেরে আনিয়া নিজের এক্কায় বসাইয়া দিয়াছিল এবং এক্কার ঘোড়া দুষ্টামি না করে, সেজন্য নিজে তার রাশ ধরিয়া রাখিয়াছিল। এই সুযোগে আগে লুৎফুনের মার সঙ্গে, পরে লুৎফুনের সঙ্গে তার আলাপ হয়। কি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে লুৎফুন! কি মিঠা তার গলার আওয়ায! পড়াশোনায়ও সে কত ভাল ছাত্রী। ক্লাসে সে প্রায়ই ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হয়। গানে সে প্রাইজ পাইয়াছে।

এই ঘটনা মার কানে যখন পৌছে, তখন লুৎফুনের সাথে ওয়াজেদের বিয়ার কথা তিনি বলেন। বাবারও যে অসম্মতি ছিল তা নয়। বরঞ্চ ওয়াজেদের বি-এ পরীক্ষার পর দেখা যাইবে এমন কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। মার ত নিশ্চিত বিশ্বাস, এ বিয়া একরূপ ঠিক। তিনি ইতিমধ্যে লুৎফুনের মার সাথে দেখা করিয়া কথাবার্তা একরূপ পাকাই করিয়া ফেলিয়াছেন।

কিন্তু আজ? বাপ-মার সঙ্গে সঙ্গে সেই লুৎফুনকেও সে হারাইতে বসিয়াছে। সে আজ গোটা পরিবারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেই বাড়ি যাইতেছে।

বড়লোক চাচাতো-ভাই কলেজে-পড়া ওয়াজেদের সাথে বেশী কথা বলার সাহস বা অভ্যাস অর্ধশিক্ষিত দোকানদার আকবরের ছিল না। কিন্তু এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকা ত তার আদত নয়। তাই সে শুধু আলাপ করিবার ইচ্ছাতেই বলিল: তুমি হঠাৎ বাড়ি আসবা টেলিগ্রাম পাবার আগে সেটা বাড়ির কেউ ধারণাই করতে পারছিল না। খুব জরুরী কোনো ব্যাপারে আসছ বুঝি?

ওয়াজেদ: জরুরী তেমন কিছু না। শুধু মামলাটা দেখতে।

আকবর উৎসাহিত হইয়া বলিল: ওঃ। তা আসবার লাগি মন চাইব না ত কি? দুনিয়ার তামাম লোকই এটা দেখতে আসব। আমরাও চাই আসুক। খোদার ফযলে আমাদের জিত একেবারে বান্ধা।

ওয়াজেদ দেখিল, তার মন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকবরের ঐ আশার সঙ্গী হইয়া যাইতেছে। তার মনও বলিতেছে: বাবারই জিত হউক।

ওয়াজেদ তার মনের উপর চোখ রাঙাইয়া বলিল: সাবধান মন! দুর্বল হইও না। আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিও না।

ওয়াজেদের নীরবতায় অধিকতর উৎসাহিত হইয়া আকবর বলিল: আহা! চাচাজীর উপর দিয়া কি যে তুফানটা গেল এই কয়টা মাস! আমির খাঁ লোকটা যে এতবড় শয়তান তা আগে কেউ জান্‌ত না। চাচাজীর নামে সে কি যে ডাহা মিথ্যা কথা রটাইয়াছে! লোকটার জিভে কিছু

আট্‌কায় না। জিভ ত না, যেন বিষের পিচকারি। চাচাজীর নামে সে রটাইছে ঃ অমুকের আমানতি টাকা খাইছে, অমুক বিবিযানের জমি নিজের নামে বেনামী কইরা হযম করছে, বোর্ডের টাকা তসরুফ করছে ; এই ধরণের কত মিথ্যা যে রটাইছে তার সীমা-সরহদ্দ নাই। হাকিমের সামনে এইসব কথা কওয়াবার লাগি কত লোকেরে যে টাকা সাধছে, তার হিসাব নাই। কিন্তু পারছে একটা লোকেরে বাধ্য করতে ? চাচাজী ফেরেশ্‌তা মানুষ। তাঁর খেলাফে লোকে মিছা সাক্ষী দিতে আসব কেন ?

ওয়াজেদের মনের একাধিক কোণ হইতে পিতৃ-শ্রদ্ধা সজোরে উঁকি মারিতে লাগিল। সে এই ধরণের আলাপ বন্ধ করিবার আশায় বলিল ঃ বাড়ির সব আছে কেমন ? দুদু কেমন আছে ?

দুদু ওয়াজেদের পিতৃহীন ভাতিজা। তাকে সে বড় আদর করে। প্রতিবার বাড়ি আসিবার সময় তার জন্য বিস্কুট, লজেঞ্জ, ঝুনঝুনি একটা কিছু লইয়া আসে। এবার তার জন্য সে কিছুই আনে নাই। তাই তার নামটা মুখে আনিয়াই সে লজ্জা পাইল।

কিন্তু আকবর সেদিকে লক্ষ না করিয়া বলিল ঃ দুদু মিঞাটার দুইদিন থাইকা সর্দি জ্বর হইছে। আর সব ভালাই আছে।

দুইদিন ? দুদু মিঞার জ্বর দুইদিন হইতে ? ঐ শিশু কি চাচার মতলবের কথা জানিতে পারিয়াছে ? হইতেও বা পারে। মাসুম বাচ্চারা নাকি ফেরেশ্‌তা। ওয়াজেদ কল্পনায় দেখিল, অসুস্থ দুদু ফ্যাকাসে-মুখে তার দিকে চোখ তুলিয়া বলিতেছে ঃ চাচাজী, আপনি কি সত্যই দাদার বিরুদ্ধে যাইবেন ?

আকবর ওয়াজেদের মনের খবর রাখে না। সে কথা বলিয়াই যায়। কথাপ্রসঙ্গে সে বলে যে, গত পরশু দিন তাদের বাচ্চা ঘোড়াটা হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে। কি রোগ হইয়াছিল, ভেটেরিনারি ডাক্তারও তা ধরিতে পারে নাই। ওয়াজেদের বুকটা আবার ধড়ফড় করিতে লাগিল। যেদিন হইতে সে ঐ মারাত্মক সিদ্ধান্তটা করিয়াছে, সেইদিন হইতেই তার বাবার লোকসান হওয়া শুরু হইয়াছে তা হইলে ? ওয়াজেদের মনে কষ্ট হইল। বিশেষতঃ

এই বাচ্চা ঘোড়াটাকে সে বড় আদর করিত। সে আদর করিয়া ওটার নাম রাখিয়াছিল দুলদুল। কি তার চেহারা! কি সুন্দর বাঁকা হইয়াছিল তার ঘাড়টা! কি তেজ ছিল তার দৌড়ে! বাঁচিয়া থাকিলে সত্যই একটা ঘোড়ার মত ঘোড়া হইত। তার কথামতই বাবা ওটাকে গাড়ির ঘোড়া না করিয়া দৌড়ের ঘোড়া বানাইতে রাযী হইয়াছিলেন। ওয়াজেদ কল্পনায় দেখিল, বাচ্চা ঘোড়াটা আস্তাবলে তার জায়গায় দাঁড়াইয়া ওয়াজেদকে বলিতেছে: আপনি আমার বুড়া মনিবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন, বাপ-বেটায় বিবাদ হইবে, এটা আমি সহ্য করিতে পারিব না। সেই দুঃখে আমি দুনিয়া ছাড়িয়া চলিলাম।

একটা জানোয়ার পর্যন্ত তাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবিতেছে! তবে কি ওয়াজেদ সত্যই বিশ্বাসঘাতক?

ওয়াজেদের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে গাড়ি রোড বোর্ডের রাস্তা ছাড়িয়া ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় পড়িয়াছে। চাঁদের আলোতে ওয়াজেদের বাড়ি ধব্‌ধব্‌ করিতেছে। চারিদিকে খেত-খোলা ওয়াজেদের জন্য যেন কোল পাতিয়া দিয়াছে। ওয়াজেদের বৈঠকখানার আলো যেন তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

সে নিজেকে আবার প্রশ্ন করিল: আমি কি সত্যই এদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে যাইতেছি?

এক্কা পুকুরপাড়ে উঠিল। ওয়াজেদ দেখিল বাবা বৈঠকখানার সামনে দাঁড়াইয়া যেন তারই অপেক্ষা করিতেছেন। গাড়ি বৈঠকখানার সামনে গিয়া থামিল। ওয়াজেদ গাড়ি হইতে নামিয়া বাবার কদমবুসি করিল। বাবা সস্নেহে পুছ করিলেন: শরীর ভাল ত?

ওয়াজেদ বলিল: জি, হাঁ।

ওয়াজেদের জিনিসপত্র তার ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য চাকরকে এবং ঘোড়াকে ঠিকমত দানা দিবার জন্য সহিসকে হুকুম দিয়া সরকার সাহেব ওয়াজেদের দিকে চাহিয়া বলিলেন: বাবা, অন্দরে চল।

অন্দরে চলিতে চলিতে তিনি ওয়াজেদের খুব কাছ ঘেঁষিয়া বলিলেন:

যদি তুমি ঐ ব্যাপারের লাগি আইসা থাক, তবে জাইনা রাখ, তোমার মা ওর বিন্দুবিসর্গও জানে না। বুঝলে ত কথা আমার?

ওয়াজেদ যন্ত্রের মত বলিল: জি, বুঝছি।

সরকার সাহেব যেন এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বিরক্তি-মাখা সুরে বলিলেন: তবে তুমি ঐ কাজেই আসছ?

আগের মতই সুরে ওয়াজেদ বলিল: জি, হাঁ।

সরকার সাহেব ঠোঁটে কামড় দিলেন। কিন্তু আর বেশী কিছু বলিবার সময় নাই। সদর দরজায় বিবি সাহেব পুত্রের ইন্তেযারে দাঁড়াইয়া আছেন দেখা যাইতেছে। তাই তিনি শুধু বলিলেন: চল আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ কইরা লই, তারপর কথা হৈব।

তবে বাবা কি এখনো খান নাই? এতরাত পর্যন্ত তার অপেক্ষাতেই না খাইয়া বাবা বসিয়া আসেন? এমন বাবার বিরুদ্ধে তাকে যাইতে হইবে? হা খোদা, তুমি এ কি বিপদে ফেলিলে ওয়াজেদকে!

আস বাবা আমার। শরীল-গতর ভালা আছে ত? রাস্তায় কোন তকলিফ হৈছে না ত?—মা সদর দরজার চৌকাঠে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন। ওয়াজেদের চমক ভাঙিল। সে দৌড়িয়া গিয়া মায়ের কদমবুসি করিল।

মা ছেলের কাঁধে হাত দিয়া তাকে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেলেন। সরকার সাহেব গলা-খাস্‌কি দিতে দিতে মা-বেটার পিছনে খুব কাছে কাছে চলিতে লাগিলেন।

ওয়াজেদ বুঝিল, বাবা তাকে তার ওয়াদা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন এবং সম্ভবতঃ গার্ডও দিতেছেন। তবে তার প্রতি বাবার অবিশ্বাস শুরু হইয়া গিয়াছে? কেন হইবে না?

উনিশ

হাতমুখ ধোওয়ার পর ওয়াজেদ মার কাছেও জানিতে পারিল, বাবা তারই অপেক্ষায় এখনও না খাইয়া আছেন। বাবা খান নাই, কাজেই মাও খাইতে পারেন নাই। ওয়াজেদের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন

বাবার বিরুদ্ধে দুদিন বাদে সে কাঠগড়ায় দাঁড়াইবে? এমন মার মনে সে আঘাত দিবে?

খাওয়ার সময় মা সামনে বসিয়া খাওয়াইলেন। এটা-ওটা সাত পাঁচ আলাপ তুলিলেন। যায়েদা আসিয়া সে আলাপে যোগ দিল। কথায় কথায় ওয়াজেদের মনটা হালকা হইল। তারও মুখ খুলিয়া গেল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সরকার সাহেবও আলোচনায় যোগ দিলেন। ওয়াজেদ বাড়ির সকলের কথা, পাড়ার লোকের কথা, খেতের ফসলের কথা, স্কুল-মাদ্রাসার কথা, ইউনিয়ন বোর্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া খবর নিল এবং কলেজের কথা, প্রফেসারদের কথা, মন্ত্রীদের কথা প্রভৃতি অনেক ব্যাপার বাপ-মাকে শুনাইল।

কথায় কথায় সে আগের মতই এ বাড়ির পরিবেশের মধ্যে মিশিয়া গেল। মুহূর্তের জন্য তার সংকল্পের কথা ভুলিয়া গিয়া সে পূর্বের ওয়াজেদ হইয়া গেল। মা-বাপ, বোন-ভাতিজা, সবাইকে সে আপন করিয়া লইল এবং সে নিজে উহাদের আপন হইয়া গেল।

তার ভাবী দুদুকে গরম কাপড়ে জড়াইয়া মাথায় তুলার টুপি চড়াইয়া সামনে আনিয়া বসাইল। মার পরামর্শ-মত সে চাচাকে হাত তুলিয়া আদাব দিল। ওয়াজেদ বাঁ হাত বাড়াইয়া ভাতিজার গাল টিপিয়া চুমা খাইল। দুদু পাল পাল করিয়া হাসিল। ওয়াজেদের মন অপূর্ব স্নেহে ভরিয়া উঠিল। ভাতিজার সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় আলাপ করিল এবং তাড়াতাড়িতে কিছু আনিতে পারে নাই বলিয়া তার জরিমানাস্বরূপ আগামী কাল বেশী করিয়া লযেঞ্জ কিনিয়া আনিবার ওয়াদা করিল। দুদু তাতে সন্তুষ্ট হইল বলিয়া মনে হইল। সে চাচার সঙ্গে খাইবার জন্য যিদ করিতে লাগিল বলিয়া তার মা তাকে ফাঁকি দিয়া সরাইয়া লইয়া গেল।

তখন আবার পিতা-মাতা-পুত্রে সাংসারিক আলাপ শুরু হইল। হ্যারিকেনটা খুব কাছে লইয়াই খাওয়া হইতেছিল। বাতির উজ্জ্বল আলোকে ওয়াজেদ পুনঃপুনঃ বাপের মুখের দিকে আড়চোখে চাহিতেছিল। সে দেখিল বাবার আর সে স্বাস্থ্য নাই, তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে,

চোখ বসিয়া গিয়াছে, চোখের নীচের পাতি একটু ফোলা ফোলা। বাবাকে বড় বেশী বুড়া দেখাইতেছে।

পথে আসিতে গাড়িতে আকবর বলিয়াছিল যে, আমির আলি বাবার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়াছে। মানুষের মান-ইয্যতে আঘাত লাগিলে তাদের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে, মনস্তত্ত্বের ছাত্র ওয়াজেদের তা পড়া আছে। সে ধরিয়া লইল আমির আলিই বাবার এই স্বাস্থ্যহানির মূলে। আমির আলির উপর তার রাগ হইতে লাগিল। এই মামলার ব্যাপারে যাই হোক, অন্য সব ব্যাপারে বাবা যে নিষ্পাপ, তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজেই ওয়াজেদের মন বাবার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। আলাপে আলাপে এই জন্মস্থানের পরিবেশের মধ্যে সে যতই ডুবিয়া যাইতে লাগিল, মার কোল ও বাবার বাহু তাকে ততই খেচিয়া নিতে লাগিল। সে এই বাপ-মার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে তাঁদেরই টাকায় তাঁদেরই বাড়িতে আসিয়া তাঁদেরই পাশে বসিয়া তাঁদেরই খানা খাইতেছে, একথা ভাবিয়া সে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইতে লাগিল। সততা ও সাধুতার বড়াই করিবার তার কি আছে? যাঁদের খাইব, তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদেরই দুশ্‌মনি করিব? এটা কোন্ শ্রেণীর আদর্শ-নিষ্ঠা? যে মা কাছে বসিয়া নিজহাতে রান্না-করা খানা তার পাতে তুলিয়া দিতেছেন, যে বাবা সারাদিন উপবাস করিয়া এতক্ষণে কাছে বসিয়া হাসিমুখে দুটি ভাত মুখে দিতেছেন, তাঁরা ত জানেন না তাঁদের ছোবল মারিবার জন্য তাঁদেরই আদরের পুত্র পকেটে করিয়া বিষধর সাপ লইয়া আসিয়াছে। ওয়াজেদ এ সুবিধা ও এ সুযোগ পাইতেছে কেন? এঁরা তাকে অপরিসীম স্নেহ করেন বলিয়া ত? ওয়াজেদ কি তাঁদের অন্ধ স্নেহের জঘন্য নীচ অসদ্ব্যবহার করিতেছে না? এ স্নেহ ভোগ করার তার কি অধিকার আছে? যদিই সে সত্যিকারের সত্যনিষ্ঠ হয়, যদিই সে বাপকে সত্যই অপরাধী মনে করে, তবে এইমুহূর্তে বাবার সম্পর্ক ত্যাগ করা কি তার উচিত ছিল না? তাঁর দেওয়া টাকা-পয়সা দূরে ফেলিয়া দিয়া, তাঁর দেওয়া কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়া, তাঁর টাকায় কেনা পুস্তকাদি

নদীতে ভাসাইয়া দিয়া, সম্ভব হইলে তাঁর টাকায় অর্জিত বিদ্যা পর্যন্ত উট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিয়া নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হইয়া যাওয়া কি ওয়াজেদের কর্তব্য ছিল না? তা না করিয়া ওয়াজেদ কিনা এখনও সেই বাপের দেওয়া সব সুবিধা ভোগ করিতেছে! আর সেই সুবিধার চূড়ায় বসিয়া অসতর্ক বাপের বুকে ছুরি বসাইবার গোপন চিন্তা করিতেছে! এটার নাম আর যাই হোক, সত্যনিষ্ঠা নয়। বাবা-মা যদি তার প্রতি স্নেহে অন্ধ না হইতেন, তবে তাঁরা তার এই ষড়যন্ত্র ধরিয়া ফেলিতেন, তার পিঠে চাবুক মারিতে মারিতে এই সব সুবিধা কাড়িয়া লইতেন। তা যদি তাঁরা করিতেন, তবে ওয়াজেদ আলি ঢাকা হইতে ইণ্টার ক্লাসে করিয়া মোমেন-শাহী আসিত আমির আলির পক্ষে সাক্ষ্য দিতে কার টাকায়? কার বাড়িতে বসিয়া আজ রাতে মুর্গীর গোশ্‌ত খাইত? আমির আলির বাড়ি বসিয়া কি? ছিঃ ছিঃ, কি ঘৃণা! স্নেহের এমন জঘন্য ব্যাভিচার ওয়াজেদ ছাড়া আর কেউ করিতে পারিত না।

খাওয়া শেষ হইতে হইতে ওয়াজেদের মন একেবারে নরম হইয়া গেল। খাওয়া শেষ হইবার পর স্বামীর সামনে তৈরী-পান-ভরা পানদানটা আগাইয়া দিয়া এবং চাকরকে হুক্কা দিতে বলিয়া বিবি সাহেব নিজে খাইবার জন্য পাকঘরে চলিয়া গেলেন। সরকার সাহেব ওয়াজেদের সহিত কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া যেমন খুশী হইলেন, ওয়াজেদ তেমনি ভয় পাইল। তার মনে হইল, বাবার সাথে ও-ব্যাপারে তর্ক করিবার এবং সে তর্কে জিতিবার মত মনের জোর আর তার নাই। কাজেই বাবার মুখের দিকে সে চাইতে পারিল না, অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। দরজার ফাঁক দিয়া পাকঘরের দিকে চাহিয়া সরকার সাহেব ওয়াজেদকে প্রশ্ন করিলেন: তোমার শেষ পত্রে ও-সব কি রাবিশ লেখ্‌ছিলা? ও-সব বাজে কথার অর্থ কি?

ওয়াজেদ মাথা তুলিল। দেখিল বাবা তার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

কঠোর দৃষ্টিপাতের কোনো দরকার ছিল না। আগে হইতেই ওয়াজেদ

ভীরুর মত কাঁপিতেছিল। সে জিভ দিয়া ঠোঁট ভিজাইয়া ঢোক গিলিয়া বলিল : বাপজান, আমার কোনো খারাপ মতলব আছিল না।

সরকার সাহেব সুরে কঠোরতা আনিয়া বলিলেন : তোমার মতলব খারাপ কি ভালা, সে কথা কইতাছি না। মতলবটা কি, তাই আগে জানবার চাইতাছি।

ওয়াজেদ আরেকবার ঢোক গিলিল। কে যেন তার কানের কাছে বলিয়া গেল : ওয়াজেদ, বুকে সাহস বাঁধ। এখনি অমন কাপুরুষ হইয়া গেলে কেন ?

ওয়াজেদ সে কথায় যেন একটু সাহস পাইল। বলিল : বাপজান, আপনে একদিন ঘোড়ার গাড়িতে নিজমুখে আমারে ঐ দস্তখতের কথা—

ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া সরকার সাহেব বলিলেন : তুমি নিশ্চয় খাব দেখ্ছ, বাবা।

কথাবার্তায় ওয়াজেদের সাহস একটু বাড়িয়াছিল। সে এইবার সহজ সুরে বলিল : না, বাপজান, আমি খাব দেখ্ছি না। আপনে বোধ হয় ভুইলা গেছেন ; কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে। আপনে আর আমি ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি আসতেছিলাম। আফসর ভিলার সামনে আমির মিঞার সাথে আপনার—

সরকার সাহেব ছেলেকে কথা শেষ করিতে দিলেন না। ছেলের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বাধা দিয়া তিনি বলিলেন : তুমি খাব দেখবা, আর তোমার খাবের কথা মনে রাখমু আমি ? এ সব কি বাজে কথা বক্তাছ ? তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ হৈছে না ত ?

ওয়াজেদ বিষম দ্বিধায় পড়িল। সে আশা করিয়াছিল, হয় বাবা তার কথা মানিয়া লইবেন, নয়ত রাগে গর্জিয়া উঠিয়া তাকে গালাগালি শুরু করিবেন। কিন্তু বাবা ও দুইটার একটাও করিলেন না। তাঁর এই ঠাণ্ডা মেযাজ ও দৃঢ়তার সামনে ওয়াজেদের আত্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিল। তবে কি সত্যই সে স্বপ্ন দেখিয়াছে ? তার কি সত্যই কোনো অসুখ করিয়াছে ? সে কি একেবারে বাজে বকিতেছে ?

ওদিকে বাবাও ছেলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তিনি ভাবিতেছেন: ছেলেটাকে কেউ কুসল্লা দিলনা ত? ও শয়তানদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব না।

ওয়াজেদের পিছন হইতে কে যেন তার কানের কাছে আবার বলিয়া গেল: ওয়াজেদ, বুকে সাহস বাঁধ।

সে কিছুটা আত্মস্থ হইল। একটু ভাবিয়া বলিল: বাপজান, এ ছাড়া আপনে আমির মিঞার আর কোনো ব্যাপারে কি যামিন হইছেন?

"হাঃ হাঃ! খোদার হাজার শুকুর, সে রকম আহাম্মকি আমি করছি না।"

ওয়াজেদ দৃঢ়তর হইয়া বলিল: তা হৈলে, বাপজান, আপনে আমির মিঞার নামের এই মামলা উঠাইয়া লন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আপনে দস্তখতের কথা আমারে কইছিলেন। আপনে ব্যাপারটা ভুইলা গেছেন। ভুইলা না গেলে আপনে ইচ্ছা কইরা এমন অন্যায় কাজ করতাছেন, এটা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

সরকার সাহেব হঠাৎ কথাটার কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর গম্ভীরতায় সমস্ত ঘরটা থম থম করিতে লাগিল। তিনি সেই থমথমে গাম্ভীর্য ভেদ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন: ওয়াজেদ, তুমি এখনো বাজে বক্তাছ? না, বাবা, তুমি কালই ঢাকা ফিইরা যাও। গিয়া পড়াশোনায় ভাল কৈরা মন দেও। কুচিন্তা কৈরো না।

—বলিয়া সরকার সাহেব হুক্কায় একটা লম্বা দম দিলেন এবং একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া একটা পান মুখে দিলেন। ভাবটা এই যে, এ-ব্যাপার এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

কিন্তু ওয়াজেদের কানের কাছের সেই আওয়াযটা যেন আবার বলিতে লাগিল: ওয়াজেদ, ব্যাপারটা এভাবে শেষ হইতে দিও না। সাহসে ভর করিয়া কথাটা পরিষ্কার করিয়া ফেল।

ওয়াজেদ একটু কাশিয়া গলা সাফ করিয়া বলিল: বাপজান, আমি আপনেরে ফের অনুরোধ করতাছি, আপনে এই মামলা উঠাইয়া আনেন।

সরকার সাহেব হুক্কার নলটা মুখে লইতে যাইতেছিলেন, সেটা ধপ-

করিয়া বিছানায় ফেলিয়া দিয়া পুত্রের মুখের উপর এমন দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাকে খাইয়া ফেলিবেন। বলিলেন : তুমি ত দেখি আমারে পীর সাহেবের মতই নসিহত শুরু করছ। তুমি আমারে কি মনে করতাছ? একটা মস্তবড় শয়তান বুঝি?

লজ্জায় ওয়াজেদ অতটুকু হইয়া গেল। সে আমিষি করিয়া বলিল: আমারে মাফ করেন, বাপজান। আপনে ঘটনাটা একদম ভুইলা গেছেন, এর বেশী আমি কিছুই কইছি না।

সরকার সাহেব নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া বলিলেন : শোন ওয়াজেদ, এইবার সোজা কথাটা কইয়া ফালাও ত তুমি কি উদ্দেশ্যে বাড়ি আসছ।

ওয়াজেদ থমকিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল : আমার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সাধু। আমি বাড়ি আসছি আপনেরে অন্যায় কাজ থাইকা ফিরাইবার লাগি। আমি জানি, বাপজান, এ অন্যায় যদি আপনে কৈরা ফেলেন, তবে দুদিন পরে আপনে নিজেই অনুতাপ করবেন।

সরকার সাহেব ধৈর্য হারাইলেন। বিবি সাহেব ও-ঘর হইতে শুনিয়া ফেলিতে পারেন তা যেন তিনি ভুলিয়াই গেলেন। গলা চড়াইয়া তিনি বলিলেন : ওয়াজেদ, তুমি কি এটা জান না আমারে জেলে পাঠাইবার লাগি গাঁয়ের সব লোক জোট বাঁধছে? আমার নুৎফের করযন্দ হৈয়া তুমিও তারার সাথে যোগ দিলে? বুড়া বাপের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে তোমার দিল্ চাইল? আমার সামনে বইসা ই-সব কথা কইতে তোমার শরম লাগতাছে না?

ওয়াজেদের হাত-পা দুর্বল ও চোখ অন্ধকার হইয়া আসিল। তার গলা শুকাইয়া গেল। সে কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু 'বাপজান' ছাড়া আর কিছু বলিতে পারিল না। একটা কিসের দলা ঠেলিয়া উঠিয়া তার গলা আটকাইয়া দিল। সে দেখিল, দুঃখে রাগে সরকার সাহেবের শরীর কাঁপিতেছে।

খানিকক্ষণ পরে সরকার সাহেব আবার গলার সুর নরম করিয়া ডাকিলেন : ওয়াজেদ!

কূয়ার নীচে হইতে যেমন করিয়া আওয়ায আসে, ওয়াজেদের পেটের মধ্য হইতে তেমনি যেন কথা বাহির হইল : জি।

"কেটা তোমারে এই কুসল্লা দিছে কও ত?"

"কেউ আমারে কুসল্লা দিছে?"—ওয়াজেদ অবাক হইয়া চারদিকে চোখ ঘুরাইয়া বাপের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিল। বলিল : এ কথা কেন কইলেন, বাপজান?

সরকার সাহেব মৃদু হাসিলেন। বলিলেন : আমার মনে হৈতাছে, তুমি কাঠগড়ায় খাড়া হইয়া আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার চাও।

ওয়াজেদ আগ্রহের সুরে বলিল : আপনে যদি মামলা উঠাইয়া আনেন, তবে সে কাজ আমার করতে হয় না, বাপজান।

সরকার সাহেব দাঁত কিড়মিড় করিয়া বিদ্যুৎবেগে খাড়া হইয়া উঠিলেন। ওয়াজেদও চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সরকার সাহেব 'তবে রে হারামযাদা' বলিয়া ওয়াজেদের ঘাড় চাপিয়া ধরিলেন। কি হইতেছে না বুঝিয়াই ওয়াজেদ সবলে নিজেকে বাপের হাত হইতে ফস্‌কাইয়া দু পা পিছাইয়া গেল।

সরকার সাহেবও লজ্জা পাইলেন। তিনি যেন এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, ওয়াজেদ আর এখন আট-দশ বছরের শিশু নয় যে তার গায়ে তিনি হাত তুলিতে পারেন। তার বদলে আজ তাঁর সামনে দাঁড়াইয়া আছে বাইশ বছরের একটি বলবান যুবক, যে ইচ্ছা করিলে আঘাতের বদলে আঘাত হানিতে পারে।

তিনি নিজের রাগ অন্যদিকে চালাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন : বাইর হৈয়া যা আমার সামনে থাইকা। আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।

ইতিমধ্যে বিবি সাহেব আসিয়া দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি পিতা-পুত্রের এই ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন। কিছুই বুঝিতে না পারিলেও তাঁর মনে ভয় হইল। তিনি দুজনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন : কি হইছে?

কেউ তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ওয়াজেদ শুধু বলিল : আচ্ছা, আমি বাইর হৈয়া গেলাম।

—বলিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বিবি সাহেব কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, এটা বুঝিলেন যে, তাঁর খসম পুত্রকে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছেন, আর পুত্রও বাহির হইয়া যাইতেছে। এ বাহির হইয়া যাওয়ার তিনি গুরুতর অর্থই করিলেন। কারণ নিজের পেটের ছেলের দেমাগ ও মেজায তিনি জানিতেন।

কাজেই স্বামীকে কোনো কথা না বলিয়া তিনি দ্রুতপদে পুত্রের পিছনে ছুটিলেন। ভয়-আশঙ্কায় তাঁর বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল।

কিন্তু বিবি সাহেবার আশঙ্কা ও ভয় দূর হইল। তিনি দেখিলেন, ওয়াজেদ তার নিজের কামরায় গিয়া শুইয়া পড়িল এবং হাত বাড়াইয়া শিরানার পাশের হ্যারিকেনটা কমাইয়া দিল।

তিনি কোনো কথা না বলিয়া মশারিটা ফেলিয়া দিলেন এবং টানিয়া টুনিয়া চারদিক তোষকের নীচে গুঁজিয়া দিলেন। এই কাজ করিবার সময়ে তিনি ছেলের দিকে তীব্র নযর রাখিলেন। ওয়াজেদ নাকে মুখে লেপ টানিয়া দিয়াছিল বলিয়া তিনি ছেলের মুখ দেখিতে পাইলেন না। তবু তিনি শুনিলেন লেপের নীচে হইতে ফোঁৎ ফোঁৎ কান্নার আওয়ায আসিতেছে।

তিনি মশারির মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া ছেলের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং লেপের নীচে দিয়া ছেলের বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ওয়াজেদ চোখ না মেলিয়াই মার হাতের পরশ বুঝিতে পারিল। তার দরিয়া ভাঙিয়া কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু বাপের সামনে সে দুর্বল হয় নাই, মায়ের সামনেও সে দুর্বল হইতে পারে না; তা হইলে তার সব সংকল্প ওলট-পালট হইয়া যাইবে যে। তাই সে প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিল।

মা হাত বুলাইতে বুলাইতে পুছ করিলেন: কি হইছে বাবা?

ওয়াজেদ জবাব দিল না।

মা ছাড়িলেন না। বলিলেন: আমার কাছে কও, বাবা, কি হইছে? টাকা-পয়সা চাইছিলা? কত টাকা?

ওয়াজেদ এবার কথা বলিলঃ আমারে পুছ করবেন না মা, বাবাকেই গিয়া পুছ করেন।

—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিবি সাহেব ছেলেকে আর বিরক্ত না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু হাত সরাইয়া আনিলেন না। ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে থাকিলেন।

খানিক পরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বুঝিলেন ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমাইবেই ত। সারাদিনের রাস্তার হয়রানি। তিনি আস্তে আস্তে হাত সরাইয়া ভাল করিয়া লেপটা টানিয়া মশারি গুঁজিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিলেন। কপাটটা আস্তে আস্তে ভিড়াইয়া দিলেন।

বিবি সাহেব রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িলেন। স্বামী যা বলিলেন তার মর্ম এই যে, পরীক্ষার পড়া ফেলিয়া ওয়াজেদ বাড়ি চলিয়া আসায় তিনি ধমক দিয়াছিলেন। তারই জবাবে ওয়াজেদ বেআদবি-পূর্ণ কথা বলিয়াছে। যা হোক, সরকার সাহেবের অতটা রাগিয়া যাওয়া ঠিক হয় নাই। স্বামীর কথা শুনিয়া বিবি সাহেব তাঁকে তসল্লি দিলেন। ছেলের তরফ হইতে মাফও চাইলেন। ওয়াজেদ ছেলে মানুষ। নানাবিপদে স্বামীরও মেজায ঠিক নাই। সরকার সাহেব গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

কুড়ি

আসলে ওয়াজেদ ঘুমায় নাই। মাকে এড়াইবার জন্যই সে ঘুমের ভান করিয়াছে। মার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিবার তার খুবই লোভ হইতেছিল। সে লোভ এমন দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, আরেকটু হইলে বলিয়াই ফেলিয়াছিল আর কি। তাই ওয়াজেদ ঐ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। সে যে মাকে কোনো কথা বলিবে না, বাবার কাছে তা ওয়াদা করিয়াছে।

মা বাহির হইয়া যাওয়ামাত্র সে মুখের লেপ সরাইয়া চারদিক চাহিল।

এই বাড়িঘর, এই বিছানা-পত্র, এই রাজাই-মশারি, এই খাট-পালং সব ফেলিয়া সে চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে? বাপজান ত যাইতে বলিয়াই

দিয়াছেন। অন্যায় বলিয়াছেন? না, ঠিকই ত বলিয়াছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, আর তাঁরই বাড়িতে থাকিয়া তাঁরই খানা খাইবে, এটা হয় না। তবে—তবে পরশুদিন সে কি করিবে? সে কি তবে মামলায় হস্তক্ষেপ করিবে না? বাপের কথামত সে কি কালই ঢাকায় চলিয়া যাইবে? সেখানে গিয়া পড়াশোনায় মন' দিবে? তা কেমন করিয়া সম্ভব? সে যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। ফিরিবার যে আর উপায় নাই।

কিন্তু—কিন্তু এসব ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? কোথায় গিয়া সে বাপ-মার স্নেহাদর, এই আরাম, এই লেপ-তোষক, এই দালান-কোঠা পাইবে? কোথায় গিয়া কার বাড়িতে সে উঠিবে?

সে দেখিল ভবিষ্যৎ শুধুই অন্ধকার। সে কল্পনায় দেখিল সেই অন্ধকারে সে একা একা কেবলই সামনের দিকে চলিয়াছে; কোথায় চলিয়াছে সে নিজেই জানে না; কারণ সামনে কিছু নযর পড়িতেছে না।

সে শিহরিয়া উঠিল। না, না, সে এমন ভয়াবহ পরিণামের সামনে যাইতে পারিবে না। সে পরশু কাঠগড়ায় উঠিতে পারিবে না। উঠিলেও সে তথায় বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইবে। একটা কথাও সে বলিতে পারিবে না। নাহক তবে এ তামাসা করিয়া লাভ কি?

লাভ নাই, সেটা ওয়াজেদ বুঝিল। কিন্তু নির্দোষ আমির মিয়ার যদি জেল হয়। জালিয়াতির চার্জে নাকি সাত বছর পর্যন্ত জেল হইতে পারে। যদি হয়? কি সাংঘাতিক! আমির আলির অসহায় স্ত্রী, তার নাবালক ছেলেপিলে, ওদের কি হইবে? একটা নির্দোষ লোকের সাত বছর জেল হইবে, তার পরিবারটা ধ্বংস হইয়া যাইবে। অথচ ওয়াজেদ সত্য কথা জানিয়াও তা বলিবে না? এত বড় অন্যায় করিলে ওয়াজেদকে জীবনব্যাপী যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না? জীবনভর এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে ঐ অন্ধকার ভবিষ্যৎ কি বেশী ভয়াবহ?

সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। লেপের নীচে সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। শীত কমিয়া গেল। গরমে দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। সে লেপটা ফেলিয়া দিল। উঠিয়া বসিল। তবু তার অস্থিরতা কমিল না।

সে বিছানা হইতে নামিল; হারিকেনটা বাড়াইয়া দিল; ঘরের মেজেয় পায়চারি করিল। কিছুতেই মন স্থির হইল না। কারো কাছে মনের এ উদ্বেগ ঢালিলে সে যেন একটু সান্ত্বনা পাইত। কিন্তু বলিবে কার কাছে?

আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিল। চারদিক তাকাইল। সব বাড়ি অন্ধকার। শুধু জায়েদার কামরা হইতে আলো আসিতেছে।

সে টিপি টিপি পা ফেলিয়া যায়েদার ঘরের বারান্দায় গেল। জান্‌লা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল যায়েদা জায়নামাযে বসিয়া তস্‌বিহ্‌-তেলাওৎ করিতেছে।

সে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিল। দরজা খুলিয়া গেল। সে ঘরে ঢুকিল।

যায়েদা চমকিয়া উঠিল। বলিল: কেটা, ওয়াজেদ?

ওয়াজেদ ফিস ফিস করিয়া বলিল: চুপ। বাবা-মা টের পাবে।

ঘরের মেঝেতেই জায়নামায পাতিয়া যায়েদা তেলাওৎ করিতেছিল। তার পাশে একটা মোড়া পড়িয়াছিল।

ওয়াজেদ মোড়াটা টানিয়া লইয়া যায়েদার কাছ ঘেঁষিয়া বসিল। যায়েদা তস্‌বিহ রাখিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে ছোট ভাইর দিকে চাহিল। বলিল: কিছু কইবার চাও?

ওয়াজেদ গলা আরো ছোট করিয়া বলিল: হাঁ বুবু। একটা অত্যন্ত গোপন কথা।

যায়েদা হাসিল। নিশ্চয় লুৎফুনের কথা হইবে। সে বলিল: গোপন কথা কইবার আর তর সইল না বুঝি?

বলিল বটে, কিন্তু যায়েদার চোখেমুখে আগ্রহ ফাটিয়া পড়িল। সে শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া ওয়াজেদের দিকে ফিরিয়া বসিল এবং বলিল: কি কথা?

ওয়াজেদ চাপা গলায় বাপের যামিন হওয়ার সব কথা বোনের নিকট খুলিয়া বলিল। যায়েদা বিস্ময়ে অবাক হইয়া হা করিয়া সব কথা শুনিল। শুনিতে শুনিতে কখনো বিস্ময়ে তার চোখ বড় হইল; কখনো সে অবিশ্বাসের

মুখভঙ্গি করিল ; কখনো অসহ্য হওয়ায় ছোট ভাইর হাত ধরিয়া সে বলিল : ওয়াজেদ, সোনার ভাইটি, ওসব কথা আর মুখে আইনো না। তোমার মাথার কোনো দোষ হৈছে।

কিন্তু ওয়াজেদ কথা মানিল না। তার বক্তব্য সে শেষ করিল। তার কথা শেষ হইলে জায়েদার চোখ-মুখের রং বদলিয়া গেল। তার চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তার মনে যেন বিরাট ঝড় উঠিয়াছে।

অবশেষে ওয়াজেদ বিদায় লইল। কিন্তু যায়েদার মনের ঝড়ের বেগ আরো বাড়িল। সে আর তেলাওতে মন বসাইতে পারিল না, বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তার মনের ঝড় বাহিরের প্রকৃতিতে শোঁ শোঁ আওয়ায করিতে লাগিল। কামরার অন্ধকার তার মনে ভয়ের সৃষ্টি করিল। সে হারিকেনের তেজ খুব করিয়া বাড়াইয়া দিয়া কামরা আলোকিত করিল। ভয়ে সে আর বিছানায় যাইতে পারিল না। রাত না পোহাইলে সে যেন আর শান্তি পাইবে না। এখনো অনেক রাত বাকি অথচ বাড়িতে চোর ঢুকিয়াছে। সে বাড়ির শান্তি চুরি করিতে আসিয়াছে। সে চোর তারই মার পেটের ভাই। হা কপাল!

ছেলে হইয়া বাপজানের বিরুদ্ধে এমন কুকথা বলিতে পারে! এসব কথা কি সত্য হইতে পারে? কখনো না, কখনো না। তা হইলে যে দুনিয়াটাই মিথ্যা হইয়া যাইবে। খোদা, তুমি যায়েদার দিলে রোশনি দাও। সে কি এতকাল বৃথাই এত নামায-বন্দেগী করিয়াছে? এ বিপদের সময়েও কি আল্লাহ্ তাকে মদদ্ করিবেন না?

যায়েদা আবার জায়নামাযে বসিল। সে এক হাজার বার 'আল্হক' তেলাওৎ করিয়া মোনাজাতে হাত উঠাইল: হে খোদা, তার বাপের বিরুদ্ধে দুশ্‌মনদের এই এল্‌জাম সত্য হইতে পারে না। যদি সত্য হয়, হে খোদা, তুমি সেটা যায়েদাকে বলিয়া দাও। যায়েদার প্রাণ তাতে যদি ফাটিয়াও যায়, তবু যায়েদা তাতে ভয় পাইবে না। কারণ যায়েদা হক কথা শুনিতে চায়।

যায়েদার হাত নামিল না। তার চোখ বাহিয়া অবিরত পানি পড়িতে লাগিল। সে পানিতে তার গাল, বুক ও কোলের কাপড় ভিজিয়া গেল। কখন যে যায়েদার হাত নামিয়া পড়িল এবং সে সিজদায় গেল, যায়েদা তা টেরও পাইল না। সিজদায় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে স্বপ্নে দেখিল, কে যেন তার মাথার কাছে আসিয়া তাকে ডাকিল: মা যায়েদা, তুমি মাথা উঠাও। যায়েদা সিজদা হইতে মাথা তুলিল। দেখিল, একজন বুড়া পীর। গায়ে লম্বা কোর্তা, হাতে তসবিহ্, মুখে নাভি পর্যন্ত সাদা দাড়ি, পায়ে খড়ম, মুখে নূরানী চেহারা। পীর সাহেব বলিলেন: আমি খাজে খিযির। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নাই। তোমার বাবা নির্দোষ।—এই বলিয়া পীর সাহেব গায়েব হইয়া গেলেন।

যায়েদা ধড়মড় করিয়া উঠিল। ইয়া আল্লাহ্, সে জায়নামাযে সিজদায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল? না। সে ঘুমায় নাই। সে সজাগে খাজে খিযিরের দর্শন পাইয়াছে। আল্হামদু লিল্লাহ্। খোদা সত্য খবর দিবার জন্য খাজে খিযিরকে তার নিকট পাঠাইয়াছিলেন! শোকর আল্হামদু লিল্লাহ্। যায়েদা শোকরানার দুইটি সিজদা দিল।

অতি সকালে অন্ধকার থাকিতে যায়েদার ধাক্কায় ওয়াজেদের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

যায়েদা হাসিমুখে বলিল: ভাই ওয়াজেদ, শোকর আল্হামদু লিল্লাহ্, আমি সত্য কথা জানতে পারছি। তোমারই ভুল হইছে। বাপজান নির্দোষ।

তার চোখ-মুখে পুলক ফাটিয়া পড়িতেছে।

ওয়াজেদের মুখে অবিশ্বাসের ভাব। তবু সে প্রশ্ন করিল: আপনে কেমনে জান্লেন?

যায়েদা পরম উৎসাহে খাজে খিযিরের নাযিল হওয়ার কথা, তাঁর চেহারা, তাঁর পোশাক, তাঁর মুখের কথা সবিস্তারে ভাইকে বলিল এবং এই বলিয়া শেষ করিল: অখন বুঝলে, ওয়াজেদ? বাপজান কখনো মিছা কথা কইতে পারে না। তুমি শীঘ্‌গির উঠ। সকলের আগে গিয়া বাপজানের কাছে পাও ধইরা মাফ চাও। উঠ, ভাই, আর দেরি কইরো না।

ওয়াজেদ বি-এ ক্লাসের অনার্স দর্শনের ছাত্র। সে ও-সব কথায় বিশ্বাস করে না। কাজেই বোনের উৎসাহে সে মোটেই সাড়া দিল না।

আহা, বেচারা বুবু! কি সরল অটল বিশ্বাস তার! হোক না কুসংস্কার। তার এ সরল বিশ্বাসে কি ওয়াজেদ আঘাত করিতে পারে?

মুখ হইতে ধীরে ধীরে সে বোনের সারা অঙ্গে নজর ফিরাইল। আঠার বছরে বিধবা হইয়া এই বোন গত ছয় বছর কেবল ইবাদৎ-বন্দেগীতে জীবন কাটাইয়াছে। একসঙ্গে স্বামী-পুত্র হারাইয়া সেই যে সংসার ত্যাগ করিয়াছে, আর দুনিয়ার দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই। চব্বিশ বছর বয়সে চুল পাকাইয়া চল্লিশ বছরের বুড়ী সাজিয়াছে। সমস্ত বিলাসিতা বর্জন করিয়াছে। বাপের খেদমতই তার সারাদিনের একমাত্র কাজ। বাপের উপর অটল বিশ্বাসই সংসারে তার একমাত্র অবলম্বন। এ অবলম্বনে সে ভাই হইয়া কেমন করিয়া কুঠারাঘাত করিবে? পরন্তু যখন সে দেখিবে, ওয়াজেদ তার সে বিশ্বাসের মূলে কুঠার হানিয়াছে, সে তখন—

ওয়াজেদ আর ভাবিতে পারিল না।

সেই মুহূর্তে তার কানের কাছে সেই অদৃশ্য ব্যক্তির আওয়ায হইল: ওয়াজেদ, তুমি এই সব স্নেহ-মমতার মেয়েলী মনোভাবের কাছে কি তোমার কর্তব্যনিষ্ঠাকে যবেহ্ করিবে?

সে ধড়মড় করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

পরের দিন ওয়াজেদ বড় একটা ঘরের বাহির হইল না। বিছানায় শুইয়া শুইয়া কেবলি চিন্তা করিল।

যায়েদা ওয়াজেদের উপর রাগ করিয়াছে। সে ওয়াজেদের খোঁজ-খবর বড় একটা করিল না। মাকেও ওয়াজেদের বিরুদ্ধে কিছু বলিল না। বাবাকে ত নয়ই।

মার কাছে ওয়াজেদ বলিয়াছে, তার শরীরটা ভাল নয়। মা বুঝিয়াছেন, বাপের ধমক খাইয়া ছেলের মন খারাপ হইয়াছে। থাক না একদিন ঘরে শুইয়া। ওতেই মনটা হাল্কা হইবে। ঐ গম্ভীর-মুখে লজ্জায় বাইরে যাইতে

চায় না, সেটা ত ভালই। তিনিও ছেলেকে বিরক্ত করিলেন না। ওয়াজেদ বিছানায় শুইয়া শুইয়া দিন কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার পর ওয়াজেদ শুনিতে পাইল যায়েদার প্রাত্যহিক বাদ-মগরেব বৈঠক বসিয়াছে। ওয়াজেদ এই দরবারের কথা জানিত।

যায়েদা সকাল-বিকাল কোরআন শরীফ তেলাওৎ করে। কিন্তু ওয়াজেদ এটা জানিত না যে, আমির আলির সাথে বাবার মামলা লাগার পর হইতে তেলাওৎটা একটু বেশী করিয়া হইতেছে।

সকালে আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়িয়া যায়েদা যখন কোরআন তেলাওৎ করে, তখন সেটা একটা শুনিবার বস্তু। রেহালে কালামুল্লাহ্ রাখিয়া ঝুঁকিয়া-ঝুঁকিয়া যায়েদা যখন মিহিগলায় খোশ-ইল্‌হানে কালামুল্লাহ্ পড়ে, তখন দার্শনিক ওয়াজেদ পর্যন্ত কান পাতিয়া সে পড়া শুনে। ওয়াজেদ মার কাছে শুনিয়াছে বাবাও বিছানায় শুইয়া-শুইয়া কান পাতিয়া মেয়ের কোরআন পড়া শুনেন। সরকার সাহেবের যে দু-একদিন বিছানা ছাড়িতে একটু দেরি হইত, তা যায়েদার মিঠা গলার কোরআন শুনিতে শুনিতে।

কিন্তু বাদ-মগরেব যায়েদা যে কোরআন পাঠ করে, তা শুনিবার জন্য দস্তুরমত মজলিস বসে। এই মজলিসে মাঝে মাঝে পাড়ার অনেক মেয়েলোক জুটে বটে, কিন্তু ওয়াজেদ জানে চারটি বৃদ্ধা এই মজলিসের স্থায়ী মেম্বর। এই চারজন হইতেছে হানিফের মা, শরিফের দাদী, করিমের মা ও নওশেরের নানী। এরা ওয়াজেদের পিছন-বাড়ির কোর্ফা প্রজা। এদের কারো স্বামী, কারো পুত্র এককালে সরকার বাড়িতে চাকুরি করিত; কারো ছেলে নাতি আজো করে। এরা নিজেরা আজো সরকার বাড়ির ধানভানা, মসলা-পিষা প্রভৃতি ফুট-ফরমায়েশ করিয়া কিছু কিছু রোজগার করে এবং সরকার সাহেবের জমিতে বাড়ি করিয়া তার পালানে লাউ-কুমড়ার গাছ লাগাইয়া মুরগী ছাগল পালিয়া দিন গুজরান করে। খাজনা দিতে হয় না।

এদের সকলকেই বুড়া বলা যাইতে পারে। সকলেরই বয়স চল্লিশের উপর; কারো কারো পঞ্চাশও পার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ধর্ম-কথা

বেহেশ্‌ত-দুযখের বয়ান, নামায-রোযা, ফযিলতের কথা শুনিতে এরা খুব ভালবাসে।

যায়েদা মৌলবী নকীবুদ্দীন খাঁ সাহেবের বঙ্গানুবাদ কোরআন-শরীফ পড়িয়া এদের শুনায় এবং প্রয়োজনমত ব্যাখ্যা করিয়া দেয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে কাসাসুল আম্বিয়া, শহীদে-কারবালা, জঙ্গনামা পড়িয়া ইহাদিগকে মুগ্ধ করে।

এসব এদের এত ভাল লাগে যে, সন্ধ্যা হইলে সকল কাজ, গল্পগোজারি ও আমোদ-আহ্লাদ ফেলিয়া এরা যায়েদার ঘরের বারান্দায় জমায়েত হয়।

আজ সন্ধ্যায় এমনি বৈঠক বসিয়াছে। ওয়াজেদ কান পাতিয়া শুনিল যায়েদা কোরআন হইতে তওবার মরতবা এদেরে বুঝাইয়া দিতেছে। খানিকক্ষণ পরে ওয়াজেদ শুনিল যায়েদা কোনআন তেলাওৎ রাখিয়া শহীদে-কারবালা শুরু করিল। সুর করিয়া এযিদের যুলুমের বয়ান পড়া হইতে লাগিল। হঠাৎ মাঝখানে শরিফের দাদী বলিয়া উঠিল : কলিকালেও আমারার দেশে এক এযিদ পয়দা হৈছে। এই এযিদের নাম আমির আলি। সে শয়তানটা কিনা মামলা করতাছে অমন ফেরেশ্‌তার লাখান মানুষ আমরার সায়েবের লগে।

ওয়াজেদ কান পাতিয়া দম বন্ধ করিয়া এদের কথা শুনিতে লাগিল।

হানিফের মা বলিল : ভাল কথা বুবু, মামলার তারিখ না কবে?

যায়েদা : আগামী কালই ত তারিখ।

নওশেরের নানী : আমরা শুনছিলাম, আমির খাঁ নাকি অপরাধ স্বীকার কৈরা মাফ চাইব। সেটার কি হৈল? মাফ চাইছে?

যায়েদা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল : শুনছিলাম ত আমরাও। কিন্তু আজো স্বীকারও করছে না, মাফও চাইছে না। আল্লাহ্‌ লোকটারে হেদায়েত করুক।

শরিফের দাদী : যদি আমির খাঁ অপরাধ স্বীকার কইরা তওবা করে, তা অইলে তার গোনা মাফ হৈয়া যাব। না, মা?

যায়েদা : তা ত নিশ্চয়। অপরাধ স্বীকার কইরা তওবা করলে আল্লাহ্‌

নিশ্চয় মাফ দেন। কারণ তওবার দরজা আজো খোলা আছে। তবে বেশী দিন সে দরজা আর খোলা থাকবো না। কেয়ামত নযদিক হৈয়া আসতাছে কিনা।

করিমের মা: আমির খাঁ যদি মনে মনে আল্লার কাছে তওবা কইরা থাকে?

যায়েদা: উহু! সে রকম তওবা কবুল হৈব না। কারণ কোরআনে আল্লা-পাক কইয়া দিছে: 'যার অন্যায় করলা, আগে তার কাছে মাফ চাও, তারপর আমার কাছে তওবা কর, তা হৈলেই আমি মাফ করব, না হৈলে না।'

নওশেরের নানী: আমি মা অতশত বুঝি না। আল্লা খুব মেহেরবান ইটা মানি। কিন্তুক আমির আলির লাখান বদমায়েশকে আল্লাও মাফ করব না। অত বড় বদমায়েশ কি দুনিয়ায় আছে? দেশের মুরুব্বি গরিবের মা-বাপ যে মানুষটা, তার নাম জাল কৈরা তারে বিপদে ফালাইবার ফন্দি? না মা, অমন শয়তানের ওয়াস্তে মাফ নাই।

ওয়াজেদ অনুমান করিল এ কথায় যায়েদা নিশ্চয় খুশী হইয়াছে। কিন্তু সে যা বলিল, তা শুনিয়া ওয়াজেদ অবাক হইল। যায়েদা বলিল: আমার বেগোনা ফেরেশ্‌তা বাপের লাগি তোমরা দোওয়া কৈরো যাতে তাঁর জিত হয়। কিন্তু সেই সাথে তোমরা আমির মিঞার লাগিও দোওয়া কৈরো।

ওয়াজেদ শুনিল মজলিসের সব মেয়েরা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল: আমরা দোওয়া করমু আমির আলি শয়তানের লাগি?

যায়েদা বলিল: হাঁ, দোওয়া করবা তার হেদায়েতের লাগি। সে যেন কাল আদালতে খাড়া হৈয়া কয়: আমি সরকার সাহেবের নাম জাল কৈরা গোনা করছি, সরকার সাহেবের কাছে আমি মাফ চাই; আল্লাও আমারে মাফ করুক। গোনাগারের লাগি দোওয়া করা হরেক মুসলমানের উচিত, এটা হাদিসের কথা।

শরিফের দাদী: হাদিস-কোরআনের কথা যখন, তখন তা মানা লাগবই। কিন্তু মামলা শেষ হওয়ার আগে আমরা সে দোওয়া করমু না। কিসের মধ্যে কি হৈয়া যায়, কওয়া ত যায় না।

মজলিস ভাঙিল। কিন্তু ওয়াজেদের ধ্যান ভাঙিল না। এই অশিক্ষিত সরলবিশ্বাসী পরের মানুষ মেয়েরাও তার বাবার কত হিতৈষী। তাঁর কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে তারা কত হুঁশিয়ার। মামলার আগে দুশ্‌মনের জন্য দোওয়া করিতেও ভরসা পাইতেছে না।

আর সরকার সাহেবের পুত্র ওয়াজেদ?—সে আর ভাবিতে পারিল না।

একুশ

মামলার দিন।

সরকার সাহেব অতি সকালে উঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফজরের নামায পড়িয়া তেলাওৎ করিয়াছেন। বিবি সাহেব সকাল হইতেই রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন। যায়েদা আজ রান্নাঘরমুখে আসে নাই, ঘর হইতেই বাহির হয় নাই। আজ সে সারাদিনে দশপারা কালামুল্লাহ্‌ খতম করিয়া এই উদ্দেশ্যে বখশিয়া দিবে, সে কথা মাকে সে আগেই বলিয়া রাখিয়াছিল।

সরকার সাহেব সাক্ষীদের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়া সকাল সকাল গোসল-খাওয়া সারিয়া সাংসারিক কাজের উপদেশ দিয়া শহরে রওয়ানা হইলেন। যাইবার আগে চুপি চুপি বিবি সাহেবের কাছে খোঁজ লইয়া জানিলেন ওয়াজেদ তখনও বিছানা ছাড়ে নাই।

তবে কথাবার্তায় ফল হইয়াছে? তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিলেন এবং গাড়ি ছুটাইয়া দিলেন।

রাস্তায় পড়িয়া তিনি চারদিক নযর করিলেন। চারদিকই তাঁর কাছে আজ উজ্জল হাসিহাসি মনে হইল। আজ মোকদ্দমার দিন। এই দিনটিকে তিনি কতই না ভয় করিয়াছেন। আজ আর তাঁর মনে কোনো ভয় নাই। জয় তাঁর সুনিশ্চিত। তাঁর আপন ফরযন্দকে পর্যন্ত দুশ্‌মনরা হাত করিবার আয়োজন করিয়াছে এটা যখন তিনি বুঝিয়াছিলেন, তখন তাঁর জিদ বাড়িয়াছিল। হতভাগাদের শরম-হায়া বলিয়া কোনো জিনিস নাই। ন্যায়-অন্যায় বলিয়া কোনো বোধ নাই। এমন কাজও মানুষ করিতে পারে?

কিন্তু দাঁড়াও বাচাধনরা। ঘুঘু দেখিয়াছ ফাঁদ দেখ নাই। হাত করিতে আসিয়াছিলে ওসমান সরকারের ছেলেকে? বিভীষণ খাড়া করিবার চেষ্টা ওসমান সরকারের বাড়ীতে? এতবড় সাহস! ওদের থুতা মুখ একেবারে ভুতা করিয়া দিব। কি ভাবিয়াছে বেটারা?

তারপর ঈতুর সাক্ষ্য দিয়া সরকার সাহেবকে আটকাইবে? বাছাধনরা জানে না, কি হাতিয়ার তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। হাঃ হাঃ হাঃ!

সরকার সাহেবের তদবিরকাররা সবাই উৎসাহী কাজের লোক। সাক্ষী-সাবুদদের লইয়া তারা সরকার সাহেবের আগেই মোক্তারের বাড়ি পৌছিয়াছে।

সরকার সাহেব গিয়া দেখিলেন মোক্তারের বৈঠকখানা সরগরম। সব ঠিকঠাক। সকলে কেবল তাঁরই অপেক্ষা করিতেছে।

সরকার সাহেবকে পাশে লইয়া মোক্তার সাহেব বিরাট মিছিলের আগে আগে কোর্টে চলিলেন। মাঝে মাঝে তিনি রাস্তার দুই পাশে এবং পথিকদের মুখের পানে সগৌরবে তাকাইতে লাগিলেন। ভাবটা এই: দেখ আমি কতবড় মোক্তার। আমার পিছনে কত মওক্কেল!

হাকিম এখনও বসেন নাই। কাজেই মোক্তার সাহেব বটতলায় তাঁর মুহুরীর শেরেস্তায় গিয়া শানের মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিলেন; সরকার সাহেব কিছুদূরে তাঁর পাশে বসিলেন। আর সকলে চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সে ভিড়ের ফাঁক দিয়া সরকার সাহেব কি যেন তালাশ করিলেন। দেখিলেন, আরেক বটগাছের নীচে শরাফত মণ্ডল জনদুই লোক লইয়া বসিয়া আছেন।

সরকার সাহেব উঠিলেন। অন্যকাজে অন্যদিকে যাইতেছেন এই ভাব দেখাইয়া তিনি শরাফত মণ্ডলের কাছে গেলেন।

শরাফত মণ্ডল সত্যই বুনিয়াদী ঘরের শরিফ লোক। আদব-কায়দায় দুরস্ত। অমন বড় শত্রুর সাথেও হাসিয়া কথা বলিবার এবং ভদ্র ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ।

সরকার সাহেবকে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন। 'আস্-সালামু আলায়কুম' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

সরকার সাহেবের মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তিনিও পাক্কা ভদ্রলোক। মনের ভাব গোপন করিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। আসলে তিনি শরাফত মণ্ডলের সহিত কথা বলিয়া ওদিককার হালচাল জানিবার উদ্দেশ্যেই তাঁর কাছে আসিয়াছেন। সুতরাং খুব উৎসাহের সঙ্গে হাসিমুখেই তিনি মুসাফেহা করিলেন।

মুসাফেহা শেষ করিয়া মণ্ডল সাহেব সঙ্গের একটা লোককে কহিলেন: এই, ভাল কৈরা দুইটা পান বানাইয়া আন্‌ত। খুব ভাল কৈরা বেশী খয়ের দিয়া বানাইয়া দিতে কইবি। যর্দা আলাদা কৈরা আন্‌বি।

—বলিয়া তিনি আলোয়ানের নীচে পাঞ্জাবীর বুক পকেটে হাত দিয়া মুখপোড়া বিড়ির একটা আস্ত প্যাক বাহির করিলেন এবং প্যাক ছিঁড়িয়া একটা বিড়ি সরকার সাহেবের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

"না না, আজ আমার ব্যাপার; আপনে খাওয়াবেন কেন? আমারটা খান।"—বলিয়া সরকার সাহেব পকেট হইতে এক প্যাকেট 'বারেক আলি' সিগারেট বাহির করিলেন এবং প্যাকেটের মুখ আল্‌গা করিয়া দুইটা সিগারেটের গলা বাহির করিয়া মণ্ডল সাহেবের দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

'আচ্ছা, তবে আপনেরটাই খাওয়া যাক' বলিয়া মণ্ডল সাহেব বাম হাতে বিড়ির প্যাক বুক পকেটে ভরিতে ভরিতে ডান হাতে সরকার সাহেবের আগাইয়া-দেওয়া সিগারেটটা টানিয়া নিলেন।

সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে সরকার সাহেব বলিলেন: খুব যে লাগ্‌ছেন আমার পাছে। আমি আপনার কি অন্যায়টা করছি কন্ ত?

শরাফত মণ্ডল হাসিয়া বলিলেন: আপনে হৈলেন গজ-কপালিয়া মানুষ। আপনের বিরুদ্ধে কি আমি লাগবার পারি? বেচারা ধরছে গিয়া, তাই লোক-দেখান গোছের আসলাম। যান, খাতিরজমা থাকুন গিয়া, কিছু হৈব না।

সরকার সাহেবের উদ্দেশ্য সফল হইয়া গিয়াছে। তিনি যা জানিতে

চাহিয়াছিলেন, যে মতলবে দুইপয়সা দামের একটা সিগারেট নষ্ট করিলেন, সে মতলব তাঁর হাসিল হইয়াছে।

তিনি 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলিয়া অন্যদিকে চলিলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন : বেটা বজ্জাতের ধাড়ি। দুনিয়া সাফ দিয়াও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করিতে না পারিয়া এখন কি ভাল মানুষটি সাজিয়াছে! যেন আমার কতই বড় খায়েরখাহ্। 'যান, খাতিরজমা থাকুন, কিছু হৈব না'। আহা, কি মিঠা ভরসা! যেন তিনিই চেষ্টা করিয়া আমার বিপক্ষের সমস্ত সাক্ষী ভাগাইয়া দিয়াছেন।

সরকার সাহেবকে বিদায় দিয়া শরাফত মণ্ডল মুচ্‌কি হাসিলেন। ভাবিলেন : বেটা কি চতুর! সিগারেট খাওয়াইয়া বাধ্য করিতে আসিয়াছে আমি শরাফত মণ্ডলকে! তোমার মত চতুর লোক আমার—হেঃ হেঃ হেঃ। সিগারেটের সিগারেট খাইলাম। দিয়াও দিলাম এক ধাপ্পা। আমার চালের তুমি বুঝিবা কি বাছাধন? মামলার তুমি বুঝ কি? শুধু একপাল সাক্ষী লইয়া আসিলেই হয় না। বানিয়ার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা। এক সাক্ষী দিয়া তোমার এককুড়ি সাক্ষী ঘায়েল করিয়া দিব, দেখিয়া লইও। হাঁ, তবে মুখে ভাব রাখিতে দোষ কি? বলা ত যায় না। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার। তাছাড়া এটা দায়রায় যাইবেই। দায়রার বিচার বাবা। যার টাকা আছে সে জিতিবেই। কাজেই আগে থাকিতে ওসমানের সাথে ভাব রাখাই ভাল। কি জানি কি হয়!

যথাসময়ে মামলার ডাক পড়িল। যে যেখানে ছিল, দৌড়াদৌড়ি করিয়া হাকিমের এজলাসের দিকে আসিল। দুই বড় লোকের মধ্যে মামলা। বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সরকার সাহেব শুনিয়াছিলেন এস-ডি-ও সাহেব নিজের ফাইলে মামলা রাখিয়াছেন। সরকার সাহেবের নিজের মামলা। সে মামলার বিচার কি এস-ডি-ও ছাড়া আর কেউ করিতে পারে? কিন্তু মামলার ডাক পড়িল একজন সাধারণ ডেপুটির ঘর হইতে। সরকার সাহেবের মনটা খারাপ হইয়া গেল। ছোট হাকিমরা তাঁর মামলার কি বিচার করিবেন? তবু সেই এজলাসের দিকেই তিনি গেলেন। এজলাস লোকে লোকারণ্য।

আমির আলি খাঁকে কাঠগড়ায় আনিয়া দাঁড় করান হইল। সে শহরের মোটামুটি পরিচিত লোক। দর্শকদের অনেকেই তাকে চিনিত। এই একমাসে তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অনেক বেশী বয়সের দেখা যাইতেছে। বেশীর ভাগ চুল পাকিয়া গিয়াছে। চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে। গাল ভাঙিয়া গিয়াছে।

লজ্জায় আমির আলি খাঁ কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়াছিল। এইবার সে প্রথমে হাকিমের দিকে, পরে এজলাসে সমবেত উকিল মোক্তার ও জনতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। তার চোখ ছলছল করিতেছে।

চেহারা দেখিয়া কেহ মনে করিল, আমির মিঞা নিশ্চয় দোষী। দোষী না হইলে অমন ভাঙিয়া পড়ে? চোখে-মুখে স্পষ্ট পাপের ছাপ।

আবার কেহ মনে করিল, বেচারা সম্পূর্ণ নির্দোষ; তা না হইলে অমন এলাইয়া পড়ে? জালিয়াতেরা কি অমন এলাইয়া পড়িতে পারে? আহা! বেচারা কলেজে-পড়া ভদ্রলোক! ফৌজদারী মামলার আসামী হইয়া কাঠগড়ায় উঠিয়া যেন একেবারে শাকের মত মিলাইয়া গিয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী হিসাবে ডাক পড়িল স্বয়ং ওসমান আলি চৌধুরির। তিনি বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। তাঁর মন এখন তুফানের পরের সকাল বেলার মতই শান্ত। তিনি এখন শান্তভাবে অকম্পিত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। তিনি সাফ দিলে বিবেকের সঙ্গেই বলিতে পারিবেন, আমির আলির জামিননামায় তিনি দস্তখত দেন নাই।

। এমনসময় আজরাইলের কণ্ঠস্বরের মতই চাপরাশীর গলার আওয়ায তাঁর কানে আঘাত করিল: ওসমান আলি চৌধুরি হাযির।

ওসমান সরকার হাতের লাঠিটা পাশে-দাঁড়ানো চাকরের হাতে দিয়া ত্রস্তভাবে এজলাসে প্রবেশ করিলেন। চাপরাশী পথ দেখাইয়া তাঁকে কাঠগড়ার দিকে লইয়া যাইতে লাগিল।

সরকার সাহেবের বুক এবার ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। এমন অস্থিরতা ত তিনি ইতিপূর্বে একদিনও বোধ করেন নাই! তাঁর হাটুতে

তিনি ত জোর পাইতেছেন না। কে যেন পিছন হইতে তাঁর কানের কাছে বলিতেছে ঃ ওসমান সরকার, এখনও ফিরো। ধর্মের ঘরে দাঁড়াইয়া মিছা কথা বলিও না। কিন্তু আরেকটা আওয়াযে আগের আওয়ায চাপা পড়িয়া গেল। এ আওয়ায বলিল ঃ তুমি কি রহমত খাঁর খরিদা জমি আত্মসাৎ করিয়াছ? তুমি কি বিধবা ফুফুর আমানতী টাকা মারিয়াছ? তোমার নামে এই সব জঘন্য মিথ্যা কুৎসা কে রটনা করিয়াছে? ঐ শয়তান আমির আলি। এই মিথ্যা অপবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে না? তুমি ত কাউকে আগে আক্রমণ কর নাই।

তাঁর মন পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি মাথা উঁচু করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং দৃঢ় পদক্ষেপে কাঠগড়ায় উঠিলেন। কোনো দিকে না চাহিয়াই আগে তিনি হাকিমের উদ্দেশে মাথা ঝুঁকাইয়া এমন সুন্দর ভঙ্গিতে একটা মোগলাই কুর্নিশ করিলেন যে, হাকিম শুদ্ধ এজলাসের সকলে মনে মনে তাঁর তারিফ করিলেন। হাঁ, ভদ্রলোক বটে!

হাসিহাসি মুখে তিনি চারদিক নযর করিলেন। প্রথমেই নযর পড়িল আসামীর কাঠগড়ায় আমির আলির দিকে। অনেকদিন পরে তিনি তাকে দেখিলেন। চেহারাটা আস্ত পাপিষ্ঠের চেহারাই হইয়াছে। হইবে না? অত পাপ, ভদ্রলোকের নামে এত কুৎসা আল্লাহ্ সহ্য করিবেন? দাঁড়াও বাচাধন, আরো মজা চাখিবে।

'পেশকার বাবু সাক্ষীকে হলফ্ দিন।'—লালসালু-ঘেরা মঞ্চ হইতে আদেশ আসিল। সরকার সাহেব হাকিমকে এইবার ভাল করিয়া দেখিলেন। হাকিমটি তাঁর অচেনা নন। বয়স অল্প, গঠন ছোট। এ চেহারা হাকিমকে মানায় না। তাছাড়া লোকটা ধর্মে বিশ্বাসী নন বলিয়া সরকার সাহেব অনেকবার শুনিয়াছেন। হুম্, ইনিই করিবেন আবার বিচার? বিচারের ইনি বুঝেন কি? এই ধরণের লোকের সামনে আবার হক-নাহক ভাবিয়া কথা বলিতে হইবে? ভারী আমার পীর সাহেব আর কি!

হাকিমের হুকুমে পেশকার দাঁড়াইয়া সরকার সাহেবকে বলিলেন ঃ বলুন, আমি ধর্মতঃ হলফ করিয়া বলিতেছি......

সরকার সাহেব পেশকারের সাথে সাথে তাঁর কথা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু মনে মনে বলিলেন : কি ধর্মের অবতার এক-এক জন! এরাই আবার ওয়াদা করান ধর্মের নামে। হেঃ! হাকিম-পেশকাররাই যদি ধর্ম লইয়া হাসি-তামাসা করিতে পারেন, তবে মামলার পক্ষরা, সাক্ষী-সাবুদরা করিবে না কেন?

আদালতকে তিনি এতদিন যেরকম একটা গম্ভীর ধর্মের ঘর মনে করিয়া আসিতেছিলেন, সে শ্রদ্ধা ও ভীতি আর তাঁর মনে থাকিল না। তাঁর মনে পড়িল তিনি নিজে ইউনিয়ন কোর্ট-বেঞ্চে বসিয়া কত মামলার বিচার করিয়াছেন। এটা তার চেয়ে বড় বা পবিত্র কিসে?

তাঁর মনে সাহস বাড়িল। তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। বরঞ্চ একটা তাচ্ছিল্যের ভাব তাঁর মনে আসিল। তাঁর মোক্তারের প্রশ্নের জবাবে তিনি অতঃপর যে জবানবন্দি করিলেন, নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করার মতই সহজে তিনি তা বলিয়া গেলেন। তিনি যা বলিলেন তার সারমর্ম এই : নসিরাবাদ ব্যাংকের ম্যানেজারের এক পত্রে তিনি সর্ব-প্রথম জানিতে পারেন (পত্র দেখিয়া—হাঁ এই পত্র) যে, তিনি আসামী আমির আলির দুই হাজার টাকার যামিন হইয়াছেন। হাঁ, ওয়াশিল দিয়া তামাদি রক্ষার জন্যই ঐ পত্র লেখা হইয়াছিল। ঐ পত্র পড়িয়া তিনি অবাক হন। আসামীর নিকট হইতে ব্যাপার কি জানিতে চান। আসামী জোরের সঙ্গে প্রকাশ করে যে, সরকার সাহেব সমিরের রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া নিজহাতে ঐ যামিননামায় দস্তখত করিয়াছিলেন। আসামীর এই ডাহা মিথ্যা কথায় সরকার সাহেব স্তম্ভিত হন। এমন মিথ্যা যে মানুষ বলিতে পারে, এর আগে সরকার সাহেব তা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। না, সমিরের রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া ঐ দলিলে বা আসামীর জন্য কোনোপ্রকার দলিলে তিনি কদাচ সহি করেন নাই। ঐ দলিল জাল। তাই তিনি এই মামলা দায়ের করিয়াছেন।

ফরিয়াদী পক্ষের মোক্তার বসিয়া পড়িলেন। আসামী পক্ষ হইতে সিরাজ মোক্তার সরকার সাহেবকে জেরা করিবার জন্য দাঁড়াইলেন।

সরকার সাহেব তাঁর জবানবন্দি এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে বলিয়াছিলেন যে, হাকিম শুদ্ধ এজলাসের সমস্ত লোকই তাতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং জেরা করিয়া বিশেষ কোনো ফল হইবে না, এ ধারণা সকলেরই হইয়া গিয়াছিল। সিরাজ মোক্তারও তা বুঝিতে পারিতেছিলেন। কাজেই ধমকাইয়া কিছু বাহির করা যায় কিনা, সেই আশায় তিনি শুরু হইতেই গলার সুর চড়াইয়া সরকার সাহেবকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

সিরাজ মোক্তার যামিননামাটি মোকদ্দমার ফাইল হইতে বাহির করিয়া সরকার সাহেবের সামনে ধরিলেন। বলিলেন: একবার এই দস্তখতটার দিকে চাইয়া দেখুন ত, এটা আপনার দস্তখত কিনা।

সরকার সাহেব আড়চোখে দলিলটি দেখিয়া লইলেন। তাঁর নিজের দস্তখতটা সেখানে বড়বড় চোখে তাঁর দিকে চাহিয়া আছে। সেটা যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে: আমি তোমারই, আমি তোমারই।

সরকার সাহেব আর সেদিকে চাহিতে পারিলেন না। তিনি আসামীর মোক্তারের মুখের দিকে চাহিলেন। কতদিনের দুশ্‌মনি এই লোকটার সঙ্গে! কত ইলেকশনে তাঁকে হারাইয়াছেন! সরকার সাহেবের সম্বন্ধী হইয়াও লোকটা বরাবর শত্রুপক্ষকে সমর্থন করিয়াছে। সরকার সাহেবের পদ-মর্যাদা কাড়িয়া নিবার চেষ্টা করিয়াছে। আজ বুড়াবয়সে লোকটা কিনা আসিয়াছে তাঁরই দুশ্‌মনের মোক্তারি করিতে! আজ বাদে কাল কবরে যাইবে, তবু কয়টা টাকার লোভ সামলাইতে পারে নাই। কি ছোট লোক!

সরকার সাহেবের রাগ হইল। তিনি মোক্তারের চড়া গলার সমান গলা চড়াইয়া জবাব দিলেন: ওটা আর দেখমু কি? আগেই ত কইছি, ও দস্তখত আমি করছি না।

মোক্তার সাহেব তখন প্রশ্ন ঘুরাইয়া বলিলেন: আচ্ছা, বলুন ত এ দস্তখতটা আপনার দস্তখতের মত দেখা যায় কি না?

সরকার সাহেব মৃদু হাসিলেন। এ দস্তখত সত্যই তাঁর এখনকার দস্তখতের মত দেখা যায় না। এই ছয় বছরে তাঁর হাতের লেখার অনেক

পরিবর্তন হইয়াছে। তাছাড়া আগে তিনি 'ওসমান আলি সরকার' দস্তখত করিতেন। এখন করেন শুধু 'মোহাম্মদ ওসমান আলি'। সুতরাং তিনি স্বচ্ছন্দে বলিলেন : জি না, এ দস্তখত আমার দস্তখতের মত দেখা যায় না।

সিরাজ মোক্তার তখন আরেকটা দস্তখতের দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন : দেখুন ত এ দস্তখতটা চিনেন কি না?

সরকার সাহেবকে তখন মিথ্যার নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। তিনি স্বচ্ছন্দে বলিলেন : না।

"আপনি ওমর বেপারীরে চিন্‌তেন?"

"খুব।"

"তিনি আর আপনে একসাথে বইসা এই দস্তখত করছেন; আপনে যামিন হৈছেন, ওমর বেপারী সাক্ষী হৈছেন; এটা ঠিক কি না?

"কোথায় বইসা?"

"সমিরের রেষ্টুরেণ্টে।"

"সমিরের রেষ্টুরেণ্টে বইসা আমি ও ওমর বেপারী কষ্মিনকালেও কোনো দলিলে দস্তখত দেই নাই।

লোকটার অকম্পিত সহজ গলায় ডাহা মিথ্যা কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া সিরাজ মোক্তারের মেযাজ গরম হইয়া গেল। তিনি অতঃপর সরকার সাহেবের চরিত্রে ও সত্যবাদিতায় ছায়াপাত করিবার উদ্দেশ্যে রহমত খাঁ ও বিধবা ফুফুর ব্যাপার সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কয়েকটির উত্তর সরকার সাহেব ধীরভাবে দিলেন। বাকিগুলি অবান্তর বলিয়া হাকিমই অগ্রাহ্য করিলেন।

হাকিমের পক্ষপাতিত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া সিরাজ মোক্তার অবশেষে বলিলেন : যান, আপনের হৈয়া গেছে।

শ্রোতৃমণ্ডলীর বিপুল করতালির মধ্যে বক্তারা যেমন করিয়া বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে অবতরণ করেন, সরকার সাহেব তেমনি করিয়া কাঠগড়া হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁর মোক্তার সাহেব দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া তাঁকে নিজের পাশে মোক্তারদের বেঞ্চে বসাইলেন।

তারপর আরও দু-তিন জন সাক্ষীর জবানবন্দি হইল। তাদের কেউ কেউ বলিল: সরকার সাহেবের সঙ্গে আমির খাঁর বহুদিন হইতে ভাব ভাল নয়; ইউনিয়নবোর্ড ও স্কুল-মাদ্রাসা লইয়া দলাদলি আছে। আর কেউ বলিল: নসিরাবাদ ব্যাংকের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থা করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিতে তারা আমির আলি মিঞাকে অনুরোধ করিয়াছিল। সরকার সাহেব মামলা দায়ের না করিয়া আপস করিতে রাযী ছিলেন।

অনাবশ্যক বলিয়া আর সাক্ষী গুজরান হইল না।

সাফাই সাক্ষী দিবেন কিনা, হাকিম আসামী পক্ষের মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আসামী পক্ষের মোক্তার বলিলেন: হাঁ হুজুর, আমি আজই প্রস্তুত আছি।

হাকিম খুশী হইয়া বলিলেন: আজই দিতে চান? বেশ, হাযিরা দাখিল করুন।

সাক্ষীর হাযিরা লেখা হইয়া মোক্তারের নথির মধ্যেই ছিল। তিনি হাকিমের সামনে উহা পেশ করিলেন।

'বহুৎ আচ্ছা, নামাযের পরে সাফাই সাক্ষী লওয়া হইবে'—বলিয়া হাকিম উঠিয়া গেলেন। কোর্ট নামাযের জন্য আধঘণ্টা ছুটি হইল।

বাইশ

সরকার সাহেব সাক্ষীদের চা-নাশতা ও বিড়ি-সিগারেটের বন্দোবস্ত করিয়া নামায পড়িবার জন্য মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলেন। তাঁর কানের কাছে কে যেন চুপেচুপে বলিতেছিল: তুমি আল্লার ঘরের দিকে আল্লার মোখাতেব হইবার জন্য যাইতেছ। অথচ তুমি এইমাত্র আদালতে দাঁড়াইয়া অতবড় মিছা কথাটা বলিয়া আসিলে। আল্লার কাছে কিরূপে মুখ দেখাইবে? তোমার নামায কি আর কবুল হইবে?

কিন্তু ঐ ক্ষীণ আওয়ায ডুবাইয়া দিয়া বজ্রকণ্ঠে আরেকজন যেন বলিল: রহমত খাঁর নাবালকদের কি তুমি ঠকাইয়াছিলে? বিধবা ফুফুর আমানতী টাকা কি তুমি তসরুপ করিয়াছিলে? এত বড় মিথ্যা যে রচনা করিতে

পারে, তার কি অধিকার আছে আল্লার দরবারে সরকার সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার ?

সরকার সাহেব ত ইচ্ছা করিয়া মিছা কথা বলেন নাই ; এইসব বদমায়েশের অন্যায় আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই ত তিনি পাল্টা আক্রমণ করিয়াছেন। পাল্টা আক্রমণ না করিলে লড়াইএ জিতা যায় না যে। সরকার সাহেব আর কি করিতে পারিতেন ?

তিনি খুশী হইয়া মস্‌জিদের দিকে অগ্রসর হইলেন। লোকালবোর্ড আফিসের সামনে আসিয়া তিনি হঠাৎ সামনে ওয়াজেদকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ওয়াজেদও বাবাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ কেউই কথা বলিতে পারিলেন না। সরকার সাহেবই আগে কথা বলিলেন : তুমি এখানে কি করতে আস্‌ছ ?

ওয়াজেদও এতক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল। সে বলিল : আপনে ত জানেন, বাপজান।

সরকার সাহেব ছেলের কাঁধ ধরিয়া একরূপ টানিয়া তাকে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড আফিসের দিকে একটু নিরালা জায়গায় লইয়া গেলেন। বলিলেন : তুমি না আসলেই কি পারতা না ?

ওয়াজেদ : না বাপজান, আমি বিবেকের তাড়নায় ঘরে বইসা থাকবার পারলাম না। অনেক চেষ্টা করছি।

সরকার সাহেব মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন : আরে আমার বিবেকওয়ালা ! বুড়া বাপকে দুনিয়ার সামনে বেইয্‌যৎ করবার এই শয়তানী বুদ্ধিরে তুই বিবেক কইতাছস্‌ ? বেহায়া, বেশরম, নেমকহারাম। যা যা, কাঠগড়ায় খাড়া হৈয়া খুব জোরে চিল্লাইয়া নিজের বাপকে শয়তান সাব্যস্ত কর গিয়া। বাপ-মা লোকের সামনে অপমানের জ্বালায় জ্বইলা মরুক, তাতে তোর কি ? যা যা, শীগ্‌গির যা।

—বলিয়া তিনি উত্তেজিত অবস্থায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মসজিদের দিকে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতেও তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁর পুত্র ওয়াজেদ ফৌজদারী কোর্টের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

তাঁর কান্না আসিল। তিনি বলিলেন: আয় খোদা, বেইমান নিমকহারাম ফরযন্দের হাত থাইকা বাঁচাও বুড়া বাপেরে।

মসজিদে গিয়া তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া ওযু করিলেন। বারবার চোখে আঁসু আসিতে লাগিল। বারবার তিনি পানি ছিটাইয়া চোখ ধুইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং মসজিদের ভিতরে এক কোণে গিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। জমাতে তখন ফরয নামায হইতেছিল। তিনি ফরয শেষ করিয়া সুন্নত ও নফল পড়িয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন তখনও পনর মিনিট সময় আছে। তিনি তেলাওতে বসিলেন।

তেলাওৎটা চলিল আঙুলের গিরোতে যন্ত্রের মত। মনটা তাঁর চলিল চিন্তা করিয়া। এতবড় পরাজয় তাঁর জীবনে আর হয় নাই। নিজের ফরযন্দ দুশমনের খিমায়! তিনি মনে মনে বলিলেন: হা খোদা, এমন কুপুত্র আমারে কেন দিয়াছিলে? বড় ছেলেকে তুমি তুলিয়া নিয়াছ। এ ছেলেকে তুমি চোখে দেখ নাই? তবে কি আমারে সাতাইবার লাগি এই ছেলেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ? কি গোনাহ্ করিয়াছি আমি তোমার কাছে? তা কি মাফ হয় না? সে গোনার কি এই শাস্তি? নিজের ছেলেকে দিয়া কানমলা? খোদা, এখনও মাফ কর, ছেলেকে ফিরাও।

সরকার সাহেব সিজদা করিলেন এবং অনেকক্ষণ সিজদায় থাকিলেন। সিজদায় গিয়াও তিনি কল্পনায় দেখিতে লাগিলেন, ওয়াজেদকে পাইয়া দুশমনেরা কত খুশী হইয়াছে, তারা নিজেদের মধ্যে কত হাসাহাসি করিতেছে।

না, ও হতভাগা সরকার সাহেবের ছেলেই নয়। সে আজ হইতে তাঁর ত্যাজ্যপুত্র। তিনি সিজদা হইতে মাথা উঠাইলেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

তিনি উঠিলেন। দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইলেন। না, এ মামলায় তাঁকে জিতিতেই হইবে। দুর্বল হইলে চলিবে না। নিজের ছেলে বিপক্ষে গিয়াছে, তাতে কি হইয়াছে? সারা দুনিয়া বিরুদ্ধে গেলেও তিনি

ভয় পাইবেন না। কারণ এটা সরকার সাহেবের মরা-বাঁচার প্রশ্ন। একমাত্র পুত্রকে বাপের কোল হইতে ভাগাইয়া নেওয়ার যে কি শাস্তি, সেটা শয়তানদেরে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এটা সরকার সাহেবের প্রতিজ্ঞা।

সরকার সাহেবের হাত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি দ্রুতপদে কোর্টের দিকে চলিলেন। তাঁকে জিতিতেই হইবে। খোদার ফযলে তিনি জিতিবেনই। শয়তানেরা ঈহুকে এক নম্বর সাফাই সাক্ষী করিয়াছে। দাঁড়াও বাছাধনরা, মজা টের পাইবে।

তিনি পকেটে হাত দিয়া সেই কাগযটি অনুভব করিলেন।

কোন্ কোর্টে মামলা হইতেছিল, ওয়াজেদ তা জানিত না। এক এক করিয়া সে অনেক এজলাসেই ঢুকিল। কিন্তু সব এজলাসই তখন খালি। কোনো-কোনোটাতে পেশকারদেরে বসা দেখিল। তাঁরা বসিয়া বসিয়া কি লিখিতেছেন এবং চাপরাশীরা কিসে ষ্ট্যাম্প মারিতেছে। তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ওয়াজেদ জানিল, আধঘন্টা পরে আবার কোর্ট বসিবে।

ওয়াজেদ কাছারির সময়ে কোর্টে খুব কমই আসিয়াছে। তাই বহু-পরিচিত জায়গাটাই আজ তার কাছে নূতন ঠেকিল। সে লোকজনের ভিড় দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেক চেনা লোকও সে দেখিল বটে, কিন্তু কারো সামনে সে পড়িল না।

বেড়াইতে বেড়াইতে এক জায়গায় চার পাঁচ জন লোককে আলাপ করিতে দেখিল। হঠাৎ তার বাবার নাম শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। শুনিল একজন তার বাবার চৌদ্দপুরুষ তুলিয়া গাল দিতেছে, অপরেরা সায় দিতেছে। ওর চৌদ্দ পুরুষ ছোট লোক, ওর বাপ-দাদারা পরের বাড়িতে গোলামি করিয়া খাইত, ইত্যাদি কথায় তারা সকলে একমত হইতেছে। ফড়িংএর পাখ গজাইলে যা হয়, ছোট লোকের টাকা হইলে তাই হয়। ওসমান সরকারেরও তাই হইয়াছে।

আড়চক্ষে দেখিয়া ওয়াজেদ ঐ ভিড়ের দুইজনকে চিনিল—শরাফত মণ্ডল ও আমির আলি খাঁ। তাঁরাই তার বাপের বাপ-দাদাকে ঐ অকথ্য গাল দিতেছেন।

ওয়াজেদের গা ঘিন্‌ঘিন্ করিতে লাগিল। সে নিজেকে গোপন করিয়া সেখান হইতে অন্যদিকে চলিল। যাকে বাঁচাইবার জন্য ওয়াজেদ নিজের বাপকে বিসর্জন দিতে যাইতেছে, সেই লোকটাই তার বাপকে নয়, তার খান্দানকে গাল দিতেছে! অপরাধ করিয়াছেন তার বাপ একা। অথচ এই সব লোক গাল দিতেছে তার দাদা পরদাদাকে। ওয়াজেদের কাছে তার বংশ-মর্যাদার কি কোনো দাম নাই? তার বেগোনাহ্ মুরুব্বিদের কি কোনো ইয্‌যত নাই ওয়াজেদের কাছে? যে সব লোক তার মরহুম মুরুব্বিদের অন্যায় নিন্দা করিতেছে, তাদের সমর্থনে ওয়াজেদ যাইবে নিজের বাপের বিরুদ্ধে? এটা হইতেই পারে না।

এতক্ষণে ওয়াজেদ বুঝিল, এ দুনিয়ায় একা ভাল বা মন্দ হওয়া সম্ভব নয়। আল্লার বিচারে মানুষ যার-তার কাজের ফলভোগ করিলে করিতেও পারে, কিন্তু মানুষের বিচারে বংশের একজনের কর্মফল সবাইকে ভোগ করিতে হয়। দাদা-পরদাদা লইয়াই বাপ-বেটা, আর বাপ-বেটা লইয়াই দাদা-পরদাদা। কেউ কাকেও ছাড়াইতে পারে না। এ অবস্থায় ওয়াজেদ কি করিবে? তাই বলিয়া যা সত্য, যা হক, তা কি সে বর্জন করিবে?

সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ "কি ছোট মিঞা কবে বাড়ি আসিলেন?" প্রশ্নে ওয়াজেদের চমক ভাঙিল। দেখিল, পাড়ার তিনচার জন দল বাঁধিয়া তারই দিকে আসিতেছে।

এরা সবাই সরকার সাহেবের পক্ষের লোক। কেউ সাক্ষ্য দিতে, কেউ তদবির করিতে, আর কেউ তামাশা দেখিতে আসিয়াছে।

ওয়াজেদ যে বাড়ি আসিয়াছে, একথা কেউ জানিত না। কাজেই তাদের মধ্যে একজন বলিল: সোজা ঢাকা থাইকা আসলেন বুঝি? কোন্ গাড়িতে নামলেন? কেউ বলিল: মামলার অবস্থা খুব ভাল, কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা জিইতা গেছি সেটা ধইরা নেন। কেউ বলিল: আমি বাজি ধরছিলাম না যে, ছোট মিঞা নিশ্চয় আইসা পড়বে? বাপের মাথায় এত বড় তুফান, কোন্ ছেলে নিশ্চিন্তে বইসা পড়াশোনা করতে পারে?

ওয়াজেদকে শুভ সংবাদ দিয়া খুশী করাই বড় কথা। ওয়াজেদ কোন্ গাড়িতে কখন আসিয়াছে, এটা বড় কথা নয়। কাজেই ওয়াজেদের জবাবের জন্য অপেক্ষা করা কেউ দরকার বোধ করিল না। সে যেজন্য ঢাকা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে সে বিষয়ে শুভ সংবাদ দিয়া তার চিন্তা দূর করাই তারা দরকার মনে করিল। তারা সকলেই মিলিয়া তাই করিল।

তারপর তাদের দল যেখানে 'ক্যাম্প' করিয়াছে, সেখানে ওয়াজেদকে লইয়া যাইতে চাহিল। ওয়াজেদ আপত্তি করিল। বলিল: না, ওদিক আমি আর যামু না।

"তবে বুঝি সরকার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার চান? এইদিকে চলেন, তানার কাছেই লৈয়া যাই। তানি ঐখানে আছেন।" একজন মসজিদের দিকে পথ দেখাইয়া রওয়ানা হইল।

ওয়াজেদ ভয় পাইল। বিষম ভাবনায় পড়িল। তাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? বাপের সাথেও দেখা করিতে যাইবে না, নিজেদের ক্যাম্পেও যাইবে না, তবে যাইবে কোথায়? কি কৈফিয়ৎ সে দিবে?

তাড়াতাড়ি মুখে যা আসিল, তাই বলিয়া ফেলিল: মামলার যা শোন্‌বার আপনেরার কাছেই ত শোনলাম। যাই এবার বাড়িতে। ক্ষিধাও লাগছে, আর মাকেও গিয়া খবরটা দেই।

সকলেই কথাটা পসন্দ করিল। কাজেই তারা ওয়াজেদকে ছাড়িয়া দিল। ওয়াজেদও যেন বাড়ির দিকেই চলিল এই ভাব দেখাইয়া পশ্চিম দিকে রওয়ানা হইল।

কিন্তু লোকাল বোর্ডের দিকে গেলে বাবার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইতে পারে ভাবিয়া সে পোষ্টাফিস বাঁয়ে ফেলিয়া জজকোর্টের দিকে রওয়ানা হইল। জজকোর্টের সামনে আসিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। এবার আর বাপের সামনে পড়িবার আশঙ্কা নাই। ফৌজদারী কোর্টে দুইপক্ষের যারা আসিয়াছে তাদের কারো সাথেও দেখা হইবার ভয় নাই।

কিন্তু সে এখন কি করিবে? ভাবিতে ভাবিতে সে জজকোর্টের সামনে

দিয়া বিজলি-বাতি ঘরের কাছে আসিয়া পড়িল। বাম দিকে ফিরিয়া মুন্সিফ কোর্টের সামনে দিয়া সে পুরাণ জিলা স্কুলের সামনে আসিয়া পৌঁছিল। সামনে মুক্তাগাছার রাস্তা, এই রাস্তাই বাড়ি যাওয়ার পথ। সে কি বাড়ি ফিরিয়া যাইবে?

তবে কি সে আর সাক্ষ্য দিবে না? সত্যের পথ হইতে সে পলাইয়া যাইবে? অথচ কার জন্য ঐ সত্য? যারা তার খান্দান তুলিয়া গালাগাল করে, সেইসব নীচমনা লোকের জন্য? সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিজের অজ্ঞাতে সে পুরাণ জিলাস্কুলের কুশাদা বারান্দার রোয়াকে বসিয়া পড়িল।

সারা দিনটাই ছিল মেঘলা-মেঘলা। সুরুজ দেখা যায় নাই। মাঘের প্রবল শীত তাতে বাড়িয়া গিয়াছে। তার উপর ব্রহ্মপুত্র নদীর ভিজা উত্তরে বাতাস কনকনে শীতকে একেবারে হাড়ভাঙ্গা শীতে পরিণত করিয়াছে।

ওয়াজেদের এতক্ষণে মনে পড়িল, তাড়াতাড়িতে ভুলে অথবা মাকে ফাঁকি দিবার মতলবে সে গরম কোট গায়ে দিয়া বাহির হয় নাই। সে পুকুরের পাড়ে এবং রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে মাত্র চারগণ্ডা পয়সা দিয়া মুক্তাগাছার একটা ফেরতা-গাড়িতে চাপিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কোট গায়ে দিলে মা নিশ্চয় পুছ করিতেন, এই দুপুরবেলা গরম জামা গায়ে দিয়া সে কোথায় যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ওয়াজেদ এতক্ষণ রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। বৃষ্টির চোটে পা তুলিয়া বারান্দায় উঠিয়া গেল। ছিটা পানি এড়াইবার জন্য সে বারান্দার শেষ প্রান্তে একেবারে দেওয়াল ঘেঁষিয়া গিয়া বসিল।

বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল, সত্যের পথ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াও যেমন কঠিন, আবার তার খান্দানের নিন্দুকদের পক্ষে আজই কাঠগড়ায় উঠাও তেমনি কঠিন। কাজেই আরও কিছুদিন ভাবা দরকার। এটা ত মাত্র নিম্নআদালতের বিচার। এই চার্জের মামলা

দায়রায় যাইবেই। তবে সে দায়রাতেই গিয়া সাক্ষ্য দিবে। আজ থাক। সুতরাং আজ আর এখানে বসিয়া থাকার দরকার নাই। ভীষণ শীত লাগিতেছে।

তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। কিন্তু কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস জোরে জোরে বহিতেছে। এই বাতাসের মুখেই ওয়াজেদ বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু মুক্তাগাছার রাস্তায় উঠিয়াই সে ভাবনায় পড়িল। সে কোথায় যাইতেছে? বাড়ি? বাড়ি যাইবার মুখ কি তার আছে? না, সে বাড়ি যাইবে না। সে ঢাকা চলিয়া যাইবে।

সে সোজা মুক্তাগাছার রাস্তা ক্রস করিয়া পণ্ডিতপাড়ার রাস্তায় নয়া বাজারের দিকে চলিল। অল্পক্ষণেই সে নয়া বাজারের চৌরাস্তায় আসিয়া পৌছিল। এখানে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। নিজেকে প্রশ্ন করিল, সে কি সত্যের পক্ষ ছাড়িয়া দিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছে?

যদি পলাইয়া নাই যাইবে, তবে দায়রার তারিখ না জানিয়াই সে ঢাকা রওনা হইয়াছে কেন? যদি ইতিমধ্যে দায়রার শুনানি হইয়া যায়?

সে কি তবে ভয়ে পলাইতেছে? একটা নির্দোষ লোক জেলে যাইতেছে, আর সে একমাত্র সাক্ষী হইয়াও খান্দানের ইয্‌যতের ছুতা দিয়া ঢাকায় পলাইয়া যাইতেছে! কলেজের সমপাঠীদের কাছে, ছাত্রলীগের সহকর্মীদের কাছে, তমদ্দুন মজলিসের মেম্বরদের কাছে সে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে? না, ওয়াজেদ ঢাকা যাইতে পারে না।

সুতরাং সে বাঁ-দিকে না ফিরিয়া ডানদিকে ফিরিল। তখন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু হইয়াছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ওয়াজেদ টাউনহলের দিকে চলিতে লাগিল।

টাউনহল ছাড়াইয়া যখন সে কেশব বাবুর বাংলোর সামনে আসিল, তখন আবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সে বাড়ি যাইতেছে কেন? তবে কি সে বাপের নিকট আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিয়াছে? না যদি করিয়া থাকে, তবে সে বাড়ি যাইতেছে কেন? কি তার উদ্দেশ্য? বাড়ি গিয়া বাপের সাথে অসহযোগিতা করিবে? তাঁর স্নেহ-আদর নিবে না? তাঁর ভাত খাইবে না?

তাঁর দালানে থাকিবে না? তাঁর খাট-পালং লেপ-তোষকে শুইবে না? এভাবে মনের উপর চোখ ঠারিয়া লাভ কি? নিশ্চয় ওয়াজেদ বাপের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেই যাইতেছে।

কিন্তু—কিন্তু আত্মসমর্পণ করিলেই কি বাবা তাকে মাফ করিবেন? মাফ হয়ত করিতেও পারেন। কিন্তু আগের মত ভাল আর বাসিবেন কি? বিশ্বাস আর করিবেন কি? অসম্ভব।

তবে? ওয়াজেদ সত্যের পক্ষও ছাড়িবে, বাপের ভালবাসাও হারাইবে? দুকুল খোয়াইবে সে? না, তার আর ফিরিবার পথ নাই। সে যেখানেই যাক, বাপের বাড়িতে যাইতে পারে না। ও-দিককার দরজা বন্ধ।

সে তড়াক করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। একটু থামিয়া সে ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইল এবং ক্রমেই দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল।

তার পরনে একটি পাজামা, গায়ে হাফশার্ট, তার উপর পুলওভার। এতক্ষণের গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে সব ভিজিয়া গিয়াছে। এই প্রচণ্ড শীতে ভিজা কাপড়ে একটি যুবক দ্রুতবেগে পথ চলিতেছে, এটা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু পথে তখন তেমন ভিড় না থাকায় চেনা-শোনা কারো নযরে সে পড়িল না। সে একটানা হাঁটিয়া ষ্টেশনে পৌছিল।

তেইশ

নামাযের ছুটির পর কোর্ট আবার বসিয়াছে। অন্যান্যের সাথে সরকার সাহেবও এজলাসে ঢুকিয়াছেন। মোক্তার সাহেবের ইশারায় তিনি তাঁর পাশে গিয়া বসিলেন। জেরার পয়েণ্ট দিতে হইবে।

মসজিদ হইতে কোর্টে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি নিজের লোকজনের মুখে এই সুসংবাদ শুনিতে পাইলেন যে, ওয়াজেদ ঢাকা হইতে বারটার গাড়িতে এখানে পৌছিয়াছে, বাড়ি না গিয়া ছোট মিঞা সোজা কোর্টে আসিয়াছিল, মামলার সম্বন্ধে তার এত আগ্রহ। মামলায় সরকার সাহেবের জিত সুনিশ্চিত জানিয়া খুশী হইয়া বিবি সাহেবাকে খবর দিতে সে বাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

লোকজনের উৎফুল্ল মুখে এই আনন্দ-সংবাদ শুনিয়া সরকার সাহেব হাসিলেন। কারণ সত্যই তিনি খুশী হইয়াছেন। তাঁর জন্য এটা আনন্দ-সংবাদই বটে। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। যাক, গেল। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত কোর্টের আঙিনা হইতে সরিয়া গিয়াছে। আর, তাকে ধন্যবাদ যে, সে আসল কথা লোকজনের কাছে গোপন করিয়া গিয়াছে। উহ্, আল্লাই ইয্যৎ বাঁচানেওয়ালা। গুলিটা সরকার সাহেবের কানের কাছ দিয়া গিয়াছে। তাই তিনি যখন মোক্তার সাহেবের পাশে বসেন, তখন সগর্বে চারদিক চাহিয়া লইয়াছেন।

এক নম্বর সাফাই সাক্ষী ব্যাংকের কর্মচারী। তিনি তাঁর যবানবন্দিতে বলিলেন বটে যে, যামিনামার দস্তখত ওসমান সরকারের, কিন্তু জেরায় তিনি স্বীকার করিলেন যে, ওসমান সরকার সাক্ষীর সামনে দস্তখত করেন নাই। এই রকম আর দুই একটি সাক্ষীর পর ডাকা হইল আসামী পক্ষের তুরুপ সাক্ষী ঈদু শেখকে। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঠগড়ায় উঠিল। আমির আলি ও সিরাজ মোক্তারের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হইল। তাঁহাদের মুখে চাপা হাসি ফাটিয়া পড়িল।

ঈদু শেখ যথারীতি হলফ লইয়া বলিল যে, সে ওমর বেপারীর নিতান্ত বিশ্বাসী চাকর ছিল। সে অধিকাংশ সময় বেপারী সাহেবের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। ওমর বেপারীর চাকুরি করা কালে একদিন তাকে বেপারী সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ওসমান সরকার সাহেব আমির আলি মিয়ার যামিন হইয়াছেন এবং বেপারী সাহেব তার সাক্ষী হইয়াছেন।

আদালতে একটা চাপা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। সকলে কানাকানি করিতে লাগিল। মামলার মোড় ফিরিয়া গেল না ত?

আমির আলি আসামীর কাঠগড়া হইতে এই চাঞ্চল্য লক্ষ করিল। সে একবার হাকিমের দিকে একবার দর্শকদের দিকে সগর্ব হাসিমুখে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিল।

কিন্তু সরকার সাহেব ও তাঁর মোক্তারকে মোটেই চঞ্চল দেখা গেল না। তাঁরা ধীরভাবে কানাকানি করিতেছেন এবং হাসি বিনিময় করিতেছেন।

সরকার সাহেব পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া তার মধ্য হইতে সাবধানে ও সযত্নে একটি কাগয বাহির করিলেন। মোক্তার সাহেব তাহা হাতে লইয়া ঈদু শেখকে জেরা করিতে দাঁড়াইলেন।

"ঈদু মিয়া, তোমার ঘটনাটা স্পষ্ট মনে আছে, না অনুমান কৈরা কৈতাছ?"

"অনুমান কইরা কমু কেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওটা ত আর বেশী দিনের কথা না। মনে হৈতাছে যেন পরশুদিনের কথা।"

"কখন অর্থাৎ দিন বা রাত্রের কোন্ সময় বেপারী সাহেবের সাথে তোমার এই আলাপটা হইছিল?

"দিনের বেলা। এই দুপুরের কিছু আগে।"

"কোথায় বইসা এই গল্পটা তিনি করলেন?"

"তাঁর বৈঠকখানা ঘরে।"

"কাজকর্ম ফেইলা বৈঠকখানায় বইসা গল্প করতাছিলা কেন?"

"আষাঢ় মাস আছিল কিনা। খুব ঝড় মেঘ হৈতাছিল। আমি ধাড়ি বুনাইতাছিলাম, বেপারী সাব তাইতা কাটতে আছিলেন। সেই সময় গল্পে গল্পে তিনি ঐ কথা কইছিলেন।

এই সময় ফরিয়াদীর মোক্তার তাঁর হাতের কাগযখানা হাকিমের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন: হুযুর, আমি এই দলিলখানা ফাইল করার অনুমতি চাই। বাদীকে দিয়া পরে এটা আমি প্রমাণ করব। এটা ওমর বেপারীর স্ত্রীর দস্তখতী এক ঘোষণাপত্র। তিনি এখন অসুখে শয্যাশায়ী। তিনি তিনজন সাক্ষীর সামনে হলফ করিয়া এতে দস্তখত দিছেন। এতে তিনি বলছেন, ঘটনার এক বছর আগেই ঈদু শেখ ওমর বেপারীর চাকুরি ছাইড়া আসাম চইলা যায়। সুতরাং ঐ সময় ঈদু ওমর বেপারীর চাকুরিতেই ছিল না। তার গল্প সম্পূর্ণ কল্পিত।

আসামী পক্ষের মোক্তার লাফাইয়া উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন। এত বিলম্বে কোনো দলিল দাখিল হইতে পারে না। হাকিম আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন। বলিলেন: জেরার সময় সাক্ষীর সামনে যে কোনো কাগয পেশ করা যাইতে পারে।

আসামীর মোক্তার তখন কাগযটি দেখিতে চাহিলেন। হাকিম বলিলেন: নিশ্চয় দেখিতে পাবেন। আমি আগে পইড়া নেই।

হাকিম পড়া শেষ করিয়া আসামীর মোক্তারের হাতে কাগযটি দিলেন। তাঁর পড়া শেষ হইলে হাকিম বলিলেন: আপনার কি বলবার আছে?

"হুযুর, এটা প্রমাণরূপে গৃহীত হৈবার পারে না। ঘোষণাকারীকে সাক্ষী মানতে হৈব।

হাকিম: সেটা ঠিক। কিন্তু সে কেবল আপনেরে জেরা করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ঘোষণাকারী যখন শয্যাশায়ী, তখন কমিশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ফরিয়াদীর খরচায় সে সুযোগ আপনেরে দেওয়া হবে। আগে দেখা যাক, সাক্ষী এ সম্বন্ধে কি বলে।

ফরিয়াদীর মোক্তারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন: আপনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারেন।

ফরিয়াদীর মোক্তার বিনয়ের আতিশয্য দেখাইয়া বলিলেন: হুযুর নিজেই সাক্ষীকে প্রশ্ন করুন। তাতে আইনের সমস্ত তর্ক মিইটা যাব। হুযুরের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

হাকিম খুশী হইয়া সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলিলেন: তুমি কইছ ঘটনার দিন তুমি ওমর বেপারীর চাকুরি করতে আছিলে। ওমর বেপারীর পরিবার কইতে আছেন, তুমি তার এক বছর আগেই চাকুরি ছাইড়া আসাম চইলা গেছ। এর কোন্‌টা সত্য?

ঈদু ঘাবরাইয়া গিয়াছিল। তার জোড়াতালি-দেওয়া স্মৃতিশক্তি আবার এলোমেলো হইয়া গেল। সে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোনো জবাব তার মুখে জুটিল না।

হাকিম আবার প্রশ্ন করিলেন: জবাব দিতেছ না কেন? তুমি কি আসাম গিয়াছিলে?

"হুযুর, গেছিলাম।"

"কবে গেছিলা?"

"মনে নাই, হুযুর।

"ওমর বেপারীর চাকুরি ছাইড়া গেছিলা ত ?"

"হা, হুযুর"

"ওমর বেপারীর চাকুরি ছাড়ছিলা কবে ?"

"মনে নাই, হুযুর ?"

"কয় বছর হল বল্‌তে পার ?"

"না, হুযুর। অত শত কি মনে থাকে ? আমি মুখ্‌খু-সুখ্‌খু মানুষ।"

"তবে ঐ আলাপের কথাটা মনে রইল কেমনে ?"

"ওটাও হুযুর মনে আছিল না।"

"কেউ তবে মনে করাইয়া দিছে ?"

"হা, হুযুর।"

হাকিম ধমক দিয়া বলিলেন : কেটা ? আসামী ?

ঈদু ভয়ে কাঁপিতেছিল। বলিল : না হুযুর।

হাকিম আরো গলা চড়াইয়া বলিলেন : কে তবে ?

সে এজলাসের চারদিকে তাকাইয়া কি যেন তালাশ করিতেছিল।

হাকিম তার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিলেন : সে লোক এই আদালতে উপস্থিত আছে ?

শরাফত মণ্ডল আভাস পাইয়া আগেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই ঈদু কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল : আছিল হুযুর, অখন দেখতাছি না।

সমস্ত এজলাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাকিম সে হাসিতে যোগ দিলেন।

হাসি থামিলে হাকিম বলিলেন : তার নাম কি ?

ঈদু ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল : হুযুর, আমার কোনো দোষ নাই। আমারে মানষে ফুসলাইয়া এই কথা শিখাইয়া দিছে। কিন্তু তার নাম কৈয়া দিলে আমার ঘাড়ে মাথা থাকবো না।

তরুণ হাকিমের মনে দয়া হইল। তিনি বলিলেন : তোমাকে আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে ফৌজদারীতে দিতে পারতাম। কিন্তু বুড়া মানুষ বইলা তোমারে মাফ কইরা দিলাম। যাও।

ঈছু শেখ দুইহাতে হাকিমকে পুনঃ পুনঃ সেলাম করিতে করিতে কাঠগড়া হইতে নামিয়া গেল।

সমস্ত এজলাস ব্যাপারটার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। একেবারে সুঁইপড়া নিস্তব্ধতা।

সরকার সাহেবের মুখে হাসি ধরে না। বিজয়গর্বে তিনি আমির আলির মুখের দিকে চাহিলেন। তার মুখ একেবারে কাল ছাই হইয়া গিয়াছে।

হাকিম আসামীর মোক্তারের দিকে চাহিয়া বলিলেন : আপনার আর কোন সাক্ষী আছে?

আমির আলি নিজের মোক্তারের উপর চটিয়া গিয়াছিল। এমন ভাল সাক্ষীটা তার মোক্তারের দোষে নষ্ট হইয়া গেল। আর সাক্ষী দিয়া কি হইবে? মোক্তারের প্রতি আমির আলির আস্থাও টুটিয়া গিয়াছিল। কাজেই সিরাজ মোক্তার জবাব দিবার আগেই আমির আলি নিজেই বলিল : না হুযুর, আমি আর সাক্ষী দিমু না।

হাকিম যথারীতি আসামীর জবানবন্দী লইয়া চার্জ গঠন করিয়া আসামীকে দায়রা সোপর্দ করিলেন। তারপর তিনি চেম্বারে ঢুকিয়া পড়িলেন।

এজলাস ভাঙিয়া গেল। সমবেত লোকজন ঠেলাঠেলি করিয়া এজলাস হইতে বাহির হইতে লাগিল।

সরকার সাহেব ও তাঁর মোক্তার হাত ধরাধরি করিয়া যখন এজলাসের বাহিরে আসিলেন, তখন বিরাট জনতা তাঁদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সরকার সাহেবের পক্ষে তারা হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল, যেন তারা সরকার সাহেবের কতকালের সমর্থক। সরকার সাহেবের, তাঁর সাক্ষীদের, তাঁর পক্ষের মোক্তারের তারিফে এবং আমির আলির, তার সাক্ষীদের এবং তার পক্ষের মোক্তারের নিন্দায় এক-এক জন এক-এক মন্তব্য করিল, রসিকতা করিল এবং দল বাঁধিয়া হাসিল। সরকার সাহেবরা সে হাসিতে যোগ দিলেন।

অবশেষে জনতা সরকার সাহেবের কাছে মিঠাই দাবী করিল। সরকার সাহেব পকেট হইতে দশ টাকার আস্ত একটা নোট বাহির করিয়া একজনের

হাতে দিয়া মিঠাই কিনিতে বলিয়া দিলেন। জনতা দশটাকাওয়ালার পিছনে ছুটিল।

এরপর পেশকার-চাপরাশীর পালা। সরকার সাহেব সবাইকে খুশী করিলেন। তারা সবাই সরকার সাহেবকে লম্বা লম্বা সেলাম দিয়া বিদায় হইল।

অবশেষে মোক্তার মুহুরী সাক্ষী তদবিরকারদের মিছিল করিয়া সরকার সাহেব কাছারী প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিলেন। পথে পথে অনেক লোকের অভিনন্দন-মোবারকবাদ তাঁদের গ্রহণ করিতে হইল। সেজন্য দু-এক জায়গায় তাঁদের দাঁড়াইতেও হইল। দু-এক কথা না শুনিয়া কেউ ছাড়িতে পারে? সবাই সরকার সাহেবের জয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল ত।

সরকার সাহেব বুঝিলেন, তাঁর জয়ে সকলেই খুশী হইয়াছে। হইবে না? সত্যের জয়ে সবাই খুশী হয় কেবল বদমায়েশরা ছাড়া। দুনিয়ার সব লোকই ত আর আমির আলি হইয়া যায় নাই।

মোক্তার সাহেবকে খুশী করিয়া, সাক্ষী ও তদবিরকারদের দাবী-দাওয়া মিটাইয়া, রাস্তায় রাস্তায় পরিচিত অপরিচিত সকলের মোবারকবাদ গ্রহণ করিয়া এবং এখানে ওখানে বৈঠক শেষ করিয়া সরকার সাহেবের বাড়ি ফিরিতে রাত আটটা বাজিয়া গেল।

চব্বিশ

সারা গাঁয়ের লোক সরকার বাড়িতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মোকদ্দমা জিতার খবর যথাসময়েই বাড়িতে পৌছিয়াছে। কাজেই লোকজনেরা খবরের অপেক্ষায় বসিয়া নাই, বসিয়া আছে তারা আজিকার এই লড়াইর বিজয়ী সেনাপতি সরকার সাহেবের অপেক্ষায়। সরকার সাহেবকে মোবারকবাদ জানাইতে হইবে, তাঁকে দেখাইয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে হইবে, তারা সবাই যে সরকার সাহেবের পক্ষের লোক, সেটা হাতে-কলমে প্রমাণ করিতে হইবে। কত কাজ! এ-সব কাজ ফেলিয়া বাড়ি যাওয়া যায় না, যত রাতই হোক।

চাকর-বাকরের অনুগ্রহে তামাকও চলিতেছে বেদম।

কাজেই সরকার সাহেব বাড়ি পৌছিয়াই অন্দরে ঢুকিতে পারিলেন না। ও-পক্ষের মোক্তার ও সাক্ষীদের সমালোচনা ও ক্যারিকেচার, এ পক্ষের মোক্তার ও সাক্ষীদের বিশেষতঃ সরকার সাহেবের সাক্ষ্যের তারিফ, তদবিরকারদের যার-তার কৃতিত্বের জানা-অজানা ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তাদের মধ্যে অনর্গল বক্তৃতার প্রতিযোগিতা চলিল। সরকারবাড়ির বৈঠকখানায় অন্যান্যদিন স্বয়ং সরকার সাহেবই থাকেন প্রধান এমন কি একমাত্র বক্তা; আর সকলে ভিজা শিয়ালের পালের মত বসিয়া বসিয়া কেবল সরকার সাহেবের বক্তৃতা গিলিয়া যায়, কেউ কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু আজ ঠিক তার উল্টা। সকলে পালা করিয়া বক্তৃতা করিতেছে। সরকার সাহেব হাসিমুখে সকলের কথা শুনিতেছেন এবং মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছেন। আজ এদেরই দিন। এদের খুশী রাখা সরকার সাহেবের কর্তব্য।

এইভাবে এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে অন্দর হইতে তিন বার বিবি সাহেবের তাগিদ আসিয়াছে।

চতুর্থবারের তাগিদে সরকার সাহেব উঠিতে বাধ্য হইলেন। সকলকে তামাক পান দিতে চাকরদের হুকুম দিয়া তিনি অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

বিবি সাহেব, যায়েদা ও বৌমা চাকরানীদের লইয়া উঠানে দরবার করিতেছিলেন। সরকার সাহেবের জুতার মচ্মচ্ শব্দ শুনিয়া বিবি সাহেব আগাইয়া আসিয়া বলিলেন: ওয়াজেদ কই?

তাই ত! সরকার সাহেব ত ওয়াজেদের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে লজ্জা পাইলেন। কিন্তু পুত্রের কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন একথা বিবির কাছে স্বীকার করিতে পারিলেন না। আজ ছোটখাটো মিছা বলিতে তাঁর জিভে আর আটকায় না। তিনি বলিলেন: আমার ধারণা আছিল সে ঢাকা চইলা গেছে।

বিবি সাহেব পুত্র সম্বন্ধে নানারূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন। কারণ ইতিমধ্যে যায়েদা তাঁর কাছে গত রাতের ব্যাপার কিছু কিছু বলিয়াছে। স্বামীর কথায়

তিনি কিছুটা আশার আলো দেখিতে পাইলেন। তাই তিনি আগ্রহভরে বলিলেন: কেন, তার কি আজই ঢাকা যাওয়ার কথা? আপনের সাথে সে কি দেখা কইরা গেছে?

সরকার সাহেব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন: দেখা হৈছে, কিন্তু যাওয়ার কথা কইয়া যায় নাই ত।

বিবি: তা হৈলে আপনে কেমনে জানলেন সে ঢাকা গেছে?

সরকার সাহেবের জবাব দিবার কিছুই ছিল না। তিনি বলিলেন: ঢাকা না গেলে সে গেল কই?

সেই কথাই ত বিবি সাহেবও জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অল্পক্ষণেই সকলে বুঝিল ওয়াজেদ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না।

সুতরাং এটা চিন্তার কারণ। বিবি সাহেব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন: একটা খোঁজ-খবর করুন। হা আল্লাহ্, আমার ছেলেকে তুমি সহি-সালামতে রাখ।

সরকার সাহেব পুত্রের খোঁজ-খবরের আশু আবশ্যকতা বুঝিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বাহির বাড়িতে চলিয়া আসিলেন।

বাহির বাড়িতেও হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কথা স্থির হইয়া গেল, চারজন এক্কায় এবং আর চার-পাঁচ জন সাইকেলে তখনই বাহির হইয়া পড়িবে। এক্কা জোতা হইতে লাগিল। সাইকেল জোগাড়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে লোক চলিয়া গেল।

সরকারবাড়ির অন্দরে বাহিরে যখন এইরূপ হৈ চৈ চলিতেছে, তখন অদূরে ঘোড়াগাড়ির ঘোড়ার গলার ঘুঘরার আওয়াজ শোনা গেল।

সকলে কান খাড়া করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। খানিক পরেই গাড়ি সরকারবাড়ির পুকুরপাড়ে আসিল। কেউ কেউ আগ বাড়িয়া গেল।

'ছোট মিঞার জর' 'ছোট মিঞার জর' বলিয়া রব উঠিয়া গেল।

গাড়ি আসিয়া বৈঠকখানার সামনে থামিল। ধরাধরি করিয়া অচেতন ওয়াজেদকে নামান হইল। সরকার সাহেবের হুকুমমত তাকে অন্দরে নেওয়া হইল। অন্দর মহলে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল।

ব্যাপার এই যে, ওয়াজেদ ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমের এক বেঞ্চের উপর জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছিল। যাত্রীদের কেউ কেউ দয়া করিয়া তার খবর লয়। তার মুখে পরিচয় পাইয়া কয়েকটি ছাত্র-কেসেমের লোক রিক্‌শায় করিয়া তাকে দোকানে লইয়া আসে। দোকানের কর্মচারীরা তার সমস্ত কাপড় ভিজা দেখিয়া ঐ অবস্থায়ই যথাসম্ভব কাপড় বদলাইয়া ঘোড়ার গাড়ি করিয়া তাকে বাড়ি লইয়া আসিয়াছে। মোটরের চেষ্টা করিয়াছিল, পায় নাই।

সরকারী ডাক্তার সুলেমান সাহেব আসিয়া ওয়াজেদকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। জ্বর ১০৬ ডিগ্রী। রোগী ঘোর অচেতন। মেয়েদের সরাইয়া দিয়া ডাক্তার সাহেব সরকার সাহেবের সহিত অনেকক্ষণ কানাকানি করিলেন। ভয়ের কোন কারণ নাই ইত্যাদি প্রাথমিক আশ্বাসাদি দিয়া অবশেষে তিনি জানাইলেন, ঠাণ্ডা লাগিয়া ব্রঙ্কাইটিস হইয়াছে, নিউমোনিয়ার সমস্ত পূর্বলক্ষণ সুস্পষ্ট। ডবল নিউমোনিয়ার আশঙ্কা আছে। খুব সাবধানে থাকিতে হইবে।

ডাক্তার সাহেব প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া এবং ঔষধ পাঠাইবার জন্য একজন লোক সঙ্গে লইয়া আরেকবার অভয় দিয়া বিদায় লইলেন। রোগীর ঘরে বেশী ভিড় করিতে বারণ করিয়া গেলেন।

বিবি সাহেব ও যায়েদা ওয়াজেদের শুশ্রূষার ভার লইলেন।

রাতটা গভীর উদ্বেগে কাটিল। সারারাতই অল্প খুকখুক্ কাশ শোনা গেল। সরকার সাহেব বারান্দায় পায়চারি করিয়া এবং মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করিয়া রোগীর খবর লইয়া রাত কাটাইলেন। একবারও বিছানায় পিঠ লাগাইতে পারিলেন না।

সকালবেলা ডাক্তার সাহেব আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ষ্টেথিস্‌কোপ লাগাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গণিয়া নাড়ি পরীক্ষা করিয়া মুখভার করিলেন। ডবল নিউমোনিয়া হইয়া গিয়াছে।

একদিন দুইদিন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ চলিয়া যাইতেছে। ওয়াজেদের

অবস্থার কোনোই উন্নতি দেখা যাইতেছে না। বাড়ির সর্বত্রই শোকের ছায়া। বাড়ির লোকজন, চাকরবাকর, এমন কি গরু-ঘোড়াও যেন বিষণ্ণ। সর্বত্র একটা চাপা কানাকানি। সমস্ত গ্রামটাই গমগীন। মাঠে চাষীরা, গাছতলায় পথিকরা, বাজারে দোকানদাররা সবাই একই আলাপ করিতেছে। সরকার সাহেবের একমাত্র পুত্রটা বুঝি আর বাঁচে না। কি চেহারা, কি তমিজ-লেহায, কি আদব-কায়দা হইয়াছিল ছেলেটার! মুখখানা সব সময়েই হাসি-হাসি। আর পড়াশোনাতেই বা কি যেহান! বি-এ পাশ করিয়া ফেলিত এক চোটে। পাশ করিলেই ডিপ্‌টিগিরি বাঁধা। এমন ছেলে হারাইয়া সরকার সাহেব একেবারে পাগল হইয়া যাইবেন। আহা, বেচারার এত ধন-দওলৎ থাকিতেও তাঁর মত দুঃখী কে? বড় ছেলে হায়দর আলিটা বিয়ার পরপরই মারা গেল। বড় মেয়েটা ধড়ফড় করিয়া মারা গেল। ছোট মেয়েটাও বিধবা হইয়া ঘরে বসিল। এখন একমাত্র সম্বল এই ছেলেটা। তাও আজ যায়। আহা, বেচারার কপালে এত দুঃখও ছিল! এখন বাকি থাকিল বড় মিঞার ঐ দুধের শিশু এতিমটা। জোয়ান-জোয়ান ছেলে-মেয়েগুলিই যখন এইভাবে এক-এক করিয়া ধড়ফড় করিয়া মরিল, তখন ঐ দুধের শিশুর আর ভরসা কি? বাঁচিলেও সেটা কবে মানুষ হইবে? সরকার সাহেব কি আর দেখিয়া যাইতে পারিবেন?

সবাই একরূপ ধরিয়াই লইয়াছে যে, ওয়াজেদ এযাত্রা আর ফিরিতেছে না।

কিন্তু এ কয়দিন ধরিয়া সরকার সাহেবের মনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিতেছে, তার খবর বড় কেউ রাখে না। তিনি সারাদিন পুকুর-পাড়ে এবং সারারাত উঠানে ও ঘরের বারান্দায় পায়চারি করেন আর ভাবেন। কিছু কিনারা করিতে পারেন না।

ছেলের উপর তাঁর নিজের বদ্‌-দোওয়া লাগে নাই ত? তাঁর বেশ মনে পড়িতেছে তিনি রাগ করিয়া ছেলের মৃত্যুকামনা করিয়াছিলেন। খোদা কি তাঁর সে কথা মঞ্জুর করিয়াছেন? কই তিনি ত সে কথা অন্তর দিয়া বলেন নাই, রাগে ক্ষিপ্ত হইয়াই ওকথা বলিয়াছিলেন। খোদা কি

আন্তরিক ও রাগের কথার পার্থক্য বুঝেন না? হা খোদা! তিনি ছেলের উপর রাগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে রাগও ত আসলে ছেলের উপর ছিল না। যে বদমায়েশরা তাঁর ছেলেকে বাপের বিরুদ্ধে লাগাইয়াছিল, সে রাগ ত ছিল ঐ বদমায়েশদেরই উপর।

তারপর তিনি ত ছেলেকে মাফই করিয়া দিয়াছেন। তবু খোদা কেন তাঁর ছেলেকে শাস্তি দিতেছেন? খোদার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াই সরকার সাহেবের চিন্তাস্রোত হোঁচট খাইল। তিনি ঠিক কবে কখন ছেলেকে মাফ করিয়া দিয়াছেন, অনেক তালাশ-অনুসন্ধান করিয়াও তা তিনি বাহির করিতে পারিলেন না। ছেলে অসুখে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক মুহূর্তের ঘটনা ও চিন্তা তন্ন তন্ন করিয়া তালাশ করিলেন। ছেলেকে মাফ করিবার প্রমাণস্বরূপ নিজের কোনো কথা বা কাজ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

তবে কি তিনি ছেলেকে মাফ করেন নাই? তাই অভিমানী পুত্র তার এই সাংঘাতিক অসুখে আত্মবিসর্জন দিয়াছে? তাই আল্লাহ্‌তালা তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই কঠিন রোগে ফেলিয়া তাঁকে সাজা দিতেছেন? তিনি খোদাকে ডাকিয়া বলিলেন: হায় খোদা, এই মুহূর্তে আমাকে মাফ কর। এই মুহূর্তেই আমি ছেলেকে খালেস দিলে মাফ করিয়া দিলাম।

পাছে খোদা তাঁর এই মুখের কথায় বিশ্বাস না করেন, তাই তিনি অত রাত্রে একাএকা মসজিদে গেলেন। মসজিদের মিম্বরের কাছে হাতড়াইয়া দিয়াশলাই বাহির করিলেন। মোমবাতি জ্বালাইলেন। তারপর কিছু কোরআন তেলাওৎ করিয়া দুই রেকাত নফল নামায পড়িলেন এবং হাত উঠাইয়া খোদার কাছে কসম করিয়া বলিলেন, তিনি ছেলেকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। এইবার খোদা সরকার সাহেবের নয়নের পুতুলি ছেলেকে মাফ করিয়া তার রোগ আরাম করিয়া দেন।

তাঁর দোওয়া কবুল হইল কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি চুপিচুপি পা ফেলিয়া ওয়াজেদের কামরার সামনে গিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন। না, ঐ ত খুল্লুড় খুল্লুড় কাশি শোনা যাইতেছে। বাহির হইতে

জানালা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তাঁর বিবি ও মেয়ে তেমনি বিষণ্ণবদনে রোগীর সেবা করিতেছেন।

চুপিচুপি বিবিকে ইশারায় ডাকিলেন। বাছার জরটা কি কিছুমাত্র কমের দিকে যায় নাই? বিবি সাহেবের উত্তর শুনিয়া তিনি নিরাশ হইলেন। আবার উঠানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। খোদা কি তাঁর কথায় বিশ্বাস করেন নাই? কি করিলে তিনি বিশ্বাস করিবেন?

তবে কি তাঁর ছেলে বাঁচিবে না? সন্তান-শোকের ব্যাপারে সরকার সাহেব চূণ খাইয়া গাল-পোড়া মানুষ। জীবনে তিনি বড় কঠোর কঠোর আঘাত পাইয়াছেন। ছেলে গেল, মেয়ে গেল, জামাই গেল। এক একটি আঘাতে তাঁর কলিজার এক-একটা দাক্কা খসিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার-কবিরাজের উপর তাঁর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। তবে কি এ ছেলেও তাঁর বাঁচিবে না?

যদি না বাঁচে? তবে তাঁর পুত্রহারা হওয়ার জন্য দায়ী কে হইবে? কেন ওয়াজেদের অসুখ হইল? ঐ শয়তানেরা যদি ছেলেকে না ফুসলাইত, তবে সে কিছুতেই ঢাকা হইতে আসিত না, কিছুতেই সে বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য কোর্টে যাইত না, কিছুতেই ঐভাবে সে জলে ভিজিত না। তবে তার নিউমোনিয়াও হইত না। উহ্, শয়তানেরা কি দুমুখো ষড়যন্ত্রই করিয়াছিল! একদিকে গেলে বাপের জেল, আরেক দিকে গেলে ছেলের মৃত্যু! কি সাংঘাতিক বদমায়েশ এই লোকগুলা! সরকার সাহেব মামলায় জিতিয়াছেন সত্য, এবং দায়রায়ও খোদার ফযলে জিতিবেন নিশ্চয়ই। তাতে ঐ শয়তানদের মনে কষ্ট হইতেছে খুবই সত্য। কিন্তু সরকার সাহেবের পুত্র-হারানোর মত সর্বনাশে তাদের মনে যে উল্লাস হইবে, তাতে তাদের সে কষ্ট পোষাইয়া যাইবে।

আর সরকার সাহেবের? তিনি একমাত্র ছেলে হারাইয়া যে বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিবেন, মামলা জিতার আনন্দে তার ক্ষতিপূরণ হইবে কি? কিছুতেই না। কাজেই শেষ পর্যন্ত কি ঐ শয়তানদেরই জয় হইল না?

কেবল কি তাই? ওয়াজেদ আলি যদি মরিয়া যায়, তবে সে এই ধারণা

লইয়াই যাইবে যে, তার বাবাই দোষী, আমির আলি নির্দোষ। সে দিনরাত আসমান হইতে সরকার সাহেবকে কিয়ামত পর্যন্ত এই একই কথা বলিবেঃ 'বাপজান, আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন।' মৃত পুত্রের এই অভিযোগ কি তিনি সারাজীবন শুনিবেন না ? তিনি কিরূপে সেটা বরদাশ্‌ত্‌ করিবেন ?

না, ছেলেকে বাঁচাইতেই হইবে। যত টাকা লাগে, যত বড় ডাক্তারই আনিতে হয়, সরকার সাহেব তাই করিবেন। কালই তিনি সিভিল সার্জনকে কল দিবেন।

দিলেনও তাই। অন্য কাউকে পাঠাইয়া বিশ্বাস নাই। খুব সকালে উঠিয়া সরকার সাহেব এক্কা হাঁকাইয়া শহরে গেলেন। অসহ্য ব্যাকুলতার মধ্যে সাহেবের ঘুম হইতে ওঠা ও হাজিরিখানা খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁকে সংগে লইয়া তবে বাড়ি ফিরিলেন।

সিভিল সার্জন আসিয়াছেন শুনিয়া গাঁয়ের লোক সরকারবাড়িতে ভাঙিয়া পড়িল। ডাক্তার সুলেমান আগেই হাযির ছিলেন। তাঁকে লইয়া সিভিল সার্জন অন্দরে ঢুকিলেন। বাইরে কল্পনা ও অনুমান আসমান-জমিন ভ্রমণ করিতে লাগিল। সরকারবাড়ির সকলের বুক ধড়মড় করিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

শেষ পর্যন্ত বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া! সরকার সাহেবের অতগুলি টাকা নিয়া তিনি কিছুই না করিয়া চলিয়া গেলেন! অতবড় সার্জন হইয়াও তিনি বলিয়া গেলেন না ওয়াজেদ শীগ্‌গির সারিয়া উঠিবে, না দুই-একদিনের মধ্যে মরিয়া যাইবে? শুধু শুনিতেই বড় ডাক্তার!

আসল ব্যাপার এই যে, তিনি বলিয়া গিয়াছেনঃ সুলেমান ডাক্তারের ডায়গনসিস ঠিকই আছে। ঔষধও ঠিকই চলিতেছে। সামান্য রদ-বদল করিতে হইবে আর কি।

অসহ্য উদ্বেগে কাটিল আরো কিছুদিন।

ষোল দিনের দিন আশা হইল, আল্লাহ্‌ বুঝি সরকার সাহেবের দোওয়া কবুল করিয়াছেন। এইদিন ডাক্তার সুলেমানের মুখে একটু হাসি ফুটিল। শুশ্রূষাকারিণীদের বুকে ভরসা হইল। কানে কানে একটা আনন্দের খবর ছড়াইয়া পড়িল।

শুশ্রূষাকারিণী এখন তিনজন। বিবি সাহেব ও যায়েদার সংগে কিছুদিন ধরিয়া লুৎফুনও যোগ দিয়াছে। রোগের তিনদিনের দিন অবস্থা খারাপ শুনিয়া লুৎফুন সেই যে বাবার সাথে ওয়াজেদকে দেখিতে আসিয়াছিল, সেই হইতেই সেও সেবার ভার লইয়াছে। এই বারদিনের মধ্যে দু-চার বারের বেশী বাসায় যায় নাই। দিনরাত সে রোগীর পাশে বসিয়া কাটাইয়াছে।

রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় এই ক্ষুদ্র বালিকার নৈপুণ্য দেখিয়া বিবি সাহেব ও যায়েদা অবাক হইয়া গিয়াছেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই বলিয়া বেড়াইতেছেন লুৎফুন আসিয়া না পড়িলে এ রোগীকে তাঁরা কি করিয়া যে সামলাইতেন—। ওয়াজেদের আরোগ্যের লক্ষণ দেখিয়া লুৎফুনের মুখে আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু সরকার সাহেব? তাঁর বুকের দুরদুরানি বাড়িয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিলেন: হে খোদা, তুমি কি ওসমান সরকারের কান্না শুনিয়াছ? তার মুনাজাত কি কবুল করিয়াছ? বাবর বাদশাহের দোওয়ায় হুমায়ুনকে তুমি বাঁচাইয়া বাবরকে নিয়াছিলে। তুমি কি এবার ওসমান সরকারকে নিয়া ওয়াজেদকে ফেলিয়া যাইতে পার না? আয় খোদা, এটা যেন নিভিবার আগে বাতির দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠা না হয়।

পঁচিশ

মামলার পরের দিন।

জরিনা বরাবরের মতই খুব সকালে রান্না চড়াইয়াছে। আগের মত চা-বিস্কুট-রুটি দিয়া নাশ্‌তা ত আর হয় না। চারটা গরম ভাতই ভর্তা-টর্তা দিয়া খাইতে হয়।

কিন্তু চুলায় কেবলই ধুঁয়া হইতেছে। আগের দিনের বৃষ্টিতে লাকড়িগুলি ভিজিয়া গিয়াছে কিনা।

জরিনার শরীরটা ভাল নয়। মামলার খবরে মনটাও খারাপ। তার উপর লাকড়ির এই ব্যবহারে সে চটিয়াছে। ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে তার চোখ লাল হইয়া গিয়াছে। লাকড়ি যে প্রাণী নয়, একথা ভুলিয়া সে লাকড়িকে পুনঃপুনঃ ঝাঁকি দিতেছিল।

এমনসময়ে শোবার ঘর হইতে স্বামী তাকে ডাক দিল। স্বামীর ডাকাডাকিতে পোলাপান জাগিয়া উঠিয়া নাশ্‌তার জন্য কান্না জুড়িয়া দিবে ভয়ে সে চূলা ফেলিয়াই স্বামীর কাছে গেল। চাপা গলায় বলিল: পোলাপানরারে না জাগাইয়া তুমি ছাড়বা না?

স্ত্রীর কথায় কান না দিয়া আমির আলি বলিল: জান জরিনা, ঈদু শেখটাকে ওসমান সরকারই আমার সাক্ষী কৈরা পাটাইছিল।

ওঃ, এই কথা! জরিনা বিরক্ত হইয়া বলিল: এই কথা শুনবার লাগি আমারে রান্নাঘর থাইকা ডাইকা আনছ? আমার কাজ-কর্ম নাই?

আমির সুরে অভিমান আনিয়া বলিল: আমি ডাকলেই তোমার কাজ-কর্ম নষ্ট হয়? আমার সাথে একদণ্ড বসবার, আমার দুঃখে একটু হামদর্দি দেখাবার তোমার সময় নাই?

জরিনা: তোমার কাছে বইসা গল্প করলেই পেট ভরব?

আমির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল: একদিন ত ভরত জরিনা।

জরিনাও সেটা জানে। সেদিন আর নাই, এটাই জরিনার দুঃখ। সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল: সেদিন যে নাই তার লাগি কি আমি দায়ী?

আমির আলির পিঠে যেন চাবুক পড়িল। কিন্তু জবাব দিতে পারিল না। যন্ত্রণা-বিকৃতমুখে সে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল।

জরিনার দয়া হইল। সে দেখিয়াছে স্বামী সারারাত ঘুমায় নাই, কি যেন ভাবিয়াছে। সে স্বামীর সামনে বসিয়া বলিল: ঈদু শেখকে সন্দেহ করবার কারণ?

আমির: একটা ডাহা মিছা কথা কইবার লাগি বেটা সাইধা সাক্ষী দিতে আস্‌ল। কাঠগড়ায় খাড়া হৈয়া আহম্মকের মত কথা কইল। হাতে-নাতে ধরা পৈড়া ভেউ ভেউ কৈরা কাইন্দা দিল। তুমিই বল সন্দেহ হয় না?

জরিনা সোজাসুজি কথাটার প্রতিবাদ না করিয়া বলিল: ঈদু শেখ না শরাফত মোড়লের প্রজা?

আমির আলি বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল : মরুছি ত আমি সেইখানেই জরিনা। বেড়ায় যে আমার খেত খাইছে।

গলার স্বর হঠাৎ নীচু করিয়া সে বলিল : বিশ্বাস করবা জরিনা, মামলা ডাক পড়বার এক মিনিট আগে শরাফত মণ্ডলে ওসমান সরকারে কানাকানি হৈছে? এখন বুঝলা ঈন্দুর ভেদটা?

জরিনা : তোমার মোক্তার কি করছিল? সে বেটা কি গাই বলদ না দেইখাই সাক্ষী তুলছিল?

আমির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল : বরাত মন্দ হৈলেই মানুষে আক্কেলের মাথা খায়। সিরাজ মোক্তার যে ওসমান সরকারের সম্বন্ধী এ কথাটা পর্যন্ত আমরার মাথায় আসল না। মোড়লই ঐ মোক্তার দিবার জিদ করে। তখনই আমার সন্দেহ হৈছিল। কিন্তু মোড়লরে চটাইতে আমার সাহস হৈল না।

জরিনা : দুনিয়াশুদ্ধা লোকেরে সন্দেহ করা তোমার অন্যায়। সব মানুষই শয়তান, এটা হৈতে পারে না।

আমির আলি এবার চটিয়া গেল। তার একটা কথাও জরিনা বিশ্বাস করিল না! তার মনে পড়িল এইসব লোকের প্রতি জরিনার টান। বাড়িতে যখনই সে ওসমান সরকারের বদমায়েশির কথা বলিয়াছে, তখনই জরিনা বলিয়াছে ওসমান সরকার অমন বদমায়েশি করিতে পারে না। আজো জরিনা সেই কথাই বলিতেছে! আজ যখন তার স্বামীকে ওরা জেলে পাঠাইবার যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে, তখনও জরিনা ওদের দিকেই টানিতেছে! রাগে অন্ধ হইয়া সে বলিল : তুমি ত বিশ্বাস করবাই না। তোমার মতে ত তোমার খসমটাই দুনিয়ার একমাত্র শয়তান। আর সবাই ত সাধু।

জরিনার বুদ্ধি-আক্কেল জমিয়া গেল। কিসের মধ্যে কি কথা! সে বুঝিল স্বামীর এ খোঁটার অর্থ কি। কিন্তু সে কি স্বামীর দুশমনদের সমর্থন করিয়া ও-সব কথা বলিয়াছিল? জরিনা যে সত্যই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, মানুষ অত বদমায়েশ হইতে পারে। এটা কি জরিনার দোষ? সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল : আমি কি তাই কইছি?

আমির আলি মুখ ভেংচাইয়া বলিল : বড় বাকিও রাখছ না।

জরিনা বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল : দুনিয়ার সব লোকই যদি ওসমান সরকারের পক্ষে, তবে তার সাথে মামলা করতে গেলে কেন ?

যতক্ষণ দেখা গেল আমির আলি স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চক্ষের আড়াল হইলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এই তার স্ত্রী! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই ব্যবহার! সত্যই ত দুনিয়ার সব লোক তার দুশমন। এই বিপদে এই দুশমনির মধ্যেই ত মানুষ স্ত্রীর সহানুভূতি চায়। জরিনা তা হইতে স্বামীকে বঞ্চিত করিল! তবে আর আমির আলির ভরসা কি ? ঘরের স্ত্রী যার বিপক্ষে, বাইরের লোক তার দুশ্‌মন হইবে এতে আর আশ্চর্য কি! না, আমির আলির দায়রায় জিতিবার আর আশা নাই।

সে কল্পনায় দেখিল দায়রায় সে হারিয়া গিয়াছে। পুলিশ তার হাতকড়ি লাগাইয়া জেলখানায় টানিয়া নিতেছে। তার সমর্থকরা ওসমান সরকারের কাতারে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। সে শিহরিয়া উঠিল।

সমস্ত ব্যাপারটাও এখন আমির আলির নিকট পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। সত্যই গাঁয়ের সব বড়লোকরা তার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আফসোস, আমির আলি এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়াও সেই ফাঁদে পা দিয়াছিল।

উত্তেজনায় সে উঠিয়া পড়িল। ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিল। ছেলেমেয়েদের উপর নজর পড়িল। ওরা এওড়া-মেওড়া আথালি-পাথালি পড়িয়া আছে।

ছেলেমেয়েদের এমন ঢংএর শোওয়া আমির আলি আরো কতবার দেখিয়াছে। কিন্তু আজিকার মত খারাপ লাগে নাই আর কোনোদিন। আজ যেন বিছানাপত্রে, ছেলেদের শোওয়ার ভংগিতে, তাদের কাপড়-চোপড়ে, এমন কি তাদের চেহারায় পর্যন্ত নোংরামি ও দারিদ্র কিল্‌বিল্ করিতেছে। এ দারিদ্রের জন্য দায়ী কারা? কে আমির আলিকে তার সুখ-সৌভাগ্যের খাট-পালং হইতে এই মেঝের ধূলায় নামাইয়াছে? ঐ শয়তান ওসমান সরকার।

সত্যই আজ আমির আলি পালংএ শুইয়া নাই। তার বদলে ঘরের মেঝেয় ঢালা বিছানা করিয়াছে। দোকান-পাট ও ইটখোলা ক্রোক হওয়ার পর হইতে তার আয় স্বভাবতঃই অনেক কমিয়া গিয়াছিল। তার উপর আমির আলি কল্পনা-বলে যতই দেশের সমস্ত বড়লোককে নিজের শত্রু বলিয়া যাহির করিয়াছে, তারা যেন ততই সত্যসত্যই আমির আলির শত্রু-কাতারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার কায-কারবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের লোক ততই সন্দিহান হইয়াছে। খরিদ্দার ত কমিয়াছেই, কারবারের স্বাভাবিক দৈনন্দিন বাকি লেনদেনও বন্ধ হইয়াছে। ফলে তার কারবার আজ একদম বন্ধ। কাজেই মামলা-খরচ যোগাইতে গিয়া তাকে ক্রমে ক্রমে ঘরের তহবিল, ধান-পাট, খাট-পালং এবং শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিতে হইয়াছে।

গরিব-দুঃখীর ছেলেপিলের মত নিজের ছেলেমেয়েদের মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আমির আলির মনে কষ্ট হইল। ছেলেমেয়েদের এবার শীতের কাপড় ত দূরের কথা, কোনো কাপড়ই সে কিনিয়া দিতে পারে নাই। ছেঁড়া ফাটা কাপড়ের ফাঁকে-ফাঁকে ছেলেমেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখা যাইতেছে। বুড়া শয়তান ওসমান সরকারই আমির আলির নাবালক ছেলেমেয়েকে এই কষ্ট দিতেছে। এ অন্যায়ের প্রতিশোধ—

হঠাৎ স্ত্রীর গলার আওয়াজে আমির আলির চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। জরিনা দেউড়ির কাছে কার সাথে যেন কথা বলিতেছে। হায়! এতদিন চাকর-চাকরানীতে বাড়ি ভরা ছিল। জরিনা ও আমির আলি বসিয়া বসিয়া শুধু হুকুম করিত। রান্না-বান্নারও অর্ধেক কাজ চাকরানীরাই করিত। আজ তারা সব চলিয়া গিয়াছে। কারণ সময়মত মাহিয়ানা পায় না। তাই দেউড়িতে কে ডাকিল না ডাকিল, তারও খবর জরিনাকেই লইতে হয়।

স্ত্রীর উপর আমির আলির মনটা খুবই নরম হইল। না, বেচারীর উপর রাগ করা তার ঠিক হয় নাই। তার শরীরটার দিকে চাহিলে কষ্ট হয়। এই সেদিন ছেলে খালাস হইল। ছেলে পেটে ধরা কি সহজ কাজ? তার উপর দশ মাস ধরিয়া যে ছেলের জন্য এত কষ্ট করা, সেও গেল মারা। মানুষের

ধৈর্যেরও ত একটা সীমা আছে? এর পরেও আমির আলি তাকে কম কষ্ট দিয়াছে? তার গায়ের সব কখানা গহনা খুলিয়া নিয়াছে। বলিয়াছে বটে বন্ধকের কথাই, কিন্তু আসলে করিয়াছে সব বিক্রিই। বন্ধকে কুলাইল না কিনা। তাছাড়া এই কয় মাস হইতে বেচারী একখানা শাড়ি চাহিতেছে। আমির আলি তাও কিনিয়া দিতে পারে নাই।

জরিনার ডাকে তার চিন্তায় বাধা পড়িল।

জরিনা বলিল: সেই বুড়া খলিফা তোমার সাথে দেখা করতে চায়।

যে শত শত গরিবের টাকা লইয়া আমির আলি শিল্প-সংঘ করিয়াছিল, বুড়া রজব আলি খলিফা তাদের একজন। রাস্তাঘাটের তাগাদায় সুবিধা না হওয়ায় ইদানীং বুড়া সকালে-বিকালে বাড়ি চড়াও করিতেছে। লোকটার কথাবার্তা এবং চোখ-মুখের ভাব আজকাল আমির আলির ভাল লাগে না। ভয় হয়। এতদিন মামলার তারিখ দেখাইয়া তাকে ফিরাইয়াছে। আজ আর কি বলিবে?

তাই স্ত্রীকে বলিল: এই সুসংবাদ লৈয়া আসছ? কেন, তুমি এক ছুতায় লোকটারে বিদায় করতে পারলা না?

জরিনা: অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই গেল না।

আমির: মিথ্যা কথা। তুমি চেষ্টা করলে তারে বিদায় করতে পারতা না, এটা আমি বিশ্বাস করি না।

জরিনা: বিশ্বাস কর না? তবে কি আমি লোকটারে কইয়া খাড়া রাখছি?

আমির আলি গর্জিয়া বলিল: হাঁ, আমারে অপমান করবার মতলবে। তুমি আমার অপমান দেইখা আজকাল আরাম পাও। নইলে ঐ বুড়াকে খাড়া না রাইখা তারে সোজা ওসমান সরকারের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে পারলা না? আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী সেই শয়তানটাই না?

জরিনার ধৈর্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। সে বলিল: নিজের দুরবস্থার লাগি পরকে দায়ী কৈরা তুমি যদি তসল্লি পাইবার চাও, তবে আমার দুরবস্থাটার কথাটাও একটু ভাইবা দেখ।

আমির ঃ ও, বুঝতে পারছি ; আবার তুমি তোমার টাকার খোঁটা দিতাছ।

সে গলা আরো বাড়াইয়া বলিল ঃ আমি কসম খাইয়া কইতাছি, তোমার টাকা আমি যেমনি পারি ফিরাইয়া দিমু। না যদি দেই, তবে আমি বাপের পয়দা না।

জরিনা বিদ্রূপ করিয়া বলিল ঃ যা পারবানা, তা লৈয়া শুধুশুধি কসম খাইও না। আমি কি আমার টাকা ফেরত চাইছি ? যারা তাগাদা কৈরা পিঠের চামড়া তুইলা ফেলতাছে, তারার টাকাই দিতে পার না, তাতে আবার ঘরের বৌএর টাকা দিয়া দিবা। হেঃ, কইলেই হৈল। অত যদি ক্ষেমতা থাকে, আমার বুড়া বাপের টাকাটা দিয়া ফেললেই হয়।

আমির আলি এসব কথা না শোনার ভান করিয়া রহিল। কারণ এর সব কথাই সত্য। আমির মিঞার শ্বশুর ডেংগু বেপারী বি-এ-পড়া জামাইর কাছে মেয়ে দিবার সময় পাঁচ শ টাকার গহনা ও নগদ পাঁচ শ টাকা দিয়াছিলেন। আমির আলি স্ত্রীকে অনেক মুনাফার লোভ দেখাইয়া এই টাকাটা কারবারে খাটায়। তারপর শিল্প-সংঘের বাবত, ইটের কারখানা বাবত কিস্তে কিস্তে শ্বশুরের কাছ হইতে বার-শ টাকা নেয় শ্বশুরকে এক বছরে লক্ষপতি করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া। ডেংগু বেপারী জয়েনশাহীর কাঠের কারবার করিয়া বেশ টাকা-কড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র ছেলে গাঁজাখোর লুচ্চা-বদমায়েশ হওয়ায় ঐ কারবারের উপর তাঁর বেশী ভরসা ছিল না। কাজেই নগদ টাকাটা বি-এ-পড়া জামাইর কারবারে দিতে তাঁর বিশেষ আপত্তি হয় নাই। শিল্প-সংঘ যখন ফেল মারে, তখন জামাইর যোগ্যতায় তাঁর খানিকটা সন্দেহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাবধান হইতে পারেন নাই। কারণ যেভাবে রাজ্য-শুদ্ধ লোক তাঁর জামাইকে বিপদে ফেলিয়া জেলে পাঠাইবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠে, তাতে ডেংগু বেপারী নিজের টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন নাই। বরঞ্চ নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁকে জামাইর সমর্থনই করিতে হইয়াছিল। সততার সাক্ষ্য দিয়া মুখে মুখে তার পক্ষে প্রচারও করিতে হইয়াছিল এবং জামাই যাতে ইটের কারখানা হইতে শিল্প-সংঘের লোকসান পোষাইয়া

লইতে পারে, সেই আশায় সেখানে তাঁকে আরো টাকা ঢালিতে হইয়াছিল।

এইভাবে ডেংগু বেপারীর বার শ টাকা, তাঁর মেয়ের পাঁচ শ টাকা আমির আলির কারবারে হজম হইয়া গিয়াছে। এসব উদ্ধারের আর কোনো আশা নাই। তার উপর মামলা চালাইতে গিয়া মেয়ের বাক্সের এবং শেষে গায়ের সব কখানা গহনাও গিয়াছে।

এমন অবস্থায় স্ত্রীর মুখে টাকা-পয়সা বা অভাব-অনটনের কথা শুনিলেই আমির আলি মনে করিত স্ত্রী ঐ টাকার খোঁটা দিতেছে। তাতে সে চটিত এবং গর্জন করিয়া কসম খাইত যে, স্ত্রী ও তার বাপের টাকার পাই-পয়সা পর্যন্ত সে শোধ দিবে। যদি তাঁরা চান, তবে সুদও দিতে সে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সব কসম অর্থহীন আস্ফালনই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমির আলির কসম খাওয়া কমে নাই।

কারণ আমির আলির বিশ্বাস ছিল, সে একদিন সমস্ত লোকসানের টাকা সুদে-আসলে ফিরিয়া পাইবে। কেন পাইবে না? সে ত বদমায়েশি করিয়া মদ-মাগিতে টাকা উড়ায় নাই, সে ত কারো টাকা আত্মসাৎ করিবার কুমতলব কখনো পোষণ করে নাই, সে ত একটা পয়সাও অপব্যয় করে নাই। সে চাহিয়াছে গরিব জনসাধারণের ভাল করিতে, সে চাহিয়াছে সমবায় পদ্ধতিতে চাষী-মজুরকে কল-কারখানার মালিক বানাইতে। তার স্কীমও ছিল মোষ্ট সায়েন্টিফিক্। তবু যে তার কারবার ফেল মারিল, সে দোষ ত তার নিজের নয়। সে দোষ হইল এ অঞ্চলের স্বার্থপর ব্যবসাদার বড়লোকদের। ওদের ষড়যন্ত্রই আজ সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু বরাবরই সফল হইবে তার কি মানে আছে? অন্যান্য দেশেও জনসাধারণের মুক্তি-আন্দোলন প্রথম প্রথম ব্যর্থ হইয়াছে, পরে সফল হইয়াছে। আর সব দেশে যা সম্ভব হইয়াছে, এদেশে তা সম্ভব হইবে না কেন? নিশ্চয় হইবে। যখন হইবে, তখন আমির আলিই হইবে সে আন্দোলনের নেতা। তখন এই ষড়যন্ত্রকারীদের থোঁতামুখ ভোঁতা হইয়া

যাইবে। আমির আলি তখন সকলের পাই-পয়সা শোধ করিয়া দিবে।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া জরিনা বুঝিল, সে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। সে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া পাকঘরে চলিয়া গেল।

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বোধ হয় রজব খলিফার কানে গিয়াছিল। তাতে বোধ হয় সে তার টাকা পাওয়া সম্বন্ধে আপাততঃ নিরাশ হইয়াছিল। অথবা এদের অবস্থায় তার দয়া হইয়াছিল।

তাই অবশেষে আমির আলি যখন খলিফার সাথে দেখা করিবার মত সাহসে বুক বাঁধিয়া বাহিরে আসিল, ততক্ষণে রজব খলিফা চলিয়া গিয়াছে। আমির আলির বুকের উপর হইতে একটা পাথর নামিয়া গেল। পাওনাদারকে এড়াইতে পারা যে কত আরামদায়ক, আমির আলি ইদানীং তা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। কিন্তু আজিকার আরামের সাথে তার অতীতের কোনোদিনের আরামের তুলনা হয় না।

শিস দিতে দিতে সে বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল: জরিনা, তুমি অত চেষ্টা কইরা যারে বিদায় করবার পারছিলা না, আমি এক কথায় তারে বিদায় কৈরা দিলাম।

জরিনা আসল ব্যাপার জানিত। সে কোনো জবাব দিল না।

ছাব্বিশ

পরদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আমির আলি গ্রামেই কোথাও কি কাজে গিয়াছে। জরিনা ছেলেমেয়েদের গোসল-খাওয়া সারাইয়া নিজে এইমাত্র খাওয়াটা সারিয়া উঠিয়াছে। শরীরটা ক্লান্ত বলিয়া একটু গড়াগড়ি দিয়া লইবে কিনা ভাবিতেছে।

এমনসময় উঠানে কাশির শব্দ শোনা গেল। উঠানে খেলা-রত পোলা-পানরা 'নানা' 'নানা' বলিয়া জিকির দিয়া উঠিল।

জরিনার বাবা ডেংগু বেপারী আসিয়াছেন।

'মা জরিনা কই গো'—বলিয়া ডেংগু বেপারী বারান্দায় উঠিলেন। জরিনা

আগাইয়া আসিয়া বাবাকে অভ্যর্থনা করিল। বসিবার জন্য একটি জলচৌকি টানিয়া দিল।

ডেংগু বেপারী পুরা ছয়ফুট লম্বা মানুষ। লম্বার তুলনায় শরীরটা মোটা-তাজা না হইলেও হাত-পায়ের হাড়গুলি মোটা-সোটা। গালের হাড়গুলি উঁচা উঁচা, কান দুটা বড় বড়। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুলগুলি সাদা। বয়সের জন্যই ঘাড়টা একটু গোঁজা হইয়া গিয়াছে।

হাতের লাঠিটা কোলের উপর রাখিয়া বেপারী সাহেব জলচৌকির উপর বসিলেন। বলিলেনঃ দামাদ মিঞা বাড়ি নাই?

জামাই বাড়ি নাই শুনিয়া তিনি যেন একটু খুশীই হইলেন। জরিনা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল বাবা টাকার তাগাদায় আসিয়াছেন। এতে সে বাবার অবিবেচনায় খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। মাত্র দুদিন আগে জামাই মামলায় হারিয়াছে, এরই মধ্যে শ্বশুর আসিয়াছেন জামাইকে টাকার তাগাদা দিতে! ব্যাপারটাই জরিনার কাছে নিতান্ত অশোভন ঠেকিতেছিল। জামাই বাড়ি নাই শুনিয়া তিনি খুশী হওয়ায়, অন্ততঃ অসন্তুষ্ট না হওয়ায় জরিনার সে সন্দেহ দূর হইল। যাক্, তার বাবা তা হইলে টাকার তাগাদায় আসেন নাই।

কিন্তু জরিনার সমস্ত আনন্দ মাটি করিয়া দিয়া তার বাপ গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেনঃ বেটার মতলবখানা কি? সে কি আমারে বুড়া বয়সে আসাম না পাঠাইয়া ছাড়ব না?

জরিনার ইচ্ছা হইল বাপের এই নীচতার জন্য তাঁকে দুকথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। বলিলঃ বিশ্বাস কর বা'জান, তোমার টাকাটা দিবার লাগি বেচারা জান-পরাণে চেষ্টা করতাছে। কারবার ত বন্ধ, সেটা তুমি জান। কোনোখানে ধার-কর্যাও পাওয়া যাইতাছে না।

জরিনার গলায় অভিমান ফুটিয়া উঠিল। সম্ভব হইলে সে এই মুহূর্তে সব টাকা বাপের নাক বরাবর ছুড়িয়া মারিত।

ডেংগু বেপারী সেদিকে লক্ষ না করিয়া বলিলেনঃ হুম্, এই কম্‌বখ্‌তেরে

ধার-কর্য দিবার লাগি মানুষে টাকার থলি লৈয়া বইসা রইছে। কেন দিব? কোন্ ভরসায় দিব? শোধ দিবার এর ক্ষেমতা আছে?

জরিনা: দিতে চায় অনেকেই। কিন্তু ঐ দুশমনেরা, ওরা সব জায়গায় গিয়া ভাঙানি দেয়। মুল্লুকের সব লোকেই ত দুশমনি করতাছে। একলা বেচারা সামলাব কোন্ দিক?

বেপারী সাহেবের যেন মনে হইল "মুল্লুকের সব লোকের" মধ্যে তাঁর মেয়ে তাঁকেও ফেলিয়া খোঁচা দিতেছে।

তিনি গলা উঁচা করিয়া বলিলেন: কেন বেটা গেল সারা মুল্লুকের লোকেরে দুশমন বানাইবার? নিজের আওকাতের কি সে আন্দায পাইছিল না? আমি তারে কইছিলাম দুনিয়ার মানুষেরে দুশমন বানাইবার? আমার টাকা মারা যাইব কেন?

জরিনা: গেছে কি আর সাধ কইরা? ওরাই ত আগে আসছে দুশ্‌মনি করবার? গরিব জনসাধারণের ভালা করবার গিয়া ত বেচারা বড়লোকদের চোখের কাঁটা হৈছে।

ডেংগু বেপারী জামাইর মুখে হামেশাই এই 'গরিব জনসাধারণের' কথা শুনিয়া আসিতেছেন। শুনিয়া শুনিয়া তিনি ত্যক্ত হইয়া গিয়াছেন। নির্বোধ মেয়ের মুখে এই মুখস্থ-করা কথাটা শুনিয়া তিনি মুখ বেঁকা করিয়া হাসিলেন। বলিলেন: কথায় কয়, নিজের টুইএ ছাউনি নাই, পরের ঘরের ছাপরবন্ধি। জানস্ জরিনা, আজকালের লেখাপড়া-জানা পোলাপানের এই মস্তবড় একটা ব্যারামে ধরছে। যার ঘরের ডেগচি যত শূন্য, সে তত যায় পরের বাড়ি পোলাও পাকাইতে। আমি কই, ওরে বেকুফের দল, তোরা নিজে মাগ-পোলারে পাল্‌তে পারস্ না, পরের ভালা করবার চাস কোন্ মুখে?

জরিনা চুপ করিয়া রহিল। বুড়া একটু দম নিয়া ব্যংগপূর্ণ হাসি হাসিলেন। আবার বলিলেন: হেঃ হেঃ হেঃ, গরিব জনসাধারণ! বড় বাহারের কথাটা! কত বদমায়েশ এই কথা কইয়া ব্যবসা করতাছে। কত বেটা গরিব জনসাধারণের দোহাই দিয়া ভোট লৈয়া উযির নাযির

হৈতাছে। আমি দেখি আর হাসি। কইনা কারেও কিছু। কইমু কারে? কার লাগি কমু? এই গরিব জনসাধারণ বেটারাও মস্তবড় বোকারাম। ভালা ভালা বক্তৃতা শুইনাই বেটারা খুশী। খাবার ধান-চাল লাগে না, পরার কাপড়-চোপড় লাগে না। খালি বক্তৃতা। বক্তৃতা শুইনাই এই বেটা গরিব জনসাধারণদের পেট ভরে। শোনার লায়েক দুচারটা বক্তৃতা যদি দিবার পার, তবে আর কথা নাই। সব বেটা ভেড়ার পালের মত ভোট দিয়া যাইব তোমারে।

এমন জোরালো বক্তৃতা করিয়া বেপারী সাহেব থামিলেন। একটু দম লইয়া এবং মেয়ের উপর বক্তৃতার আছরটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গলাটা একটু নামাইয়া মেয়ের দিকে একটু ঝুঁকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন: আমি আশা কৈরা আছি, দামাদ মিঞাও আর দশটা বুদ্ধিমানের মত গরিব জনসাধারণের কথা কইতাছে একটা এম-এল-এ কিম্বা অন্ততঃ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মেম্বর-টেম্বর হৈবার লাগি। তাইতে বেটারে আমি কিছু কইছি না। টাকা-পয়সা দিতেও ভয় করছি না। অখন দেখি, ও খোদা! বেটা একটা বেল্লিকের বাচ্চা বেল্লিক। এমন ভালা ভালা কারবারগুলা দেখতে দেখতে ডুবাইয়া দিল।

বলিতে বলিতে বেপারী সাহেবের বোধহয় নিজের টাকাগুলার কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি আবার গলা উঁচা করিয়া বলিলেন: তা তুই যদি মরবিই ত মর গিয়া নিজের চৌদ্দ গোষ্ঠি লৈয়া। আমারে লৈয়া টানাটানি কেন? আমার টাকাটা ফিরাইয়া দে। আর সব টাকা না হয় পরে দে, অন্ততঃ শেষের দুই শ টাকা এখন দিলেও ত আমি কোনোমতে খাযনার ডিক্রিটা শোধ দিয়া বাড়ি-ভিটাটা বাঁচাইতে পারি।

জরিনা এতক্ষণে বাপের যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিল। আন্তরিক কাকুতি করিয়া সে বলিল: বিশ্বাস কর বা'জান, তোমার এই দুই শ টাকা আমরা শীগ্‌গির দিয়া দিমু। এই টাকাটার লাগিই বেচারা না খাইয়া না দাইয়া দিনরাত ছুটাছুটি করতাছে।

ডেংগু বেপারী মেয়ের কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তাচ্ছিল্যভরে

বলিলেন : রাইখা দে তোরার শীগ্‌গির। এই টাকাটা আনছিল সে একমাসের করারে। আজ হৈয়া গেছে এক বছর। বেটার একমাস আর হৈল না। আর ও টাকা দিব আমার? তুই আমারে বোকা বুঝাইবার চাস?

জরিনা আরো নরম হইয়া বলিল : ওয়াদা খেলাফের ইচ্ছা তার আছিল না বা'জান। তোমার কাছে ওয়াদা খেলাফ কৈরা বেচারা শরমে আর বাঁচে না। কতদিন আমার কাছে আফ্‌সোস কৈরা কইছে, 'মিঞাসাবের কাছেও মিথ্যাবাদী সাজলাম! তাঁর কাছে আমার আর মুখ দেখাইবার পথ থাকল না।' চিন্তায় চিন্তায় চেহারাটা তার কি হৈছে সেটা দেখতাছ ত?

বেপারী সাহেবের মেযাজ খারাপ হইয়া গেল। এমন বদমায়েশ খসমেরও তারিফ করে! জরিনাটা কি মানুষ না? তিনি রাগ করিয়া বলিলেন : চেহারা আমার খুব দেখা আছে। দিন দিন খাশির মত তাজা হৈয়াই চল্‌ছে। ওসব বাজে কথা আমারে কইস না। তার চেয়ে নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখিস ত। তা আয়নাও কি এ-বাড়িতে আছে?

বূড়া এবার নড়িয়া-চড়িয়া যেন শক্ত কথা বলিবার জন্য শক্ত হইয়া বসিয়া লইলেন। বলিলেন : শোন্ জরিনা, তোর মুখের দিকি আমি আর চাইবার পারি না। তোর মা বাঁইচা থাকলে আমার মুখে ঝাঁটা মারত। সে এই কম্‌বখ্‌তের কাছে কিছুতেই তোর বিয়া দিতে চাইছিল না। অখন বুঝতাছি মা, সে আছিল একটা গণক। তার কথা না রাইখা ভুলই করছিলাম।

জরিনা এ-ধরণের কথা পসন্দ করিতেছিল না। সে বাপের কথায় বাধা দিবার কয়েকবার চেষ্টাও করিয়াছে। এইবার কথার ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়া সে বলিল : ইসব কথা কইও না বা'জান, আমি ইসব পসন্দ করি না।

বেপারী সাহেব মেয়ের ইশারার নসিহতটা বুঝিলেন। মনে মনে বোধহয় শরবিদ্ধও হইলেন। সেজন্য সুরে একটু কৈফিয়তের ভাব আনিয়া বলিলেন : কইমু যে না, তোরে কি আমি এইরকম কৈরা পালছিলাম? এই কষ্ট তোর শরীরে সইব?

জরিনা : কি করবা? সব আমার তক্‌দিরে লেখা আছিল। তুমি ফিরাইবা কেমনে?

বেপারী সাহেব যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি উৎসাহে বলিলেন: তোর তক্‌দিরের দোষ না মা, ইটা আমার আক্কেলের দোষ। আমিই এটার একটা হেস্তনেস্ত করবার চাই।

জরিনা কৌতুহলী হইয়া বলিল: কি করবার চাও?

ডেংগু: তোমরারে আমার কাছে লৈয়া যাইবার চাই। মাথা নাড়িস না, আগে শুইনাই ল। আমি আসামে জমি রাখছি। আবার গিরস্তি শুরু করমু সেখানে।

গলায় দরদ আনিয়া বেপারী সাহেব আবার বলিলেন: এই বুড়া বয়সে আবার নতুন সংসার পাতবার চাই মা, তোর পোলাপান লৈয়া। তুই লৈবি আমার বাড়ির ভার। আর আমি আমার নাতিরারে লৈয়া চালাইমু গিরস্তি। বিশ্বাস করস না? এই হাতে-পায়ে এখনো অনেক বল আছে। তোর 'না' আমি মানমু না। আমি মনে মনে ঠিক কৈরাই আসছি। আমার নাতিরা এখানে উপাস করব, আর আমার জোত-জমি খাইব পরের মানুষে, এটা আমি হৈতে দিমু না।

জরিনা: কেন, মিঞা ভাই যাব না তোমার সাথে?

ডেংগু: তুই পাগল হৈছস জরিনা? সেই হারামযাদারে সাথে নিমু আমি? ওই শয়তানই ত আমারে ডুবাইছে। নইলে বুড়া বয়সে আমার এ যিল্লতি কেন? ওর উপরে আমার আর একরত্তি বিশ্বাস নাই। তাছাড়া, সে যাবও না আমার সাথে। সে তার শ্বশুরবাড়িই যাব ঠিক করছে। শালা-সম্বন্ধীরার সাথে তার বন্‌বও ভালা। একদলের বদমায়েশ ত। ওর কথা বাদ দে। তোরা যাবি কিনা ক।

জরিনা: ওঁর এই বিপদের সময়। অখন গেলে মানুষে কৈব কি?

ডেংগু: মানুষের কথায় হৈব কচু। মানুষে কি তোরে খাইবার দিতাছে?

জরিনা: মানুষের কথা ছাইড়াই দেও। উনি নিজে কৈব কি?

ডেংগু: সে হারামযাদার কিছু কইবার মুখ আছে? সে তোরারে পালবার পারতাছে? অই নাবালকগুলার কি দশা হৈছে একবার দেখ্ ত।

জরিনা : যতদিন পারছে, ছেলেরারে রাজার হালেই ত রাখছে। অখন একটা বিপদে পড়ছে, তাইতে এই রকম। বিপদ-আপদ সকলেরই হয়। খোদা আমরারে আবার সুদিন দিব।

ডেংগু : যেদিন দিব, সেদিন আবার ফিইরা আইস্, আমি মানা করমু না।

জরিনা : সেটা কি ভাল দেখাব বা'জান? দুঃখের দিনে গেলাম, আর সুখের দিনে ফিইরা আস্লাম। এটা কি মান্ষের কাজ হৈব? জরু করিলা কি মান্ষের খালি সুখের দিনের লাগি?

লেখাপড়া-জানা মেয়ের নিকট অশিক্ষিত বাপ তর্কে হারিয়া গেলেন। কাজেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি ধমক দিয়া বলিলেন : তোর সাথে আমি তর্ক করবার চাই না। আমি অতশত বুঝিও না। আমার এক কথা। তোরা আমার সাথে যাবি কিনা? যাবি ত কইয়া দে, গাড়ি ডাকাই। না যাবি ত নিজের পোড়া কপাল লৈয়া থাক। আমার কি?

বলিলেন বটে তাঁর কিছু না, কিন্তু উত্তরের জন্য প্রবল আগ্রহে মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। জরিনা কোনো উত্তর দিল না দেখিয়া বেপারী সাহেব আবার বলিলেন : ক হারামযাদী, তোর জবাব 'হাঁ' কি 'না'।

বাপের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া দৃঢ়স্বরে জরিনা বলিল : না।

বেপারী সাহেব রাগে ঠোঁট কামড়াইলেন। বলিলেন : আমি উঠলাম। বুড়া বয়সে আমার বরাতে দুঃখু আছে, সেটা ছাড়াইমু কেমনে? পুতেই ছাইড়া দিছে, আর ঝি? সে ত পরের মানুষ।

—বলিয়া বেপারী সাহেব লাঠিটা হাতে লইয়া সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জরিনা ইতিমধ্যে পান বানাইয়া পানদানটা বাপের সামনে রাখিয়া দিয়াছিল। পান না খাইয়াই বাবা উঠিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সে পানদানটা উঁচা করিয়া ধরিয়া বলিল : পানটা খাইলা না বা'জান?

ডেংগু বেপারী গর্জন করিয়া বলিলেন : মারি লাথি তোর পানের মুখে। তোর হাতের পানিও যদি আমি জীবনে আর খাই।

—বলিয়া বুড়া দম্‌দম্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। উঠানে নাতি-নাতনীরা নানাকে ঘিরিয়া লুংগি ধরিয়া বলিল : নানা, তোমরার বাড়ি

যামু। বুড়া তাদেরে ধাক্কা মারিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেমেয়েরা নানার এই অহেতুক রাগে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল।

কয়েকখান বাড়ি পরেই জামাইর সাথে তাঁর হঠাৎ দেখা। জামাই অভ্যাসমত নীরবে শ্বশুরের কদমবুসি করিল। শ্বশুর থামিয়া সেলাম লইয়া 'ভালা আছ ত?' বলিয়া আবার পথ নিলেন। আর একটি কথাও বলিলেন না।

আমির আলি অবাক হইয়া শ্বশুরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার বাড়িমুখো রওনা হইল। পথ চলিতে চলিতে সে ভাবিল, যে শ্বশুর রাস্তাঘাটে গালাগালি ও টাকার তাগাদা না করিয়া একদিন ছাড়েন না, মামলার দিন তদবির করিতে আসিয়া কোর্টের মধ্যে টাকার তাগাদা করিতে ভুলেন নাই, সেই শ্বশুরই আজ এমন কায়দায় পাইয়াও একটা কথা না বলিয়া জামাইকে ছাড়িয়া দিলেন! ব্যাপারটা কি? জরিনা আজ এমন কি দাওয়াই দিয়াছে? সে কিছুই আন্দাজ করিতে পারিল না। কিন্তু জরিনার উপর সে খুব খুশী হইল। যা হোক, জরিনার বুদ্ধির তারিফ করিতেই হইবে।

বাড়িতে ঢুকিয়াই সে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলঃ শুন্‌ছ জরিনা, একটা মস্তবড় খোশ-খবর আছে।

জরিনা প্রবল আগ্রহে ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল : কি?

আমির : সামনের শুকুরবারে এ অঞ্চলের তামাম বর্গাদার এক জোট হইয়া তেভাগার মিছিল বাইর করব ঠিক করছে। মিছিলটা ওসমান সরকারের বাড়ির সামনে পাঁচ মিনিট থাকব; ওসমান সরকারের মুর্দাবাদ দিয়া হৈহল্লা করব।

স্বামীর হাসিভরা মুখ হইতে জরিনা অন্যরকম সুখবর শুনিবার আশা করিয়াছিল। নিরাশ হইয়া সে বলিল : তা হোক, কিন্তু তুমি ওর মধ্যে নাই ত? খবরদার, তুমি ওসবের মধ্যে যাইও না। আগে নিজের বিপদটা সামলাও।

আমির : আমি যামু কেন? আমি কি কারো বর্গাদার নাকি? কিন্তু কথাটা যখন তুমি তুললাই, তখন পুছ করি তোমারে। যাইতামই যদি আমি ওর মধ্যে, তবে অন্যায়টাই বা কি হৈত? বর্গাদারদের দাবী ত আর অন্যায় না।

জরিনা যা সন্দেহ করিয়াছিল, তবে তাই? তার রাগ হইল। 'হুম্, সবই আমি বুঝতে পারছি।'—বলিয়া সে পাকঘরের দিকে চলিয়া গেল। না, জরিনা এই লোকটাকে লইয়া আর পারে না। লোকটার আদৎই খারাপ। যার নিজের বিপদের সীমা নাই, নিজেই কয় যে তার এক পা জেলে, সে কেমন করিয়া পরের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া বেড়ায়? কই, নিজের মুসিবতের লাগি আল্লার কাছে মুনাজাত করিবে, এদিক-ওদিক ডাইনে-বাঁয়ে একটু চেষ্টা-চরিত্র করিবে; তা না, কোন্‌দিক দিয়া কার অনিষ্ট হইবে, কেবল সেই ভাবনা।

স্বামীর প্রতি তার ঘৃণা বাড়িয়া গেল। সে জানে এটা অন্যায়। তার স্বামীকে যখন দুনিয়ার সবাই ঘৃণা করিতেছে, সেই সময়েই তাকে আরো বেশী করিয়া শ্রদ্ধা করা জরিনার উচিত। সে চেষ্টাও সে করিতেছে গত কিছুদিন ধরিয়া। স্বামীর অসাধুতায় তার প্রতি জরিনার যতই ঘৃণা হইতেছে, ততই জরিনা নিজের মনকে শাসাইতেছে। স্বামীকে ভালবাসিবার, তার উপকার করিবার চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছে। স্বামীর পক্ষে মিছা কথা সে বানাইয়া বলিতেছে। সবই সে করিতেছে স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য কিন্তু তার স্বামী নিজে যদি বাঁচিবার চেষ্টা না করে, তবে জরিনা মেয়ে-মানুষ হইয়া কি করিয়া তাকে বাঁচাইতে পারে? লোকটা খালি পরের দোষ দেয়। কিন্তু পরে তার স্বামীর অনিষ্ট যত না করিয়াছে, তার স্বামী নিজের অনিষ্ট নিজে করিয়াছে তার দশগুন।

না, এমন লোকের সাথে থাকা চলে না। বাপের কথা মানিয়া তাঁর সাথে চলিয়া যাওয়াই জরিনার উচিত ছিল। সে কি তবে ভুল করিয়াছে? ডাকাইয়া আনিবে আবার বা'জানকে?

স্ত্রী তার সব কথা না শুনিয়াই অমন মুখ বেঁকা করিয়া চলিয়া যাওয়ায়

আমির আলি স্ত্রীর উপর বেজার হইল। অল্পক্ষণ আগেই জরিনার বুদ্ধি-আক্কেলের উপর তার যে শ্রদ্ধা হইয়াছিল, এক মুহূর্তে সব ধুইয়া মুছিয়া গেল। 'সবই বুঝতে পারছি।' হেঃ, কি কচুটা সে বুঝিয়াছে? সে ধরিয়া লইয়াছে মিছিলের সব আয়োজন তার স্বামীই করিয়াছে; আর মিছিল করাটাই একটা বদমায়েশি। তার স্বামী ছাড়া এমন বদমায়েশি আর কে করিবে? কেন এই সন্দেহ? আমির আলি ত সত্যসত্যই মিছিলের মধ্যে নাই। সে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়াছে সত্য, কিন্তু লোকে বুদ্ধি চাইতে আসিলেও আমির আলি দিবে না? কাজটা ত অন্যায় নয়। বর্গাদারদের হক ত তেভাগার চেয়েও বেশী হওয়া উচিত। আর মিছিলের শ্লোগান তৈয়ার করিয়া দেওয়া? সেটা যদি আমির আলি করিয়াই দিয়া থাকে, তবে তা ত অন্যায় হয় নাই। সে ওটা না করিয়া দিলে অশিক্ষিত বর্গাদাররা ওসব কথা পাইত কোথায়? ওরা লেখাপড়া জানে না, সেটা কি ওদের দোষ? আমির আলি যা করিয়াছে ঠিকই করিয়াছে।

সাতাশ

ওয়াজেদ এখন আরোগ্যের পথে। সে উঠিয়া বিছানায় বসিতে পারে। বালিশে ঠেঁশ দিয়া বসিয়া বসিয়া সে ঘরের আসবাব-পত্রের দিকে, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। সবই তার কাছে নূতন লাগে। গোটা পরিবেশটাই যেন নূতন। ওয়াজেদের যেন নূতন জন্ম হইয়াছে। সে যেন সদ্য-জাত শিশু। শিশুর মতই তাকে কাপড়ে-চোপড়ে জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। সে কাপড়-চোপড়ও অপরে পরাইয়া ও নাড়া-চাড়া করিয়া দেয়। গা ধোওয়া-মোছার কাজে শিশুর মতই সে বেয়াড়াপনা করে। কেউ তার মুখ ধোয়াইতে ও দাঁত মাজিয়া দিতে আসিলে শিশুর মতই সে কান্নাকাটি করে। এসব কাজে শিশুকে যেমন যবরদস্তি করিতে হয়, ওয়াজেদের বেলাও ঠিক তাই। মা হাতে করিয়া যা তুলিয়া দেন, ওয়াজেদকে তাই খাইতে হয়। ওয়াজেদ সত্যই শিশুর মতই অসহায়। সত্যই সে শিশু। ওয়াজেদ মনে মনে হাসে।

এমন গুরুতর রোগ হইতে মুক্তিলাভ নূতন জন্ম ছাড়া আর কি? অতীত জীবন এখন একটা স্বপ্নমাত্র। ওয়াজেদের মনে হয়, তার অতীত জীবনে আর বর্তমান জীবনে কতই যেন পার্থক্য। সে জীবন ভয়াবহ, এ জীবন মধুর। দুই জীবনের মধ্যে যেন কত যুগের ব্যবধান! মাঝখানে যেন বিস্মৃতির একটা জমাট-বাঁধা অন্ধকারের কুহেকাফ। সেই কুহে-কাফের ওপার হইতে প্রথমে ক্ষীণ ক্ষীণ আওয়ায ওয়াজেদের কানে আসিতে লাগিল। ক্রমে সে অন্ধকারের রন্ধ্র-পথে স্মৃতির ক্ষীণ আলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা ঘটনাবলী তার মনের কোণে উঁকি মারিতে লাগিল। প্রথমে সেগুলি খুবই আবছা ছিল, এখন একটু দানা বাঁধিতেছে। কিন্তু ও-সব ঘটনা ওয়াজেদের ভাল লাগে না। তার মন ওদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। আবার ঐগুলি অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

দিন যায়। ওয়াজেদের হাতে-পায়ে রোজই কিছু কিছু বল বাড়ে। আজ সে নিজের বলেই বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারে। কাল সে বালিশে ঠেঁশ না দিয়াই বসিয়া থাকিতে পারে। দুদিন বাদে সে পালংএর রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে। পা যদিও কাঁপে, দুদিন বাদে তাও ঠিক হইয়া যায়। তারপর শিশুর মত 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করিয়া সে ঘরের মেঝেয় হাঁটাও শুরু করে।

ওয়াজেদের মনে আজ কত আনন্দ! নিজের বাড়িতে নিজের মা-বোনের সাথে, তাঁদের স্নেহাদরের মধ্যে বাস করার কি সুখ! অধীর আগ্রহে সে দিন গণিতেছে কবে সে বাহিরে যাইতে পারিবে, সকলের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া কথা বলিয়া বাড়ির দশজনের একজন হইতে পারিবে। কবে?

এখন চিন্তাও সে করিতে পারে। তার যে অসুখ হইয়াছিল, সে অসুখে অনেকদিন যে সে ভুগিয়াছে, এসব কথা সে গোছাইয়া ভাবিতে পারে। অসুখের আগের জীবন ধোঁয়াটে হইয়াই আছে বটে, কিন্তু অসুখের সময়কার কোনো-কোনো কথা তার বেশ মনে পড়িতেছে। এই সবের কোনো-কোনোটা তার কাছে খুব মধুর লাগে। মনে হয় স্বপ্নই হইবে। কিন্তু যদি সত্য হইত!

ওয়াজেদের মনে হয় তার অসুখের সময় বেহেশ্‌তের কোনো হুর যেন তার শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছিল। মা ও বুবুর পাশে বসিয়া যেন কে আরেকজন তার সেবা করিয়াছে। মা ও বুবুর সেবায় ওয়াজেদ নিশ্চয়ই আনন্দ পাইয়াছে; কিন্তু ঐ যে আরেক জন, তার সেবায় ওয়াজেদের শরীরে যেন পুলকের রোমাঞ্চ হইয়াছে।

এ হুর কে? ওয়াজেদের একটা ধারণা আছে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কেন সে আসিয়াছিল? এখন কেন আসে না? জানিবার জন্য মন তার খুবই চঞ্চল হয়। কিন্তু জানিবে কিরূপে? কাকে পুছ করিবে?

একদিন সুযোগ আসিল। যায়েদা ওয়াজেদের হাত-পা স্পঞ্জ করিয়া দিতেছে। সে শিশুর মত আপত্তি ও আহা-উহু করিতেছে; মাঝে মাঝে হাত-পা টানিয়া লইতেছে।

যায়েদা সস্নেহে তিরস্কার করিয়া করিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। ওয়াজেদ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে বোনের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আহা, বেচারা খাটিয়া খাটিয়া কতই না রোগা হইয়া গিয়াছে। এদেরই সাথে সে না বিশ্বাসঘাতকতা করিতে গিয়াছিল! এঁদের হাতের সেবা নিবার তার কোনো অধিকার নাই। তবু এঁরাই তার সেবা করিতেছেন। তার চোখে পানি আসিল। বলিল: বুবু, আপনাদেরে আমি কতই না কষ্ট দিলাম। খাইটা খাইটা আপনার শরীরটা কি হৈয়া গেছে! আপনেরা এমন যত্ন না করলে এ-যাত্রা আমি আর ফিরতাম না।

বোন সস্নেহ নয়নে ভাইর দিকে চাহিয়া বলিল: আমরা নিজের মানুষ, আমরা ত খাটবই। কিন্তু পরের মেয়েও যে এত খাটতে পারে, সেটা দেখাইয়া গেল লুৎফুনটা। সে আইসা না পড়লে কেমনে যে তোমারে সামলাইতাম তা ভাইবা পাইনা।

ওয়াজেদ এই সুযোগ লুফিয়া লইল। কথা অতি সহজ স্বাভাবিকভাবে উঠিয়া গেল। ওয়াজেদ তন্ন তন্ন করিয়া লুৎফুনের সেবার ইতিহাস জানিয়া লইল। যায়েদা বলিতে লাগিল এবং আড়চোখে রুগ্ন ভাইর মুখভাব লক্ষ করিতে ও মুচকি হাসিতে লাগিল।

ওয়াজেদ জানিতে পারিল যতদিন ডাক্তার সাহেব ওয়াজেদের আরোগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিততা না দিয়াছেন, ততদিন লুৎফুনকে হোষ্টেলে পাঠান সম্ভব হয় নাই। পরপর তিন দিন ওয়াজেদের গায়ে জ্বর না আসার পর নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া সে হোষ্টেলে গিয়াছে। আজো প্রায় রোজই তাকে লোক মারফৎ ওয়াজেদের খবর দিতে হয়।

সমস্ত শেষ করিয়া যায়েদা চলিয়া গেল। ওয়াজেদ চোখ বুজিয়া লুৎফুনের কথা ভাবিতে লাগিল। লুৎফুন তার মাথায় হাত বুলাইয়াছে? কপাল টিপিয়া দিয়াছে? ওয়াজেদের মনে পড়িল সত্যই তার কপালে সে অনেক সময় আরাম বোধ করিয়াছে। ওটা নিশ্চয় লুৎফুনের কপাল টিপিয়া দিবার সময়। সে চোখ বুজিয়া কল্পনায় লুৎফুনকে মাথার কাছে বসা দেখিল এবং মাথায় ও কপালে তার স্পর্শ অনুভব করিল। লুৎফুন তার পা কোলে তুলিয়া পায়ের তলায় সরিষার তৈল ও তেলাকুচির পাতা মালিশ করিয়াছে? হায়! কেন একমুহূর্তের জন্যও সে সময়ে ওয়াজেদের চৈতন্য হয় নাই? সে লুৎফুনকে পায়ের কাছে কল্পনা করিল। লুৎফুন ঐ যে তার পা কোলে তুলিয়া নিতেছে। ঐ যে তার পায়ের তলায় তেল মালিশ করিতেছে। একটা পুলক শির্ শির্ করিয়া পায়ের তলা হইতে ওয়াজেদের সর্বাঙ্গ নাচাইয়া দিল।

আরো দিন যায়। ওয়াজেদ ক্রমে সারিয়া উঠে। জীবন তার কাছে ক্রমে অধিকতর সুন্দর লাগে। এই সুন্দর জীবনের অধিকতর সুন্দর ভবিষ্যৎ সে কল্পনা করে। সেই কল্পিত সুন্দর রাজ্যের মনোরম উদ্যানের বীথিতে-বীথিতে সে যখন ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন মা ও বোন ছাড়া যে আরেকটি প্রাণীর হাসিমাখা মুখ সে নিজের পাশে দেখিতে পায়, সে মুখ লুৎফুনের। ওয়াজেদের রোমাঞ্চ হয়। জীবন তবে সত্যই এত সুন্দর, এত মধুর!

একদিন ওয়াজেদের মনে পড়িল, কই, বাবাকে ত দেখিতে পায় না। বাবার কথা মা ও বোনকে পুছ করিতে তার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তার মনে পড়ে বাবার সাথে তার যেন কি একটা গণ্ডগোল হইয়াছে। সে কপালে আঙুল টিপিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করে। আবছা-আবছা ঘটনা তার মনে

পড়ে। সে-সব যেন ভয়াবহ ঘটনা। সে-সব ঘটনার সাথে যেন বাবার না আসার সম্পর্ক রহিয়াছে। বাবার না-আসার বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই ঐ সব ঘটনা মনে পড়িতে চায়। ওয়াজেদ সেসব ঘটনা চিন্তা করিতে ভয় পায়। তাই সে বাবার কথা চিন্তা না করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু আর কতদিন চিন্তা না করিয়া পারিবে? বাবার সাথে আজ না হোক কাল তার দেখা হইবেই। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাই বাবার কথা তার মনে আসেই। তখন তার মনে পড়ে এক একটি করিয়া ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘটনা। সেসব ঘটনা মিলাইয়া ওয়াজেদ দেখে সে বাবার সাথে, সমস্ত পরিবারের সাথে দুশ্‌মনি করিবার সংকল্প করিয়াছিল।

এইজন্যই কি অসুখের গোড়ার দিকে সে মা-বোনকে দেখিলে ভয় পাইত? তাদের সেবা নিতে তার সংকোচ হইত? মনে হইত তাদের সেবা নিবার কোনো অধিকার তার নাই। তার আরো মনে পড়িল, প্রবল জ্বরের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে, আমির মিঞা তার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন: ওয়াজেদ, তুমি আমার পক্ষে সাক্ষ্য না দিলে আমার যে জেল হইয়া যাইবে। ও-কথা শুনিয়া ওয়াজেদ চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে। কত কি বলিয়াছে।

আজ জানিতে পারিতেছে। সে-সবকেই শুশ্রূষাকারিণীরা রোগীর প্রলাপ মনে করিয়াছেন।

ওয়াজেদ নিজেও আজ তাই মনে করে। সত্যই ও-সব রোগীর প্রলাপ। ওয়াজেদ আজ রোগমুক্ত। সুতরাং সে-প্রলাপের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নাই। খোদার হাজার শুকর, ওয়াজেদ ঐ বিশ্বাসঘাতকতার সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। খোদা যদি যথাসময়ে ওয়াজেদের অসুখ না দিতেন, সে যদি বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াই ফেলিত, তবে—

ওয়াজেদ আর ভাবিতে পারে না। ইস্! কি সাংঘাতিক পরিণাম! ভয়ে ওয়াজেদ চোখ বুজিয়া ফেলে।

না, ওয়াজেদ আজ বুঝিয়াছে খোদা সত্যই মঙ্গলময়। তিনি যা করেন, সত্যই মঙ্গলের জন্যই করেন।

ওয়াজেদ স্থির করিল, সে বাবার পা ছুঁইয়া মাফ চাহিবে। কিন্তু ডাকিয়া আনিয়া মাফ চাহিলে বেআদবি হইবে না? তার নিজে গিয়াই মাফ চাওয়া উচিত। তাই সে করিবে। ভাল হইয়া উঠিয়াই ঐটা হইবে তার প্রথম কাজ।

এমনি সময় সে একদিন শুনে, পরের দিন দায়রার মামলার তারিখ। শুনিয়া তার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। দরজার সামনে ইজিচেয়ারে সে বসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া সে বিছানায় গিয়া উঠিল। চিৎ হইয়া শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল।

আমির আলি আসিয়া তার শিয়রে দাঁড়াইল। তার হাতে হাতকড়ি, পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি, পরনে জাংগিয়া। স্কুলে যাইবার পথে জেলখানার বাহিরে রাস্তায়, সরকারী কপিখেতে এমন অনেক কয়েদী ওয়াজেদ দেখিয়াছে। তাদেরই একজনের বেশে আমির আলি ওয়াজেদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতকড়ি-বাঁধা হাত উঁচা করিয়া সে ওয়াজেদকে বলিল: ওয়াজেদ, তুমি ত জান আমি এ ব্যাপারে নির্দোষ। একমাত্র তোমারই সাক্ষ্য যে আমাকে জেল হইতে বাঁচাইতে পারে। তুমি কি আমাকে বাঁচাইবে না?

ওয়াজেদ শিহরিয়া উঠিল। সে ভয়ে মুখ ফিরাইয়া নিল। না না, ওয়াজেদ পারে না। নিজের বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া একটা পরিবারকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিতে সে পারে না।

আমির আলির মূর্তি ওয়াজেদের শিয়র ঘুরিয়া ওদিকে গিয়া আবার ওয়াজেদের চোখের সামনে দাঁড়াইল। সে বলিল: তুমি তোমার পরিবারের সুখের কথা ভাবিতেছ? তুমি কি জান না আমারও তিন-তিনটা নাবালক ছেলেমেয়ে আছে? আমি জেলে গেলে তারা যে রাস্তায় বসিবে, তাদের মা যে এদের হাত ধরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইবে, সে-কথা কি ভাবিতেছ না? তুমি এত স্বার্থপর?

ওয়াজেদ ওদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল। সত্যই ত। সে কি এতই স্বার্থপর? আত্মত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরীক্ষায় সে কি ফেল করে নাই? একজন নির্দোষ লোককে সে বাঁচাইতে

চাহিয়াছিল। একদিকে তার স্বার্থপরতা ও আত্মীয়প্রীতি, অপরদিকে তার কর্তব্যবোধের মধ্যে বাধিল সংঘর্ষ। সে লড়াইএ তার স্বার্থপরতারই হইল জয়। কর্তব্য হইতে সে করিয়াছে পলায়ন। কর্তব্য করিলে যাদের অনিষ্ট হইত তাদের স্নেহাদর পাইয়া সে এতই অধঃপাতে গিয়াছে যে, সে নির্লজ্জের মত ভাবিতেছে: কর্তব্য না করিয়া আমি ভালই করিয়াছি।

ওয়াজেদ স্প্রিংএর মত ছিটকাইয়া উঠিয়া বসিল। না, সে কর্তব্য হইতে এমন করিয়া পলাইতে পারে না। তার মনুষ্যত্বকে সে স্বার্থের কাছে এমন করিয়া বলি দিতে পারে না। সে আমির আলির পক্ষে সাক্ষ্য দিতে কাল দায়রার আদালতে হাজির হইবেই।

তার মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বিছানা হইতে নামিয়া মেঝেয় পায়চারি করিতে লাগিল। দুর্বল শরীরে তার ঘাম ছুটিয়া গেল। সে একটা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া সেটা খুলিয়া দিল। বাহিরের হাওয়া লাগিয়া তার শরীর অনেকটা ঠাণ্ডা হইল।

সেই জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। কাছের গাছপালা হইতে দূরের নীল আসমান সবাই তার চোখের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার স্বাভাবিক পরিণাম তার সামনে আবার স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। এই বাড়িঘর ধন-দওলৎ ছাড়িয়া তাকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আসিয়া পড়িতে হইবে। কল্পনা-নেত্রে সে আবার নিজেকে অজানা পথের সহায়-সম্বলহীন পথিকরূপে দেখিতে পাইল। সে কর্তব্যের বন্ধুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে। মায়ের স্নেহ, বাপের আদর, বোনের যত্ন সব তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সে-সব অগ্রাহ্য করিয়া শাহাদৎ-পিয়াসী ধর্ম-যোদ্ধার মতই সে দৃঢ় পদক্ষেপে রণক্ষেত্রে আগাইয়া চলিয়াছে। এই চিত্র সে আগেও দেখিয়াছে। তখন মনে হইয়াছে, সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য এ ত্যাগস্বীকার সে করিতে পারিবে।

কিন্তু আজ? আজ তার বুক ধড়ফড় করিতেছে, পা কাঁপিতেছে। কেন? তার পা আগাইতেছে না কেন? বাপ-মার স্নেহের ডাক ছাড়াও

আর একটি কিসের ডাক তার কানে পশিতেছে? সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, বাবা-মা বোনের পাশে আর একটি নতুন মুখ দেখা যাইতেছে। বাপ-মার মত সে শুধু হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে না। সে তাকে ফিরাইয়া নিবার জন্য দুই বাহু উন্মুক্ত করিয়া তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এটি লুৎফুন। বাপ-মাকে ঠেলা যায়, লুৎফুনকে ঠেলা যায় না।

ওয়াজেদ বুঝিল সে প্রেমে পড়িয়াছে। সত্যের জন্য বাপ-মার স্নেহ উপেক্ষা করা যায়, তাদের ধন-দওলৎ ত্যাগ করা যায়। কিন্তু প্রেমিকার প্রেম উপেক্ষা করা যায় না। লুৎফুনকে সে ভালবাসিয়াছে। লুৎফুন আজ হইতে তার জীবনের সাথী। যতদিন সে একা ছিল, ততদিন যে-কোনো ত্যাগের জীবন বরণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। সুখ-দুঃখ ছিল তখন তার একার ব্যাপার। আজ ওয়াজেদের দুঃখ আর তার একার নয়। আজ লুৎফুন তার সমান অংশীদার। নিজের কর্তব্যবোধের কাছে এখন আর সে দুজনের সুখ-দুঃখকে কোরবানি দিতে পারে না। লুৎফুনের জীবনের সে আজ আমানতদার, তার সুখের সে আজ জিম্মাদার। ওয়াজেদ তার কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য প্রশংসা পাইবে একা, পরোপকারের সওয়াব হাসিল করিয়া বেহেশ্‌তে গেলে সে যাইবে একা। তবে সে-কাজে বেচারা, অবলা এবং ওয়াজেদের উপর একান্ত নির্ভরশীলা লুৎফুনের জীবন বিসর্জন দিবার কি অধিকার ওয়াজেদের আছে? না, নাই। সুতরাং—সুতরাং আগামী কাল দায়রায় সাক্ষ্য দিতে আর—

ওয়াজেদের বুকের উপর হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল। কর্তব্য-পথ তার সামনে পরিষ্কাররূপে উন্মুক্ত হইয়া গেল। এই মুহূর্তে সে-কর্তব্য করা চাই। শুভস্য শীঘ্রম্। সে জানালা হইতে বিছানায় গিয়া জোরে জোরে ডাকিল: মা, মা।

বিবি সাহেব আশঙ্কায় ছুটিয়া আসিলেন। মাকে ডাকিয়াই ওয়াজেদের মনে পড়িয়াছিল, মাকে দিয়া ও-কাজ হইবে না। মা আসিতেই সে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলিল: মা, বুবুকে ডাকতে গিয়া আপনেরে ডাইকা ফেলছি। কিছু মনে করবেন না।

বিবি সাহেব হাসিয়া বলিলেন : দূর পাগল, তাতে কি হৈছে ? কি চাও ? আমারে কইবা, না যায়েদারে ডাইকা দিমু ?

ওয়াজেদ : বুবুরেই পাঠাইয়া দেন।

আটাশ

যায়েদাকে একা পাইয়া ওয়াজেদ বলিল : বুবু, বা'জান আমারে দেখতে আসেন না কেন ?

পিতা-পুত্রের ভিতরের আসল ব্যাপার যায়েদা ছাড়া এ বাড়ির আর কেউ জানিতেন না। বিবি সাহেবকে সরকার সাহেব এই বলিয়া বুঝ দিয়াছিলেন যে, ছেলের সঙ্গে তাঁর সেই যে একটু মন-কষাকষি হইয়াছিল, সে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে দেখা করা ডাক্তারদের মতে ঠিক হইবে না। পিতা-পুত্রের বিরোধে যায়েদা সম্পূর্ণরূপে পিতার সমর্থক ছিল। তবু বাবার রুগ্ন ওয়াজেদকে দেখিতে না আসাটা সে কিছুতেই পসন্দ করিত না। সেজন্য মনে মনে বাবার প্রতি সে অসন্তুষ্ট।

কিন্তু সেভাব গোপন করিয়া ওয়াজেদের প্রশ্নের উত্তরে বলিল : বা'জান রোজ একশবার তোমার খবর লয়। তোমার অবস্থা যখন খারাপ ছিল, তখন তাঁর না আছিল খাওয়া-গোসল, না আছিল চোখে এক বিন্দু ঘুম ; প্রায় সারারাতই মসজিদে কাটাইয়াছেন।

যায়েদার কথায় অতিরঞ্জন ছিল খুবই, কিন্তু কথাগুলি মিথ্যা ছিল না। তবু ওয়াজেদ তাতে সন্তুষ্ট হইল বলিয়া মনে হইল না। সে অসহায়ের মত বোনের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তার কোটরগ্রস্ত চোখ হইতে আঁসু বাহির হইয়া তার পাণ্ডুর গাল বাহিয়া তার বালিশ ভিজাইতে লাগিল।

রোগী ভাইর চোখে পানি দেখিয়া যায়েদার কলিজা ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে বুঝিল, তার কথায় সে মোটেই সান্ত্বনা পায় নাই। সে বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল : আমার মনে হয়, ডাক্তারদের পরামর্শেই তিনি তোমার সামনে আসেন না। আর তাছাড়া—

যায়েদা আরেকটু কাছ ঘেঁষিয়া আসিল এবং ওয়াজেদের হাতটা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল : আচ্ছা, তুমিই কও ভাই, তুমি কি তাঁর আসবার পথ রাখছ? তোমার ভুল ভাঙছে এটা না জানা তক্ তিনিই বা কোন্ মুখে তোমার সামনে আসেন?

ওয়াজেদ ঠোঁটে কামড় দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। যায়েদা সুযোগ বুঝিয়া বলিল : বা'জানরে ডাইকা নিয়া আসব?

ওয়াজেদ ত তাই চায়। কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

সরকার সাহেবের এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইয়াছে যে, তাঁর দুশ্‌মনরাই তাঁর ছেলেকে তাঁর বিরুদ্ধে লাগাইয়াছিল। দুশ্‌মনরা ত অনিষ্ট করিবেই। কিন্তু ওয়াজেদ ত ছেলেমানুষ নয়, সে বয়স্ক ছেলে, লেখাপড়া করিয়াছে, তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যথেষ্ট সাবধান যখন সে হইতে পারে নাই, ক্ষণেকের জন্য হইলেও সে যখন শয়তানদের খপ্পরে পড়িয়াছিল, তখন সেজন্য তার মনে অনুতাপ করা উচিত। এটা সরকার সাহেব শাস্তিস্বরূপ দাবী করিতেছেন না। বাপ হইয়া তিনি রুগ্ন ছেলের সাজা চাইতেই পারেন না। কিন্তু অন্যায় করিলে নিজের ভুল বুঝিবার শক্তি মানুষের থাকা চাই। ওয়াজেদের ভালর জন্যই এটা তিনি চাহিতেছেন। ছেলে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে, এটা জানিলে কোন্ বাপ আনন্দিত না হন? তিনি সেইটুকুই জানিতে চান মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। সেজন্য অপেক্ষা না করিয়া তিনি যদি সাধারণ অশিক্ষিত বাপ-মার মত স্নেহে গলিয়া গিয়া আগেই ছেলেকে কোলে তুলিয়া নেন, তবে সেটা শিক্ষিত বাপের কাজ হইবে না। ছেলে আশ্‌কারা পাইয়া যাইবে। তার ভবিষ্যৎ জীবন মাটি হইবে। সেটা সরকার সাহেব হইতে দিতে পারেন না। ছেলের মুখ না দেখিয়া তাঁর কষ্ট হইতেছে খুবই। কিন্তু ছেলের শিক্ষার জন্য এইটুকু কষ্ট বাপ হইয়া তিনি সহ্য করিবেন না? এইটুকু কষ্ট-স্বীকারের ধৈর্য যাদের নাই, তারা জীবন-ভর কষ্ট ভোগ করে। যারা দুচার দিনের জন্য সন্তান হারাইতে ভয় পায়, তারা চিরকালের জন্য সন্তান হারায়। সরকার সাহেব অমন বাপই না। নিজের

সন্তানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আছে। তিনি নিশ্চয় তাঁর সন্তানকে ফিরিয়া পাইবেন, যতবড় শয়তানই তার পিছনে লাগুক না কেন।

সুতরাং যখন যায়েদা সসঙ্কোচে গিয়া বাপকে ওয়াজেদের কথা জানাইল, তখন আরেক সন্তানের সামনে তিনি উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন না বটে, কিন্তু মন তাঁর নাচিয়া উঠিল। তিনি ধীরে-সুস্থে রওয়ানা হইয়া যায়েদাকে দেখাইতে লাগিলেন বটে যে, তিনি কেবল রুগ্ন ছেলের প্রতি দয়া করিয়াই তার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন, কিন্তু প্রতি কাজে প্রতি পদক্ষেপে তাঁর আগ্রহ ও ব্যস্ততা ধরা পড়িতে লাগিল।

যখন অবশেষে তিনি ওয়াজেদের ঘরে ঢুকিলেন, তখন তিনি নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না। দীর্ঘদিন কঠিন রোগে ভুগিয়া অমনি ওয়াজেদের হাত পা শুকাইয়া গিয়াছে, চোখ কোটরে পড়িয়াছে। তার উপর তার মুখ-ভরা দাড়ি গজাইয়াছে। তাতে বাইশ বছরের সোনার চাঁদ ছেলেকে চল্লিশ বছরের বুড়ার মত দেখাইতেছে। এদৃশ্য সরকার সাহেব সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁর চোখ ফাটিয়া পানি আসিতে লাগিল।

বাপের আসার অপেক্ষায় ওয়াজেদ পালঙ্কের পাশে বসিয়াছিল। বাপকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই সরকার সাহেব বারণ করিবার আগেই সে তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িল এবং নীরবে বাপের দুই পায়ের উপর দুহাত রাখিয়া বসিয়া রহিল। বাপ উপুড় হইয়া ছেলের দুহাত ধরিয়া তাকে টানিয়া তুলিতে চাহিলেন। বাহুতে হাড় ছাড়া আর কিছু নাই ত। জোরে ধরিতেও পারিলেন না, টানও দিতে পারিলেন না। মুখে বলিলেন: বাবা, উঠ।

কিন্তু ওয়াজেদ উঠিল না। তার চোখের পানি ফোঁটা ফোঁটা বাপের পায়ে পড়িতে লাগিল। বাপ গলায় আরো স্নিগ্ধতা আনিয়া আবার বলিলেন: বাবা, উইঠা পড়।

এবার ওয়াজেদ কথা বলিল। কান্না-রুদ্ধ গলায় ক্ষীণ আওয়ায বাহির হইল: বা'জান, আমারে মাফ করেন।

এইটাই তিনি চাহিতেছিলেন। ছেলের মুখের এই কথাটা শুনিবার জন্যই

এতদিন তিনি কান পাতিয়া ছিলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটিল। তিনি বলিলেনঃ ওটা তুমি ভুইলা যাও, বাপ।

—বলিয়া তিনি আবার ওয়াজেদের দুই বাহু ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। অতি সহজেই এবার ওয়াজেদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরকার সাহেব ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আহা! বাছার বুকে পিঠে শুধুই হাড়। ঐ হাড্ডি-সার বুক সরকার সাহেব নিজের বুকে অনেকক্ষণ চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বুকে-বুকে বাপ-বেটার অনেক কথা হইয়া গেল।

যায়েদা বাপের পিছে-পিছে ওয়াজেদের ঘরে ঢুকিয়াছিল। বাপের চোখে পানি দেখিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাকে খবর দিয়াছিল। মা ও মেয়ে চুপে চুপে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফাঁকে বাপ-বেটাকে জড়াজড়ি অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। উভয়েই চোখ মুছিতে মুছিতে যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি চুপিচুপি চলিয়া গেলেন। রান্নাঘর হইতে তাঁরা দেখিলেন, কিছুক্ষণ বাদে সরকার সাহেব কাঁধের তোয়ালিয়ায় চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে ওয়াজেদের ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

নিজের ঘরে ঢুকিয়া সরকার সাহেব ইজিচেয়ারে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং পুলক-কম্পিত গলায় ডাকিলেনঃ কে আছস্, একটা তামাক দিয়া যা ত।

হুকুমমত যথাসময়ে চাকর তামাক দিয়া গেল। কিন্তু সে তামাক তাঁর খাওয়া হইল না। টিকাগুলি ধুকিয়া ধুকিয়া জলিয়া শেষ পর্যন্ত ছাই হইয়া গেল।

সরকার সাহেব ভাবিতে লাগিলেনঃ আল্লাহ্ কতবড় রহমানুর-রহিম। তিনি মেহেরবানি করিয়া তাঁর ছেলেকে আবার তাঁর বুকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁর দুশ্‌মন্‌রা সত্যই সাংঘাতিক কুচক্রী। তারা বাপের বুক হইতেও ছেলেকে কাড়িয়া নিতে পারে। কিন্তু যতবড় কুচক্রীই তারা হোক না কেন, আল্লার চেয়ে চক্রী তারা নয়। কোরআনশরীফে আছেঃ আল্লাহ্

খায়রুল মাকেরিন—তিনি সব মক্করের উপর বড় মক্কর। আল্লার চোখে ফাঁকি দিবে এমন ক্ষমতা কার আছে? আমির আলিরা তাই আশা করিয়াছিল নাকি? মূর্খ তারা, আল্লাকে তারা চিনে নাই। সরকার সাহেব আবার মনে মনে আল্লাকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি দুই রেকাত শোকরানা নামায পড়িলেন। ওয়াজেদ সারিয়া উঠিলে—আর—আর দায়রার মামলাটায় ফতেহ্ হইয়া গেলে তিনি খতম পড়াইবেন, মৌলুদশরীফ পড়াইবেন, আলিম-ফাজিল খাওয়াইবেন, গরিব-মিসকিনকেও দাওয়াৎ করিবেন। আল্লাহ্ সত্যই মেহেরবান। তাঁর উপর ভরসা রাখিলে, সৎপথে থাকিলে তিনি তাঁর বান্দাকে কখনো না-উম্মেদ করেন না। কোরআনশরীফে আছে: লা—কি যেন সরকার সাহেব এখন ভুলিয়া যাইতেছেন—মির রাহমতিল্লাহ্।

ডাকাতে কাড়িয়া-নেওয়া ছেলেকে ফিরিয়া পাইলে মার মনে যে আনন্দ হয়, আজ সরকার সাহেবের মনের আনন্দ তার চেয়ে একবিন্দু কম নয়। হারাইয়া-যাওয়া ছেলেকে ডাকাতরা আবার কাড়িয়া নিতে পারে ভয়ে মার মন যেমন সদা সন্ত্রস্ত থাকে, ছেলেকে নিরাপদ করিবার জন্য মা যেমন করিয়া ডাকাতদের সবংশ নির্বংশ করিবার জন্য খোদার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে, সরকার সাহেবের আজিকার মনের অবস্থা ঠিক তাই।

হারানো ছেলেকে ফিরিয়া পাওয়ার বিপুল আনন্দের মধ্যেও তিনি আমির আলিকে ভুলিলেন না। আমির আলির অসাধ্য কিছু নাই। তার পিছনে যে সব বদমায়েশ খাড়া হইয়াছে, তাদের প্রত্যেককে তিনি হাড়ে-হাড়ে চিনেন। ওরা এক-একটি পাকা বদমায়েশ। হাবিয়া দুজখেও ওদের স্থান হইবে না। এ গ্রামেও তাদের স্থান হওয়া উচিত নয়।

বদমায়েশদের কাতারে সকলের সামনে আমির আলি দাঁড়াইয়া। ঐ শয়তানটা সরকার সাহেবের যে অনিষ্ট করিয়াছে, আরো লোকের ত তাই করিতে পারে। না, ও লোকের শুধু সাত বছর জেল হইলেই চলিবে না। উকিলরা বলিয়াছেন, ধারাটা একটু বদলাইয়া দিলে তার দায়মুলও হইতে পারে। দায়মুলই তার হওয়া উচিত। উহ্! কি সাংঘাতিক লোক!

সে কোর্টে দাঁড়াইয়া হলফ করিয়া বলিল কিনা, সরকার সাহেব সমিরের রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া ঐ কাগজে দস্তখত দিয়াছিলেন। কি ডাহা মিথ্যাবাদী! এমন সাংঘাতিক লোক একাই একগ্রাম নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। না, আলবৎ এর দীপান্তর হওয়া উচিত।

উনত্রিশ

মাদ্রাসার হেড-মৌলবী মওলানা মুসা সাহেব যেদিন কেরামত শেখের কুঁড়েঘরে ঢুকিলেন, মাত্র সেইদিন পাড়ার লোকেরা জানিতে পারিল যে, কেরামত শেখের দম শেষ হইয়া আসিয়াছে।

এর আগে কেরামতের অসুখের কথা বড় কেউ জানিত না। জানিলেও কান দিত না। রোজ কত গরিব কত জায়গায় কত কঠিন বেমারিতে ভুগিতেছে মরিতেছে, কে তার খবর রাখে? কেরামত শুধু গরিব নয়, সে বুড়াও বটে। ঐ বয়সেও মানুষ মরিবে না, তবে আজরাইলের কাজটা কি থাকিল? তার উপর কেরামত শেখের ছেলেপিলে কেউ নাই। সম্পত্তি বলিতে কিছু নাই বলিয়া স্বভাবতঃই ওয়ারিশানও কেউ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল সুখ-দুঃখের সাথী সেই ছেলেবেলার বিয়ে-করা স্ত্রী যে নাকি আজ তারই মত বুড়া হইয়াছে।

এই বুড়ীই কাঁদা-কাটা করিয়া মওলানা সাহেবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তার স্বামীর বড় সখ মওলানা সাহেবের হাতে তওবা করিয়া যাইবে। জীবনে ত নামায-রোজার নামটিও করে নাই, তাই এখন মওলানা সাহেবের মত বড় আলেমের হাত ধরার দরকার হইয়াছে। যদি তাঁর ওসিলাতে আল্লার দয়া পাওয়া যায়।

অতবড় আলেমের রুখসতী দিবার মত বুড়ীর হাতে কিছু ছিল না। তাই শেষ সম্বল আটটাকা দামের ছাগলের বাচ্চাটা এক প্রতিবেশী মেহেরবানি করিয়া তিনটাকা দিয়া খরিদ করায় বুড়ীর এই হিল্লা হইয়াছে। সেই টাকা মওলানা সাহেবের পায়ে রাখিয়া কান্নাকাটি করিয়া তাঁকে রাযী করিয়াছে।

মওলানা সাহেব রুকু যাওয়ার মত গোজা হইয়া যখন কেরামতের কুঁড়ে-

ঘরে ঢুকিলেন, তখন ময়লা কাঁথার ভুটকা বদবুতে তাঁর বমি আসিবার উপক্রম হইল। তিনি তা অগ্রাহ্য করিলেন। নাকে রুমাল না দিয়াই তিনি চেষ্টা করিয়া বমি আটকাইলেন। রোগীর মনে কষ্ট হয়, এমন কোনো কাজই তিনি করিতে পারেন না। তিনি আলেম, নায়েবে-নবী, গরীবের বন্ধু। এইজন্যই এ আৎরাফের গরিবরা তাঁকে এত ভালবাসে, ভক্তি করে।

মওলানা সাহেবকে দেখিয়া কেরামত তার হাড্ডিসার শীর্ণ দুর্বল হাত অতি কষ্টে কপালে লাগাইয়া সালাম জানাইল। ঠোঁট-নাড়া দেখিয়া মনে হইল মুখেও 'সালাম-আলেক' বলিয়াছিল; কিন্তু সেটা শোনা গেল না। মওলানা সাহেব রোগীর সালামের অপেক্ষা না করিয়া তিনি নিজেই 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলিয়াছিলেন।

মওলানা সাহেবের বসিবার মত কিছু ঘরে ছিল না। কিন্তু বসিবার একটা বন্দোবস্ত করিতেই হইবে, এটা বুড়ী বুঝিয়াছিল। সেজন্য দুইটা পিঁড়ি উপরাউপরি বসাইয়া জলচৌকির মত উঁচা করিয়া রাখিয়াছে। মওলানা সাহেব অতি সাবধানে তারই উপর বসিলেন। হাত বাড়াইয়া তিনি কেরামত শেখের শীর্ণ হাতটি টানিয়া লইলেন। বলিলেন: কেরামত মিঞা, আপনে তওবা করতে চান?

কেরামত অতিকষ্টে বলিল: জি।

মওলানা সাহেব তার হাত সাপটিয়া ধরিয়া বলিলেন: তবে বলেন, আউযবিল্লাহে—মিনাশ—শায়তানির—রাজিম! বিসমিল্লাহির—। শেষ তক মওলানা সাহেব থামিয়া থামিয়া বলিলেন, কেরামত দম লইয়া-লইয়া সাথে-সাথে আবৃত্তি করিয়া গেল।

তার বাদে মওলানা সাহেব শুরু করিলেন: এইবার বলেন, মঁায় তওবা—

কেরামত আবৃত্তি করিল না। মওলানা সাহেব তার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। বুড়ীও ঘাবরাইয়া গেল। বুঝি বুড়া তওবা করিবার সময় পাইল না।

কেরামত ঢোক গিলিয়া বলিল: হুযুর, তওবা করবার আগে আমার

গোনার কথাটা আপনের কাছে কইবার চাই। না কইলে আমার তওবা কবুল হৈব না।

মওলানা সাহেব অবাক হইলেন। তিনি জীবনে অনেক লোকের তওবা করাইয়াছেন। কিন্তু তওবা করিবার আগে নিজের গোনার কথা কহিতে চাওয়া—এ যে এই প্রথম। বুড়ার হাতটা সাপের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তওবা করিবার আগেই লোকটার জিউ বাহির হইয়া না গেলে হয়। কিন্তু কি সে বলিতে চায়, তা যে শুনিতেই হইবে। আল্লার যা মরযি তাই হইবে। শোনাই যাক লোকটা কি কয়। তিনি বলিলেন: আপনে কি কইতে চান, কেরামত মিঞা?

বুড়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিল। মওলানা সাহেব তার দু-একটা লফ্‌জ ছাড়া আর কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু বুড়া বুঝিল। সে মওলানা সাহেবকে বুঝাইয়া বলিল যে, সে ওসমান সরকার ও আমির আলি খাঁর মামলায় সাক্ষ্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ওসমান সরকারের ভয়ে সাহস করে নাই। তারা ওসমান সরকারের ভিটা-বাড়ির প্রজা। ঐ দু-কাঠা জমি ছাড়া তাদের মাথা গুঁজিবার আর ঠাঁই নাই।

মওলানা সাহেব অবাক হইলেন। এই গরিব লোকটার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। তিনি পিঁড়ি হইতে নামিয়া সেই ময়লা বিছানাতেই বুড়ার গা ঘেঁষিয়া বসিলেন। বলিলেন: ঐ মামলার বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?

বুড়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল: জি হাঁ। যেদিন ওসমান সরকার যামিন-নামায় দস্তখত করেন, সেদিন আমি তাঁর সাথে শহরে গেছিলাম। আমি তখন তাঁর চাকরি করি।

মওলানা সাহেব পরম আগ্রহে জিগ্‌গাস করিলেন: তবে কি ওসমান সরকার আমির আলির যামিননামায় দস্তখত দিয়াছিলেন?

বুড়া মাথা নাড়িয়া বলিল: জি হাঁ।

বুড়া আর কি বলিল, মওলানা তা শুনিলেন না। তাঁর মন তখন কল্পনার সেকান্দরী গালিচায় চড়িয়া ওসমান সরকার ও আমির আলির বাড়ীর উপর দিয়া উড়িতে লাগিল। কি আশ্চর্য! আমির আলির

কথাই তবে সত্য? সাক্ষী-সাবুদ তবে সব ঝুটা? আদালতের বিচার তবে সব মিথ্যা?

হঠাৎ তাঁর মনে হইল রোগীর যেকেন্দানি উঠিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি তার হাত ধরিয়া তওবা পড়াইতে লাগিলেন। কেরামত শেখ থামিয়া থামিয়া দম লইয়া তওবা শেষ করিল।

মওলানা সাহেব মোনাজাতের জন্য হাত উঠাইবেন, হঠাৎ তাঁর মনে একটা কথা জাগিল। তিনি বলিলেনঃ কেরামত মিঞা, আপনের তওবা আল্লাহ্ আলবৎ কবুল করবেন। আপনে একটা কাজ করেন।

বুড়ার চোখে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। বলিলঃ কি হুযুর?

মওলানাঃ আপনে আমার সামনে আপনের পরিবারকে ওসিয়ত কইরা যান, তিনি যেন কোর্টে গিয়া আপনের তরফে সাক্ষী দেন। দায়রার মামলা শীঘ্‌ঘিরই উঠবে বইলা শুন্‌তাছি।

কেরামতের মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিলঃ আমি এই ওসিয়ত কইরা গেলাম।

মওলানাঃ আল্লাকে গাওয়া রাইখা আপনে এই ওসিয়ত করলেন?

কেরামতঃ জি, আল্লাকে গাওয়া রাইখা।

মওলানা বুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ আপনে এই ওসিয়ত শুন্‌লেন?

বুড়ীঃ জি হাঁ, শুন্‌লাম।

মওলানাঃ আপনে এই ওসিয়ত মোতাবেক কাজ করবেন?

বুড়ী একবার স্বামীর মুখের দিকে আরেকবার মওলানার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তার মুখে দ্বিধা ফুটিয়া উঠিল।

মওলানা সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বুড়ীর দিকে চাহিলেন। বলিলেনঃ কি, আপনে আপনের খসমের শেষ ওসিয়ত রাখবেন না?

কেরামতের মুখ কাল ছাই হইয়া গেল। বুড়ী একদৃষ্টে স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল। সে খসমের মুখের এই ভাব লক্ষ করিল। তার স্বামীর হাতের কাছে পাওয়া নাজাত ফস্‌কিয়া যাইতেছে? সে এ সময় দ্বিধা করিতে পারে না, কপালে তার যাই থাকুক।

সে বলিলঃ হুযুর, আমি আমার খসমের ওসিয়ত মোতাবেক সাক্ষী দিমু।

বুড়ার মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মওলানা সাহেব খুশী হইলেন। তিনি হাত উঠাইয়া অনেক দোওয়া-কালাম পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মুনাজাত করিলেন। বুড়াবুড়ী শুনিল মওলানা সাহেব এই মুনাজাতে তাদের নিজের এবং তাদের আল-আওলাদের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য, তাদের প্রত্যেকের কবর মশরেক হইতে মগরেব তক্ কুশাদা করিবার জন্য, মন্‌কির-নকিরের পরীক্ষা তাদের লাগি সহজ করিবার জন্য, কবরের আযাব, হাশরের ময়দানের আযাব, দুযখের আযাব হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ্-তালার দারগায় সুপারিশ করিলেন। বুড়া-বুড়ী হাত উঠাইয়া তাঁর সাথে সাথে 'আমিন আমিন' বলিল। তাদের চোখে-মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত কেরামত শেখের নাজাতের বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

মওলানা সাহেবের কাজ হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি উঠিলেন। তিনি যেই রওয়ানা হইবেন, অমনি বুড়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মওলানা সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেনঃ আবার কি হৈল, কেরামত মিঞা?

বুড়া বলিলঃ হুযুর, আমার বুড়ীরে আপনে রেহাই দিয়া যান। আমি তারে কোনো ওসিয়ত করলাম না। ওসমান সরকারের খেলাফে সাক্ষী দিলে পরের দিনই বুড়ীরে ভিটা-ছাড়া কইরা দিব। না না, হুযুর! আপনে মাফ কইরা দেন। আমার বরাতে যাই থাক।

মওলানা সাহেব দ্বিধায় পড়িলেন। কিন্তু আর সময় নাই। তিনি যন্ত্রের মত বলিয়া গেলেনঃ বহুৎ আচ্ছা, আপনের পরিবারের সাক্ষী দেওয়া লাগব না।

কেরামত বোধহয় হাসিবার চেষ্টা করিল। ঠোঁটের দুই কোণ একটু ফাঁক হইল। কিন্তু তার আগেই সে একটা গলাটানা দিল। তারপর সব শেষ।

বুড়ী এক হাত মৃত খসমের বুকে আরেক হাত মওলানা সাহেবের পায়ে রাখিয়া বলিলঃ হুযুর, আমার বুড়ার তওবা বাতিল হৈয়া গেল না ত?

মওলানা সাহেব একদৃষ্টে বুড়াবুড়ীর দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। বলিলেন ঃ না।

মওলানা সাহেব ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। কয়েকজন প্রতিবেশীকে কেরামতের জানাযার ব্যবস্থা করিবার আদেশ করিয়া তিনি নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। জানাযায় শামিল হইবার জন্য ইন্তেজার করিবার শক্তি ও উৎসাহ তিনি নিজের মধ্যে পাইলেন না।

পথে আসিতে আসিতে তিনি ভাবিলেন ঃ নির্দোষ আমির আলিকে বাঁচাইবার যে একটামাত্র সাক্ষী দুনিয়ায় ছিল, আল্লাহ্ তাকেও উঠাইয়া নিলেন। তার নাজাতের জন্য তিনি নিজেই আল্লার দরগায় মুনাজাত করিয়া আসিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তির দায়িত্ব, তার কর্তব্য কি তিনি নিজে পালন করিবেন? এখন কেরামতের কর্তব্য সত্যসত্যই ত তাঁর নিজের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজেই কি তবে দায়রার হাকিমের সামনে গিয়া সাক্ষ্য দিবেন?

মওলানা সাহেব মহাসমস্যায় পড়িলেন। এ ত গায় পড়িয়া দুশ্‌মনি করা হইবে। আল্লাহ্ তাঁকে এ কি মুসিবতে ফেলিলেন!

তিনি বরাবর শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারো ভালর কাছেও না, মন্দের কাছেও না। দিনরাত আল্লার বন্দেগী করিয়া কাটান। মানুষের হায়াত এত অল্প এবং আল্লার দেওয়া নিয়ামত এত বেশী যে, সেই সব নিয়ামতের জন্য কেবল আল্লার শোকরানা আদায় করিতে গেলেও একটা মানুষের হায়াতে কুলায় না। সাধারণ উম্মি মানুষ তা জানে না বলিয়াই তারা দুনিয়ায় কাজিয়া-ফসাদে মবতেলা হইয়া পড়ে। মওলানা সাহেব জানিয়া-শুনিয়াও কি সেই ফসাদে জড়াইয়া পড়িবেন?

তাঁর কথা যদি হাকিম বিশ্বাস না করেন? তাঁর আর সাক্ষী কে? অন্ততঃ তিন জন গাওয়া না দিলে আসমানের চাঁদ উঠা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে নাই। এটা হাদিসের কথা। আর একটা মাতব্বর লোকের ইয্‌যৎ হুরমৎ সম্বন্ধে মওলানা সাহেবের একার কথা হাকিম বিশ্বাস করিবেন? কেরামতের পরিবার সাক্ষ্য দিবে না, সেটা বুঝাই যাইতেছে। দিলেই বা কি? দুজন ত মাত্র।

মওলানা সাহেব বুঝিলেন, একটা কথা শুধু সত্য হইলেই হয় না, সত্যের মত চেহারাও তার হওয়া চাই; সত্য বলিয়া তাকে মানুষের বিশ্বাস করাও চাই। নইলে সে সত্য কোনো কাজে লাগে না, দরিয়ার নীচে মুণিমুক্তা যেমন মানুষের কোনো কাজে লাগে না। মণিমুক্তা যেমন উদ্ধার করিতে হয়, সত্যও তেমন প্রমাণ করিতে হয়। দরিয়ার নীচে মণিমুক্তা আছে, এটা সবাই জানে; কিন্তু সবাই সেটা তুলিতে পারে না। আনাড়ি লোক দরিয়ায় ঝাঁপাইয়া পড়িলে তাতে মণিমুক্তা উঠে না, সেটা হয় আত্মহত্যা। তেমনি সাক্ষী-সাবুদ ছাড়া সত্য প্রমাণ করিতে যাওয়াও আত্মহত্যারই সামিল। তাঁর কথা যদি কেহই বিশ্বাস না করেন, তবে তিনি আদালতের রায়ে মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। তাতে তাঁর প্রতি লোকের আর বিশ্বাস থাকিবে না। লোকের চক্ষে তিনি নাহক ছোট হইয়া যাইবেন। এ ঝুঁকি তাঁর নেওয়া উচিত কি? তাছাড়া ওসমান সরকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া আমির আলির তিনি কোনো উপকার করিতে পারিলে না হয় করিতেন। কিন্তু আমির মিঞারও কোনো কাজে লাগিলেন না, অথচ ওসমান সরকারেরও তিনি শত্রু হইলেন, এটা কি রকম অবস্থা হইবে? তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পাইলেন, কারো সাথে শত্রুতা না করিয়া তিনি সমাজের যে উপকার করিতেছেন, ওসমান সরকারকে শত্রু করিলে সেসব কাজে বাধা পড়িবে। অতএব শুধু মওলানা সাহেবের ব্যক্তিগত মান-ইয্‌যতের জন্যই নয়, পরন্তু মাদ্রাসার স্বার্থে ও সমাজে অন্যান্য ভাল কাজের খাতিরে এটা না করাই উচিত।

অতএব মওলানা সাহেব স্থির করিলেন, তিনি এই লইয়া আর উচ্চ-বাচ্য করিবেন না। কিন্তু হঠাৎ একি? আমির আলি যেন তাঁর সামনে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল: মওলানা সাহেব, একবার বলিয়াই দেখুন না। আপনি এত নামজাদা আলেম; আপনার কথা হাকিম বিশ্বাস না করিয়া পারিবেন না।

মওলানা সাহেব আবার মুশ্‌কিলে পড়িলেন। কিন্তু হাকিম তাঁর কথা বিশ্বাস করিলেই বা কি? তাতে আমির আলি জেল হইতে রক্ষা পাইতে

পারে সত্য, কিন্তু তাতে তার বদ্‌নাম কি দূর হইবে? মওলানা সাহেব তাঁর বহু অভিজ্ঞতা বিচার করিয়া দেখিলেন। বদ্‌নাম একবার হইয়া গেলে সেটা আর থামে না। এটা কাপড়ে কালি লাগার মত। একবার লাগিলে হাজার ধুইয়াও তাকে আগের মত সাফ করা যায় না। কাজেই আমির মিঞার চরিত্র আর আগের মত সাফ হইবে না। তার বংশের জালিয়াতির বদ্‌নামও লোকের মুখে বংশ-পরম্পরায় থাকিয়াই যাইবে। অতএব মওলানার সাক্ষ্যে আমির মিঞার ব্যক্তিগত খানিকটা লাভ হইলে হইতেও পারে। কিন্তু লোকসান যা হইবে, তা গোটা সমাজের। সমাজ বড়, না ব্যক্তি বড়? মওলানা সাহেব মাথা নাড়িলেন।

ত্রিশ

ঠিক হইয়াছে পরশুদিন ডেংগু বেপারী তাঁর বাড়ি-ঘর বিক্রয় করিবেন। জমি-জিরাত আগেই নিলাম হইয়া গিয়াছে। বাড়ি-ঘর বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে, তাই লইয়াই তিনি আসাম চলিয়া যাইবেন।

শেষবারের মত বাপের ভিটায় একরাত থাকিবার জন্য জরিনা বাপকে ধরিয়াছিল। বাপ রাযী হইয়াছেন। স্থির হইয়াছে জরিনা আগামী কাল সকালে বাপের বাড়ি যাইবে। গরুর গাড়ি ঠিক হইয়াছে।

তাই জরিনা আজ সকাল-সকাল রান্না-বান্না ও ছেলেমেয়েদের খাওয়ান-দাওয়ান সারিয়া জিনিস-পত্র গোছানির কাজে লাগিয়াছে। আমির আলি এখনো বাড়ি ফিরে নাই। চিমনি-ভাঙা ধুঁয়ায় অন্ধকার হ্যারিকেনটা হাতে করিয়া জরিনা একাই এঘর-ওঘর ছুটাছুটি করিয়া জিনিস-পত্র গোছাইতেছে।

এমন সময় উঠানের অন্ধকার কোণ হইতে ডাক শোনা গেল: জরিনা।

গলার সুরে জরিনা চমকিয়া উঠিল। এ যে তার ফুফাত ভাই আমজাদ আলির গলা।

আমজাদ জমিদারের তহশিলদার। আমির আলির সমবয়স্ক। কিছু-দিন আগেও দুজনের মধ্যে বেশ ভাব ছিল। ওসমান সরকারের চর বলিয়া তাকে আমির আলি সেদিন গাল দেয় এবং বাহির হইয়া যাইতে

বলে। সেদিন হইতে আমজাদ আর এ বাড়িতে আসে না। সেজন্য জরিনা স্বামীর উপর বেজার। কিন্তু এসময়ে আমজাদ ভাইর আসাটাও সে পসন্দ করিল না। সে আগ বাড়িয়া বলিল: এত রাতে যে আমজাদ ভাই?

আমজাদ বিষণ্ণমুখে বলিল: কইতাছি। চল ঘরে যাই।

জরিনা ঘরে ঢুকিয়া আমজাদকে বসিতে দিল, কিন্তু নিজে দাঁড়াইয়া রহিল। আমজাদ জরিনার দিকে অশুভ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল: তুমিও বস।

জরিনা ঘাররাইল। বসিল।

আমজাদ খানিক ভূমিকা করিয়া শেষে আসল কথা পাড়িল। যা বলিল তার অর্থ এই: ডেংগু বেপারী গতরাত রেললাইনে কাটা পড়িয়াছেন। হাত পা মাথা টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। পুলিশ ও ডাক্তার আসিয়াছিল। তাদের মত লইয়া কাফন-দফন করিতে সারাদিন কাটিয়া গিয়াছে। লাশ পচিয়া যাইতেছিল বলিয়া দফনে দেরি করা ও জরিনাকে নেওয়া গেল না। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় জবেদ আলিটা একরূপ পাগল হইয়া যাওয়ায় জরিনাকে খবর দেওয়ার ভার আমজাদের উপর পড়িয়াছে।

শোনামাত্র জরিনা কাঁদিয়া বলিল, তার বাপ আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমজাদ প্রতিবাদ করিল। বলিল: বেপারী সাহেব যে দৌড় দিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দু-একজন তা নিজ চোখে দেখিয়াছে। তবে সবাই একথা বলিতেছে এবং আমজাদের মতও তাই যে, দেনাই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। দেনার দায়ে বেপারীর মাথা আগেই খারাপ ছিল। তারপর বাড়ি-বিক্রয়ের নাম করিয়াই তিনি একরূপ পাগল হইয়া যান। কয়দিন ধরিয়াই বাড়ির চারদিক পাগলের মত ঘুরিতেন, ঘরের দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকিতেন। হামেশাই বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেন। বায়নার টাকা ফেরৎ দিতেও তিনি শরীফ বেপারীর কাছে গিয়াছিলেন। শরীফ টাকা ফেরৎ নেন নাই।

আমজাদ বিদায় হইলে জরিনা গলা ফাটাইয়া কাঁদিতে বসিল।

কিন্তু কাঁদিয়া সান্ত্বনা পাইবার শোক এটা নয়। জরিনার কলিজা ফাটিয়া গিয়াছে। এত শোকে মানুষ কাঁদিতে পারে না। সে চুপ করিল। বাপকে

যে এত ভালবাসিত, জরিনা আজই তা টের পাইল। এই বাপকে তার ভাই জবেদ ও তার স্বামীই হত্যা করিয়াছে। আমজাদ ভাই ঠিকই বলিয়াছে। ভাই ও স্বামীর প্রতি ঘৃণায় তার মন ভরিয়া গেল।

আমির আলি পথেই তার শ্বশুরের মরার খবর পাইয়াছিল। কিন্তু দেরিতে পাইয়াছিল বলিয়া দফনে শামিল হইতে পারে নাই। বরঞ্চ স্ত্রীকে সংবাদটা দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাড়ি ফিরিয়া জানিল আমজাদ আগেই খবরটা দিয়া গিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইল না। জরিনা বলিল না ঘৃণায়, আমির আলি বলিল না লজ্জায়। শোনামাত্র আমির আলি ধরিয়া লইয়াছিল এটা আত্মহত্যা এবং এজন্য দায়ী আমির আলি নিজে। কাজেই স্ত্রীর চোখে-চোখে সে চাহিতেই পারিল না।

কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উভয়ে শুইতে গেল। শুইয়াও কেহ কথা বলিল না। আমির আলি চিৎ হইয়া ঘরের চালের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কিরূপে সে শ্বশুরকে বড় বড় লাভের লোভ দেখাইয়া তাঁর নিকট হইতে কতবার টাকা আনিয়াছে, সব কথা ছবির মত তার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। কতবার টাকা নাই বলিয়া তিনি অক্ষমতা জানাইয়াছেন, কিভাবে আমির আলি তার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি খাটাইয়া বুড়াকে রাযী করিয়াছিল, সেসব কথাও তার মনে পড়িল। সত্যই তবে বুড়ার নিজের টাকা ছিল না? অনেক টাকা আছে, ওটা তবে কেবল শুনিতেই শোনা যাইত? বি-এ-পড়া আমির আলির যুক্তির কাছে হার মানিয়াই বুড়া অতিলোভের বশে ঋণ করিয়া জামাইকে টাকা দিয়াছেন। আমির আলি যদি জানিত শ্বশুরের হাতে টাকা নাই, তবে সে ঐ ধরণের ক্যান্‌ভাস করিত না। তিনি ঋণ করিয়া তাকে টাকা দিতেছেন এটা যদি আমির আলি ঘুণাক্ষরেও জানিত, তবে নিশ্চয় সে এ-টাকা নিত না।

তাছাড়া আমির আলি ত শ্বশুরকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে টাকা নেয় নাই। সে ত তাঁকে লাভ দিবার মতলবেই টাকা নিয়াছিল। মুনাফার অঙ্ক সে বেশী করিয়া দেখাইয়াছিল সত্য, কিন্তু বেশীটা বাদ দিলেও ত অনেক লাভ

হইত। লাভ হইলে সে ত শ্বশুরের এক পয়সাও রাখিত না। বরঞ্চ একসময়ে সে ত স্থির করিয়াইছিল যে, নিজের অংশের লাভটা শ্বশুরকে দিয়া সে শ্বশুরের লাভের অংশ তার ওয়াদামাফিক ঠিক রাখিবে। লাভ হইল না, সেটা কি আমির আলির স্কিমের দোষ? না তার পরিচালনার দোষ? আমির আলি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, তার স্কিমে বা তার পরিচালনায় কোনো দোষ ছিল না। তার কারবার ফেল হওয়ার জন্য দায়ী অতিলোভী শোষক-সম্প্রদায়। ওসমান সরকারই ঐ পালের গোদা। সেই ত তার কারবার ফেল করাইল; আমির আলি ধার-কর্য করিয়া কারবার বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে তাতেও ভাঙানি দিল; আমির আলিকে জালিয়াতির মামলায় জড়াইল; আর আজ তার স্ত্রীকে পিতৃহীন করিল। তার শ্বশুরের আত্মহত্যার জন্য দায়ী ওসমান সরকারই নয় কি?

স্ত্রীর পিতৃহীনতার কথা মনে পড়ায় সে তার দিকে নযর ফিরাইল। এতক্ষণেও স্ত্রীকে একটাও সান্ত্বনার কথা বলে নাই। সেজন্য তার মনে অনুতাপ হইল। আহা! বেচারীর বাপ মারা গিয়াছে। হাজার হউক বাপ ত। কোথায় এই শোকে সে স্ত্রীকে সান্ত্বনা তসল্লি দিবে, তা না সে নিজের ভাবনাতেই মাতিয়া আছে! এতে যদি জরিনা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়?

সে স্ত্রীকে নীরব দেখিয়া তার দিকে একটু ঘেঁষিয়া গেল এবং তার বুকের উপর একটা হাত দিয়া তাকে নিজের দিকে একটু টানিল।

জরিনা কোনো সাড়া দিল না—দেহেও না, মুখেও না। কারণ জরিনাও নিজের চিন্তায় বিভোর ছিল।

জরিনার বাবার মৃত্যুর জন্য তার ভাই ও স্বামী দুইজনেই দায়ী হইলেও স্বামীকে বরঞ্চ ক্ষমা করা যায়, কিন্তু ভাইকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। কারণ ভাই বা'জানকে ডুবাইয়াছে মদ গাঁজা খাইয়া। আর স্বামী করিয়াছে গরিবের জন্য।

কিন্তু—কিন্তু তাতে জরিনার কি? ভাই মদ গাঁজাই থাক, আর স্বামী গরিবের পিছেই টাকা উড়াক, জরিনা ত বাপ হারাইয়াছে।

না, বরঞ্চ ভাইকে মাফ করা যায়। সে অশিক্ষিত গণ্ডমূর্খ। কিন্তু স্বামী ত বি-এ-পড়া। সে পরের জন্য তার বুড়া শ্বশুরের সর্বনাশ করিল কেন?

আর কি রকম পরের জন্য? যে গরিবের জন্য তার স্বামী দেশের সকল বড়লোকের চক্ষুশূল হইল, আসিল তারা তার স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে? সবাই ত আজ বড়লোকদের পক্ষে। কেন গেল তার স্বামী এই বোকামি করিতে? লোকটা না বি-এ পড়িয়াছে? এমন পণ্ডিত মূর্খ লইয়া জরিনা কি করিবে? তার বোকামির সমস্ত সাজা ত ভোগ করিতে হইতেছে একা জরিনাকে। আজ জরিনা এত কষ্ট করিতেছে, তার বাপকে হারাইল এই বোকামির ফলে ত? খোদা না করুন যদি স্বামীর জেলই হইয়া যায়, তবে সে যে বাপের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইবে আশা করিতেছিল, সে আশায় আজ ছাই পড়িল এই বোকামির ফলে ত? না, জরিনা আর সহ্য করিতে পারে না। এই বোকামির ক্ষমা নাই।

স্ত্রীকে নীরব ও অটল দেখিয়া আমির আলি ডাকিল: জরিনা।

জরিনা বিরক্তি-পূর্ণ ধমকের সুরে জবাব দিল: কি?

জরিনার ধমকে আমির আলি ব্যথা পাইল। সে ত জরিনার শোকে সহানুভূতি দেখাইতেই চাহিয়াছিল। এ ব্যাপারে আমির আলির যতটা দোষ আছে, সেটা ত সে নিজমুখে স্বীকারই করিত। তবু জরিনা তার দিকে এমন গাল ফুলাইয়া আছে কেন? জরিনারই কি কেবল বাপ মরিয়াছে? আমির আলিরও কি বাপ মরে নাই? বুড়া বাপ মরিয়াছে ত কি হইয়াছে? বুড়া মানুষ মরিবে না? আজ গাড়ি চাপা পড়িয়া না মরিলেও দুদিন বাদে তিনি ত মরিতেনই। তার জন্য মন খারাপ করিয়া লাভ কি? আর মন খারাপ হইলেই আমির আলির চেয়েও কি খারাপ? আমির আলির ঘাড়ে যে অতবড় মোকদ্দমা ঝুলিতেছে, তার যে সাত বছর জেল, এমন কি দায়মুল হইতে পারে, সেজন্য আমির আলির মন কি খারাপ নয়? তবু ত সে জরিনার দিকে গাল ফুলাইয়া থাকে না। জরিনা লেখা-পড়া-জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে হইয়াও স্বামীর এই বিপদে সহানুভূতি দেখায় না কেন? জরিনার মতলবটা কি? সে কি তবে আমির আলিকে আর ভালবাসে না?

আমির আলির মনে পড়িল, আজ আমজাদ এ বাড়িতে আসিয়াছিল। তাকে এ বাড়িতে আসিতে আমির আলি বারণ করিয়া দিয়াছে। তবু সে আসে কেন? একটা সোদর মার পেটের ভাই, অতগুলি চাচাত ভাই থাকিতে ভিন্ গাঁয়ের ফুফাত ভাই আসে মরার খবর লইয়া? নিশ্চয় শ্যালার কোন বদ্-মতলব ছিল।

আমির আলি এসব কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন তার মনে পড়িতেছে, আমির আলির সাথে জরিনার বিবাহ হওয়ার আগে আমজাদের সাথেই তার বিয়ার কথা হইয়াছিল। বাড়ির সকলের নাকি মতও ছিল। একা ডেংগু বেপারী সকলের মত ঠেলিয়া আমির আলির সাথে তার বিয়া দেন।

আমজাদ লোকটা জমিদার জোতদারদের ফ্যান-চাটা। সেজন্য আমির আলি তাকে বরাবর ঘৃণা করে। কিন্তু জরিনার কাছে তার আদর কত! সে আসিলে জরিনার অসুখ সারিয়া যায়, নিজের আদরের বড় মোরগটা জবেহ্ করিয়া ফেলে। এসব আমির আলি পসন্দ করিত না। কিন্তু কিছু বলে নাই; কারণ স্ত্রীকে সে ভালবাসিত, বিশ্বাস করিত।

জরিনা কি সে বিশ্বাসের যোগ্য? একবছর হইল আমজাদের স্ত্রী মারা গিয়াছে। অত অত বিয়ার ঘর আসিল, কিন্তু সে বিয়া করিল না কেন? ঘন ঘন সে এ-বাড়িতে আসিত কেন? শ্যালার কি জরিনার উপর নযর আছে? জরিনারও কি—?

আমির আলির বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বিছানায় যেন সে গো-ক্ষুর সাপ দেখিল। সে চট্ করিয়া উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে জরিনার মাথা হইতে পা পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করিল। একটা ধাক্কা দিয়া বলিল: তুমি আমার কথার জবাব দিবা না নাকি?

জরিনা: দিলাম ত জবাব। তুমিই ত আমারে ডাক দিয়া চুপ কইরা গেলা।

আমির আলির একটু একটু মনে পড়িল, জরিনা তার প্রশ্নের জবাবে 'কি' বলিয়াছিল। সে কথা কাটাইবার জন্য বলিল: অমন ঝ্যাংড়া মারারে জবাব দেওয়া কয় নাকি? এ আদব-তমিজ শিখলা কই?

জরিনা ঃ তোমার কাছে।

আমির ঃ তার মানে ?

জরিনা ঃ তার মানে এই যে, আদব-লেহাযের যোগ্যি হৈলে ত আদব-লেহায পাওয়া যায়।

আমির ঃ কি ! আমি তোমার যোগ্য না ?

জরিনা ঃ তুমিই ভাইবা দেখ।

হাঁ, আমির আলি যা সন্দেহ করিয়াছে তাই। সে জরিনার যোগ্য নয়। এ-কথা এতদিনে জরিনার মনে হইতেছে কেন? আমির আলির মত উচ্চশিক্ষিত স্বামীর ঘর করার যোগ্যতা জরিনার নাই, তার মত স্বামী পাওয়া জরিনার মত অশিক্ষিত মেয়ের বিশেষ বরাতের কথা—এ ধরণের কথা জরিনা কতবার বলিয়াছে। যখন জরিনা এসব কথা বলিত, তখন সরল আন্তরিকতার সাথেই বলিত, সে-সম্বন্ধে আমির আলির বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ কি জরিনার মনের পরিবর্তন হইয়াছে? যদি হইয়াই থাকে, তবে কেন এ পরিবর্তন? কারণ আমির আলি গরীব হইয়া গিয়াছে। বস্তা বস্তা শাড়ি আর বাক্স-ভরা গহনা এখন সে আর দিতে পারে না। মাথার উপর মামলা ঝুলিতেছে। সাত বছর জেল হইতে পারে। এই ত? তাই আমির আলিকে আর ভাল লাগে না। তাই আমির আলি জরিনার মত একটা মূর্খ পাড়াগেঁয়ে মেয়ের যোগ্য স্বামী নয়। নারীর মত অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম জীব আর দুনিয়ায় নাই। না, খোলাখুলি কথা হইয়া যাওয়াই ভাল। আমির আলি চারিদিকে এত ষড়যন্ত্র আর বরদাশ্‌ত করিতে পারে না। এতবড় বিপদের সময় ঘরে সে কালসাপ পুষিতে পারে না।

সে ফিরিয়া বসিল। জরিনার গা-ঘেঁষা হইতে একটু সরিয়া গিয়া বলিল ঃ তোমার মতলবটা কি? আমার ঘর করা আর ভাল লাগতাছে না?

জরিনা চমকিয়া উঠিল। এইসব কথাই ত সে ভাবিতেছে। স্বামী তার মনের কথা জানিল কিরূপে? সে যেন একেবারে হাতে-কলমে ধরা পড়িয়াছে। এমন অবস্থায় পড়িলে মানুষ যেমন বেপরোয়া হইয়া যায়,

জরিনা তেমনি বেপরোয়া হইয়া উঠিল। বলিল: কত রাণীর হালে রাখছ কিনা, ভাল লাগব না কেন?

আমির আলি ঠিক ধরিয়াছে। এই ত মনের কথা বাহির হইয়া পড়িতেছে। কি নিমকহারাম! রাণীর হালে স্ত্রীকে কি সে রাখে নাই? কয়দিন হইল তার কষ্ট শুরু হইয়াছে? কিই বা কষ্ট জরিনা করিয়াছে? এখনো আমির আলির কষ্টের শতাংশও জরিনা সহ্য করে নাই। কোথাকার রাজকন্যা সে, যে একটু কষ্টেই মোমের মত গলিয়া পড়িবে? তথাপি রাণীর খুঁটা? এমন স্ত্রী আর এক মুহূর্ত তার ঘরে থাকিতে পারে না। সে বলিল: কি রাজকন্যাই না ঘরে আনছিলাম যে রাণীর হালে রাখা লাগব?

এরপর যা ঘটিল, এ বাড়িতে আর কখনো তা ঘটে নাই। আমির আলি জরিনাকে মারিল। জরিনার কান্নাকাটিতে ছেলেমেয়েরা জাগিয়া গেল। ছেলেমেয়ে মাকে কখনো মার খাইতে দেখে নাই। তারা গলা ফাটাইয়া চিৎকার শুরু করিল। তাদের চিৎকারে পাড়ার লোক জমা হইল। শালিস হইল। সবাই আমির আলিকে দোষী সাব্যস্ত করিল। হাজার হোক, আজ জরিনার বাবা মারা গিয়াছে। আমির আলির সেটা বিবেচনা করা উচিত ছিল।

বিচারকরা আমির আলিকে যত বেশী দোষী করিল, আমির আলির মেযাজ তত বিগড়াইল। সে সকলের সামনে ঘোষণা করিল, জরিনাকে লইয়া সে আর ঘর করিবে না। পরের দিনই কাজীর আফিসে গিয়া জরিনাকে তালাক দিয়া আসিবে।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত এই স্থির হইল, সে-রাত্রের মত জরিনা ও-বাড়িতেই থাকিবে। সকালে যা হয় একটা করা যাইবে।

পাড়ার লোক চলিয়া গেলে আমির আলি গালে হাত দিয়া বারান্দায় বসিল। জরিনা ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের পাশে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমির আলি ব্যাপারটা যতই ভাবিয়া দেখিল, ততই নিজের উপর তার ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। লজ্জায় তার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। তার

বাড়িতে তারই দাম্পত্য-ঝগড়ার শালিস করিয়া যায় পাড়ার এই অসভ্য লোকগুলা? দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে এদের কাছে সে কতদিন কত বক্তৃতা করিয়াছে, কত কলহের সে মীমাংসা করিয়াছে। সেসব মীমাংসায় কতদিন সে জরিনাকে নযির খাড়া করিয়াছে। আর আজ? তার একি অধঃপতন হইল? স্ত্রীর সাথে তার হইয়াছিলই বা একটু ঝগড়া। তার উপর সে হাত তুলিল কেমন করিয়া? ঐ রুগ্না স্ত্রী। আমির আলি একটা পশু। দাম্পত্য-কলহকে সে অমন করিয়া পাড়ার লোকের কাছে ন্যাংটা করিয়া ধরিল কিরূপে?

জরিনার কান্না তার কানে আসিতেছিল। আহা! তার বাপ মারা গিয়াছে আজই। তার মন-মেযাজ খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। পাড়ার মূর্খ লোকেরা যা বুঝিল, বি-এ পড়া আমির আলি তা বুঝিল না? সে নরাধম।

আমির আলি উঠিয়া ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে স্ত্রীর কাছে বসিয়া তার কাঁধে হাত দিল। বলিল: জরিনা, তুমি আমারে মাফ করবা না?

জরিনা জবাব দিল না। ফোঁৎফোঁৎ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমির আলি জোর করিয়া স্ত্রীকে শোওয়াইয়া নিজে তার পা ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িল।

একত্রিশ

তেভাগা মিছিল ব্যর্থ হইল। যে-সব ভাগচাষী ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছিল, তাদের অনেকেই মিছিলের পূর্বদিন গা-ঢাকা দিল। কেউ গেল জরুরী কাজে শহরে, কেউ গেল রোগী দেখিতে আত্মীয়বাড়িতে।

জরিনা এই মিছিলের বিরোধিতা করিয়াছিল এবং এর সংগে স্বামীর সম্পর্ক আছে সন্দেহ করিয়া স্বামীকে তাম্বিহ্ করিয়াছিল। কিন্তু মিছিল এইভাবে ব্যর্থ হওয়ায় তার মনে আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হইল। যেভাবে গ্রামের লোক তেভাগা আন্দোলনের নিন্দা করিতে লাগিল, যেভাবে তারা এই মিছিলের সহিত তার স্বামীকে জড়াইতে লাগিল, তাতে তার মনে এই যিদ হইল যে, মিছিলটা ব্যর্থ না হইলেই ভাল হইত। এতদিনে তার স্বামীর

দেওয়া যুক্তিগুলি তার কাছে জোরদার মনে হইতে লাগিল। সত্যই ত, জোতদার জমি চাষ না করিয়া ফসলের অর্ধেক নিবে কোন্ যুক্তিতে? সে জমিদারকে যত খাজনা দেয়, সেই খাজনার উপর কিছু মুনাফা পাইলেই ত হইল। জরিনার কাছে এ যুক্তি অকাট্য মনে হইল। এই অকাট্য যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া জোতদাররা যে তেভাগা-দাবির বিরোধিতা করিতেছে, এটা তাদের কায়েমী স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি?

কিন্তু জরিনার রাগ হইল সবচেয়ে বেশী ভাগ-চাষীদের নেতাগণের উপরে। স্বার্থপর জোতদাররা নিজেদের স্বার্থের জন্য মিছিলের বিরোধিতা ত করিবেই। কিন্তু ভাগচাষী নিজেরা? তাদের নেতারা কয়েকটা টাকা খাইয়া হাজার হাজার ভাগচাষীর স্বার্থ কোরবানি দিল কিরূপে? লোকগুলি এত নীচ, এত নির্বোধ! এইসব নীচ ও নির্বোধ লোকের নেতৃত্বে ভাগ-চাষী তাদের দাবি হাসিল করিবে কিরূপে?

কিন্তু এসব যুক্তি যরিনার মনে আসিতেছে এইজন্য যে, মিছিল সফল হইলে তার স্বামীর জিত হইত। স্বামী যদিও তার কাছে বলিয়াছে মিছিলের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই, তবু জরিনার দৃঢ় বিশ্বাস তলে তলে তার স্বামী মিছিলের উস্কানি দিতেছিল এবং তদবিরও হয়ত করিতেছিল। এ অবস্থায় মিছিল সফল হইলে তার স্বামীর নাম হইত, বড়লোকেরা তাকে ডরাইত। আর সব চেয়ে বড়কথা তার স্বামী মনে-মনে খুশী হইত। বেচারার মনে একটু আনন্দ হওয়া দরকার। সব ব্যাপারে হারিয়া-হারিয়া তার মনটা দমিয়া গিয়াছে। অন্ততঃ এই একটা ব্যাপারে তার জয় হইলে বেচারা খুশী হইত, কাজে-কর্মে উৎসাহ পাইত। তা না হইয়া মিছিল ব্যর্থ হওয়ায় চাষীদের যত লোকসানই হোক, তার স্বামীর যে লোকসান হইল তার তুলনা নাই। বেচারার রাজ্যশুদ্ধা বদনাম হইল। তার পক্ষের লোকদের উৎসাহ আরো কমিয়া গেল, তার সমর্থনকারীরা ভয় পাইয়া গেল। এরা এখন তার স্বামীর পক্ষ ছাড়িয়া ওসমান সরকারের পক্ষে চলিয়া যাইবে নিশ্চয়। কারণ হারের দলে কেউ থাকিতে চায় না।

জরিনা ব্যাপারটা যতই চিন্তা করিল, ততই তার মনে হইল ভাগ-চাষীদের

ব্যাপারটা যেন তার স্বামীরই ব্যাপার। এটায় হার হওয়ায় তার স্বামীই যেন হারিয়া গিয়াছে। এতে যেন ওসমান সরকারের দলেরই জয় হইয়াছে। হাঁ, জরিনার মনে আর কোনো সন্দেহ নাই যে, ওসমান সরকারই তার স্বামীকে হারাইবার জন্য তেভাগা মিছিল পণ্ড করিয়া দিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তেভাগা-আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে টাকা ছড়াইয়াছে।

এই সর্বপ্রথম জরিনা তার স্বামীর প্রত্যেক কাজের পূর্ণ সমর্থক হইয়া উঠিল। জরিনা বুঝিল, ওসমান সরকারদের সহিত লড়িতে হইলে আধাআধি লড়াই করা চলে না। সবকাজে তাদের দুশ্‌মনি করিতে হয়। কারণ ওসমান সরকাররা তাদের দুশ্‌মনকে কোনদিক দিয়াই মাথা তুলিতে দিতে চায় না। তার স্বামীকেও কাজেই বাধ্য হইয়াই সকল দিক দিয়া ওসমান সরকারদের সাথে লড়াই করিতে হয়। মোটকথা, জরিনার স্বামীই ঠিক। এতদিন জরিনা না-হক স্বামীর কাজের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছে।

সুতরাং সারাদিন পরে যখন আমির আলি সেদিন বাড়ি ফিরিল, তখন স্ত্রীর ব্যবহারে একটা পরিবর্তন লক্ষ করিল। জরিনার আদর-যত্ন সেদিন বাড়িয়া গেল। প্রত্যেক কথায় জরিনা স্বামীকে সমর্থন করিতে লাগিল। বাপকে একটু সোয়াস্তি দেয় না বলিয়া ছেলেমেয়েদের বকিতে লাগিল।

আমির আলির মনটা খুশী হইল। খাওয়া ভাল লাগিল। পেট ভরিয়া খাইল। রান্নার তারিফ করিল। জরিনা অনেকক্ষণ ধরিয়া হুক্কা তাজা করিয়া তামাক সাজিয়া আনিল। হুক্কার আওয়াযে পর্যন্ত নূতন সুর ফুটিয়া উঠিল। পানটাও ভারি মজা লাগিল।

মামলার তারিখ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং সে আলাপ উঠিল। জরিনাই কথা তুলিল : খুব সাবধানে তদবির করিতে হইবে। আজকালকার লোকজনেরে বিশ্বাস নাই। বড়লোকের টাকার জন্য সবারই জিভে লালা পড়িতেছে। ওসমান সরকার দু'হাতে টাকা ছড়াইয়া সাক্ষী বাধ্য করিতেছে। ওদের অসাধ্য কর্ম নাই। অমন যে হক্কের তেভাগা আন্দোলনটা, টাকা ছড়াইয়া তাও ওরা বন্ধ করিয়া দিল।

আমির আলি অবাক হইল। সে অতটা আশা করে নাই। জরিনা আজ তার রাজনৈতিক আদর্শের সাথেও একমত হইয়া উঠিয়াছে?

জরিনা উপদেশ দিল : অতএব আমির আলিকে খুব হুঁসিয়ার হইয়া সাক্ষী বাছাই করিতে হইবে। ঈদু শেখের মত সাক্ষী এবার কিছুতেই দেওয়া হইবে না।

হঠাৎ জরিনা উৎসাহের সহিত বলিল : এমন কি, আমার সন্দেহ হয়, ওসমান সরকার টাকা দিয়াই ওমর বেপারীর বুড়ীর কাছ থাইকা ঐ লিখনটা আদায় করছে। মড়ার বুড়ী, এক পাও তার কবরে গেছে; তবু টাকার লোভে ঐ লিখনটা দিল? হায় রে টাকা!

আমির আলির মত তা নয়। ঈদুই ওসমান সরকারের উস্কানিতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ভান করিতে গিয়াছিল, এ-মতে আমির আলি এখনও দৃঢ়। তবু স্ত্রীর এই অভিমতের মধ্যে এত সহানুভূতি সে দেখিতে পাইল যে, এটার প্রতিবাদ করা সে সমীচীন মনে করিল না।

বরঞ্চ বলিল : তুমি ঠিকই কইছ জরিনা, তোমার কাছে শুইনা আমারও এখন তাই মনে হৈতাছে।

স্বামীর মুখে এই প্রশংসায় জরিনা গর্ববোধ করিল।

আলাপে-সালাপে রাত অনেক হইল। কিন্তু কেউ ঘুমাইতে পারিল না। উভয়ের কথা উভয়ের কাছে ভাল লাগিল। কথাবার্তায় মজা লাগিতে লাগিল। কাজেই কেহ কথাবার্তা বন্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

আমির আলি বলিল : তেভাগা মিছিল বন্ধ হওয়ার ফল কি হৈছে জান জরিনা? পুরাণ ভাগ-চাষীদেরে জোতদাররা আর জমিন দিব না। হতভাগাদের আসাম যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

জরিনার বাবা আসাম যাইতে চাহিয়া ঐভাবে মারা যাওয়া অবধি জরিনার মনে আসামের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হইয়াছে। যেন যে আসাম যাইবার নাম করিবে, সেই ঐভাবে মারা যাইবে। সে বলিল : লোকগুলা সব আসাম যাইবার লাগি এমন পাগল হৈছে কেন? এদেশে কি আর জায়গা নাই?

আমির আলি স্ত্রীর জ্ঞান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বলিল: এদেশে সত্যই জায়গা নাই। লোক-সংখ্যা এত বাইড়া গেছে যে, জমিনে আর কুলাইতেছে না।

জরিনার কথাটা পসন্দ হইল না। তাদের বাড়ির চারপাশেই কত জমি। রাজ্যশুদ্ধা খোলা ময়দান পড়িয়া রহিয়াছে। তার তুলনায় মানুষ আর কয়টা? কিন্তু আজিকার আনন্দ সে স্বামীর সহিত তর্ক করিয়া নষ্ট করিতে কিছুতেই রাযী নয়।

সে স্বামীর দিকে অধিকতর আকর্ষণ বোধ করিল। বলিল: তোমার শিল্প-সংঘ যদি টিইকা থাকত, তা হৈলে জমির লাগি মানুষের এত কাড়াকাড়িও লাগত না। গরিবেরা ঘরে বইসাই রোজগার করতে পারত। জোতদারের জমি পতিত পইড়া থাকত।

আমির আলি এতক্ষণ চিৎ হইয়া ছিল। এবার স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া তার বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল: তারই লাগি ত দেশের যত বড়লোক আমার বিরুদ্ধে লাগল। শিল্প-সংঘটা ধ্বংস করল। এখন আমারে আর আমার ইটখোলাটারে শেষ করতে পারলেই হয়।

জরিনা স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। সেও স্বামীর দিকে ফিরিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিল।

উভয়ে উভয়ের বুকে শান্তিপূর্ণ আশ্রয় পাইল। এমন করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বহুদিন শোয় নাই। দুজন যে পরস্পরের কত আত্মীয়, এমন কি দুজন যে প্রকৃতপক্ষে একই, একথা আজ তাদের মনে পড়িল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তারা নিঃশব্দে এই আরাম ও শান্তি উপভোগ করিল। তারপর জরিনাই প্রথম কথা বলিল। সে স্বামীকে আরো বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল: তোমার উপর আমি এতদিন কি অবিচারই না করছি। আমারে মাফ করবা না তুমি?

আমির আলি স্ত্রীর গালে একটা চুমা দিয়া বলিল: দূর পাগলী! তুমি কি কসুর করছ যে মাফ করা লাগব? ও-সব কথা কইও না।

জরিনা স্বামীর চুমা ফিরাইয়া দিয়া বলিল: কসুর করছি না? কথায়

কথায় তোমার কাজের নসল্লা ধরছি, হামেশা মন্দ-চারি কইছি, কতভাবে জ্বালাতন করছি।

আমির আলি স্ত্রীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল: সে সব নসল্লা নারে পাগলী, সে সব নসিহত। তুমি যে কত বুদ্ধি রাখ, আজ আমি তা বুঝতাছি। তুমি একটা কথাও অন্যায় কও নাই। তোমার কথা যদি আমি মাইনা চলতাম, তবে আমার কোনো কাজেই ভুল হৈত না। হয়ত আজ আমাদের এ দুর্দশাও হৈত না।

জরিনা স্বামীর মুখে হাত দিয়া বলিল: না না, তুমি এসব কথা কইও না। আমার বুদ্ধি তোমার চাইয়া বেশী, ই কথা কইলে আমি মনে করমু তুমি নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলছ। এটা ভাবতে আমার ডর লাগে।

আমির আলি স্ত্রীকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল: তোমার ডরের কোনো কারণ নাই। আমিও বুদ্ধিমান, তুমিও বুদ্ধিমতী। দুজনের বুদ্ধি একত্র কইরা আমরা আরো বেশী বুদ্ধিমান হৈব। কেউ আমরার সাথে পারবে না।

জরিনা স্বামীর চাপে সাড়া দিল। দুইজন একমন একদেহ একআত্মা হইয়া গেল। ঝড়-ঝাপটাপূর্ণ দুনিয়ার পিচ্ছিল পথে যেন দুই বন্ধু পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

অনেক রাত্রে তারা ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে যখন তাদের ঘুম ভাঙিল, তখন জরিনা ধস্‌মস্ করিয়া উঠিতে গেলে আমির আলি তাকে বাধা দিল। বলিল: আরেকটু শোও। আজকের দিনটা তোমারে ছাড়বার ইচ্ছা হৈতাছে না। তোমারে আজ বড় সুন্দরী দেখাইতেছে।

"যাও, পাগলামি কইর না। দেরি হৈয়া গেছে। নাশ্‌তা হৈব কখন?"

—বলিয়া জরিনা একরকম জোর করিয়া উঠিয়া গেল। আমির আলি শুইয়া রহিল। জরিনা বলিল: নাশ্‌তা হৈতে হৈতে আরেকটু ঘুমাইয়া

লও। অনেক রাত জাগা হৈছে। তোমার শরীর খারাপ হৈতে পারে, আরেকটু ঘুমাও।

জরিনা চলিয়া গেল। আমির আলি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

বত্রিশ

আমির আলির মনে হইল: জীবন এত সুন্দর! তার জরিনা এত ভাল! তবু নাহক তার উপর কত অন্যায় সন্দেহ সে করিয়াছে, অন্যায় রাগ তার উপর করিয়াছে। এই জরিনাকে ছাড়িয়া এমন সুন্দর জীবন ছাড়িয়া সে জেলে যাইতে পারে না। সে নির্দোষ। কেন তার জেল হইবে? সে যদি মামলায় হারে, তবে সেটা হইবে শুধু তদবিরের অভাবে।

কিন্তু তদবির সে আর কিভাবে করিতে পারে? ওসমান সরকারের দস্তখতের একটা সাক্ষী যদি পাওয়া যাইত, তবেই ত সব ল্যাটা চুকিয়া যাইত। কিন্তু সাক্ষীটাই যে সে পাইতেছে না। ঈদু শেখের দিয়া ত হইল না। আজ যদি ওমর বেপারী বাঁচিয়া থাকিত!

কিন্তু কি আশ্চর্য! সমিরের রেষ্টুরেণ্টের মত অমন সরগরম জায়গায় দস্তখত হইল, অথচ সেখানে ওমর বেপারী ছাড়া আর কেউ ছিল না, এটাই বা কেমন কথা?

দস্তখতটা যে সমিরের রেষ্টুরেণ্টে বসিয়াই হইয়াছিল, তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন্ কোণে কোন্ মুখী হইয়া কে বসিয়াছিল, তা পর্যন্ত ছবির মত তার চোখে ভাসিতেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে ভুল হয় নাই। কিন্তু সেখানে তখন আর কে কে ছিল, এইটাই সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। কেন পারিতেছে না? ছিল ত তখন আরো লোক নিশ্চয়ই। তখন বেলা চারটা আন্দাজ বাজে ত। বিকাল বেলা। তখন কতলোক রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া চা খায়। কাছারি-ফেরতা বাজার-ফেরতা কতলোকের তখন ভিড়। অথচ একটা লোকের মুখও তার মনে পড়িতেছে না!

না। বাহির করিতেই হইবে, মনে করিতেই হইবে। একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিলেই মনে পড়িয়া যাইবে।

আমির আলি মনে মনে রেষ্টুরেণ্টের ঐ জায়গাটা কল্পনা করিল। ঐ কোণের টেবিলটায় আমির আলি ও ওসমান সরকার বসিয়াছিলেন। ওসমান সরকারের ডানপাশে পূবমুখী হইয়া বসিয়াছিলেন ওমর বেপারী। তারপর ওমর বেপারীর ডানদিকে ঐ বেঞ্চিতে কিম্বা আমির আলির বাঁদিকে এই বেঞ্চিতে আরো দুই একজন লোক ছিল, সে কথা আমির আলির দিব্যি মনে পড়িতেছে। তাদের সঙ্গে কিম্বা অন্ততঃ একজনের সঙ্গে আমির আলির বা ওসমান সরকারের কথাও হইয়াছিল, সেটাও যেন আমির আলির মনে পড়িতেছে। কি কথা হইয়াছিল? নিশ্চয় ঐ যামিন-নামার কথাই হইয়াছিল। হাঁ, এই ত আমির আলির দিব্যি মনে পড়িয়া গেল যামিনের কথাই হইয়াছিল। লোকটা জিগ্‌গাস করিল। ওসমান সরকার বড়াই করিয়া বলিল, ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর খাতির আছে বলিয়াই তাঁর দস্তখতের এত দাম। হাঁ, ঐ লোকটাও ওসমান সরকারকে খুশী করিবার জন্য বলিলঃ আপনার দস্তখতের দাম সকলের কাছেই আছে। ওসমান সরকার খুশী হইয়া হাসিল, তাঁর দাঁত দেখা গেল। সবই ত আমির আলির স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

কিন্তু লোকটার চেহারা মনে পড়িতেছে না। কি মুস্কিল! সে সবই দেখিতেছে ছবির মত। চায়ের কাপ হইতে যে ধুঁয়া উঠিতেছে, তাও সে দিব্যি ছবির মত দেখিতেছে। লাড্ডুয়া-বিস্কুটের কড়মড় শব্দ পর্যন্ত তার কানে ঢুকিতেছে। ঐ লোকটা তখন গোশ্‌ত-রুটি খাইতেছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। হাঁ হাঁ, ঐ ত তার সামনে গোশ্‌তের তশ্‌তরিটা পর্যন্ত আমির আলির চোখে ভাসিয়া উঠিয়াছে, ঐ যে পারাটা ছিঁড়িয়া শুরুয়া লাগাইয়া রুটির টুক্‌রাটা সে মুখে দিল, ঐ যে মুখটা প্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আহা হা, আরেকটু হইলেই মুখটা ধরা পড়িয়াছিল আর কি। থুতি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। হাঁ, থুতিতে চোখা করিয়া কাটা, কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি।

না না, দাড়ি কোথায়? সেটা ত ছিল ঐ দূরের কোণের একটা লোকের। না, তাও না। তারা যখন বাহির হইয়া আসে, তখন একটা লোক ঢুকিতেছিল। তারই ছিল ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। দূর ছাই, তাও না। রেষ্টুরেন্ট হইতে বাহির হইয়া সে যখন পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া ওসমান সরকারকে পান-সিগারেট দিতেছিল, তখন ঐ ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িওয়ালা আমির আলির পাশে দাঁড়াইয়া পাসিং শো সিগারেট খাইতেছিল।

না। আমির আলির দৃষ্টি আবার গোলমাল হইয়া গেল। ধরি-ধরি করিতে করিতে লোকটা হারাইয়া গেল।

আবার সে বেঞ্চিতে নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল। ওসমান সরকার, তার ডাইনে ওমর বেপারী, তার ডাইনে একটু দূরে ঐ লোকটা। হাঁ, আবার দেখা যাক। ঐ পারাটা ছিঁড়িতেছে, ঐ শুরুয়া লাগাইল। ঐ-ঐ মুখে তুলিতেছে। ঐ-ঐ মুখ। হাঁ, এইবার ধরা পড়িয়াছে। দাড়ি-টাড়ি কিছু না। ক্লীন শেভ-করা মুখ। এযে—এযে চেনা মুখ। আবার—আবার মুখটা সরিয়া গেল।

আমির আলির নিজের উপর রাগ হইল। এইটুকু স্থির হইয়া ভাবিতে পারে না, একটা চেনা মুখ ধরিতে পারে না, সে আবার স্মরণশক্তির বড়াই করে? সে আবার জিতিবে মামলা?

সে রাগে মাথার চুল ধরিয়া টানিল। চোখ রগড়াইল। যেন চোখের ঝাপসা ভাবটা কাটিলেই চেহারাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কিন্তু ফল হইল ঠিক উল্টা। চোখ রগড়াইতেই সব ধূঁয়াটে হইয়া গেল। রেষ্টুরেণ্টের সেই স্পষ্ট ছবিটা পর্যন্ত মিলাইয়া গেল। হাজার চেষ্টা করিয়াও আর কাউকে তার জায়গায় ঠিকমত বসাইতে পারিল না। একজনকে বসাইলে আরেকজন দাঁড়াইয়া উঠে। সব এলোমেলো হইয়া যায়।

এইসময় ছেলেরা আসিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। আমির আলি হতাশ হইয়া চিন্তার ডোর ছাড়িয়া দিল।

জরিনা যখন নাশ্‌তা তৈয়ার করিয়া ঘরে ফিরিল, তখন জরিনাকে সে সব কথা বলিল। ছেলেমেয়েদের নষ্ট-করা কাঁথা-কাপড় গোছাইতে গোছাইতে

জরিনা শুনিতেছিল। হঠাৎ সে উৎসাহিত হইয়া বলিল: না, ছাড়িলে চলব না। লোকটা কে, চিন্তা কইরা সেটা তোমার বাইর করাই লাগব।

সেদিন আর আমির আলি বাড়ির বাহির হইল না। সারাদিন স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। জরিনা বেচারী কি করিবে? শহরের রেষ্টূরেণ্টে বসিয়া কে কে চা বা গোশ্ত-রুটি খাইয়াছে, সে কথা জরিনা বলিবে কিরূপে? সেটা ঠিক। কিন্তু স্বামীর চিন্তায় তার সাহায্য করিতেই হইবে। দশহাত পানির পুকুরে একটা কিছু হারাইয়াছে। সেটা সুইও হইতে পারে, পয়সাও হইতে পারে, বাজুর তাবিজও হইতে পারে—তা না জানিয়াও দরদী বন্ধু যেমন করিয়া বন্ধুর সঙ্গে পানিতে ডুব পাড়ে, জরিনা স্বামীর সাথে-সাথে সেইরূপভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

জরিনা, ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ, ক্লীন্ শেভ-করা মুখ আমির আলির চেনা লোকদের মধ্যে কার কার আছে? লোকটা ফর্সাও হইতে পারে, শ্যামবর্ণও হইতে পারে। নিশ্চয়ই ভূতা কাল নয়। বয়স? লোকটার বয়স কুড়ি হইতে চল্লিশের মধ্যে হইবে। তার বেশী নয়। কারণ আমির আলির বেশ মনে আছে লোকটার মাথার চুল পাকা ছিল না।

তাছাড়া, জরিনার এটাও ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা দরকার, কোনোদিন গল্পচ্ছলে আমির আলি কারো নাম বলিয়াছে কি না। ওসমান সরকার, ওমর বেপারী—ওদের কথা কতবার আমির আলি জরিনার কাছে গল্প করিয়াছে। ঐ সঙ্গে ঐ লোকটার কথা না বলিয়া সে পারে না, নিশ্চয় বলিয়াছে। জরিনা মনে করিতে পারিতেছে না। আরেকটু চিন্তা করিলেই সে নাম জরিনার মনে পড়িবে।

জরিনাও গভীর মনোযোগ দিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শয়তান ছেলে-মেয়েগুলা কি তাকে একমনে চিন্তা করিতে দিল? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চিন্তাটাকে যেই একটু সিজিল করিয়া আনিয়াছে, অমনি বদমায়েশ ছেলেদের এটা না হয় ওটা কাঁদিয়া উঠে, একটা আরেকটাকে মারিয়া বসে। একটা আসিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টানাটানি শুরু করে, বলে: মা, ও আমারে চিম্‌টি দিছে।

এ অবস্থায় একমনে চিন্তা করা যায় কি? তবু জরিনা চিন্তা করিয়া চলিয়াছে। ছেলেমেয়েদের মার-ধর করিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিয়াছে, ফাঁকি দিয়া ও-বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে। আসাদের মাকে ডাকিয়া তাকে-নেওড়া করিয়া একটুখানিক ছোট মেয়েটাকে নিতে বলিয়াছে।

কিন্তু এত করিয়াও সে স্বামীর সেই ক্লীন শেভ-করা চেনা মুখটার হিল্লা করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার দিকে সে হতাশ লইয়া পড়িল। এখনো রান্না-বান্না হয় নাই। রান্নাও করিতে হইবে অথচ এমন জরুরী কাজে স্বামীর সাহায্য করা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেও মন চায় না। জরিনা কি করিবে? না, জরিনা কোনো কাজের মেয়ে নয়। অন্য স্ত্রীলোক হইলে নিশ্চয় একাজে স্বামীর সাহায্য করিতে পারিত। জরিনা পারিল না। বড়ই আফ্‌সোস! স্বামী যে তাকে মাঝে মাঝে অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া খুঁটা দেয়, সেটা তবে নিতান্ত মিথ্যা নয়।

সে অবশেষে অতিশয় সঙ্কোচের সাথে স্বামীকে রান্নার কথা স্মরণ করাইয়া খানিকক্ষণের জন্য ছুটি চাহিল। আমির আলি স্ত্রীকে ছুটি দিয়া একাই চিন্তা করিতে বসিল।

সবেমাত্র জরিনা চুলায় আগুন ধরাইয়া ভাতের হাঁড়ি বসাইয়াছে, অমনি আমির আলি 'পাইছি জরিনা, পাইছি' বলিতে বলিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং এমন আতেক্কাভাবে জরিনাকে সাপটাইয়া ধরিল যে, আরেকটু হইলে সে চুলার উপর পড়িয়া গিয়াছিল আর কি।

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সমান আগ্রহে সে বলিল: আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। পাইছ? কেটা?

আমির আলি হাসিয়া সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া বলিল: নসিমুদ্দিন সরকার। কি আশ্চর্য! এই নামটা মনে করতেই আমার এত সময় লাগল! নসিমুদ্দিন যে আমার এককালের ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড। সিটি স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম যে।

জরিনার আনন্দের আগুনে হঠাৎ পানি পড়িয়া গেল, যখন সে

শুনিল নসিম সরকার এখন আসামে আছে, আমির আলি তার ঠিকানাও জানে না।

হতাশভাবে জরিনা বলিল: তবে আমরার কি হৈব? পাইয়া ধন হারাইমু?

আমির আলি উৎসাহ দিয়া বলিল: তুমি কোনো চিন্তা কইর না জরিনা। আমি সেটাও ভাইবা ঠিক কইরা ফেলছি। নসিম সরকারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিনের কিনা; তাছাড়া তার সঙ্গে আমার একবার পাটের কারবার করার কথা হইছিল। আমরার মধ্যে অনেক চিঠি-পত্র লেখালেখি হৈত। আমার বেশ মনে আছে, তার এক চিঠিতে ওসমান সরকারের দস্তখতের কথা আছে।

সবকথা সবিস্তারে স্ত্রীকে বুঝাইয়া আমির আলি বলিল: তাজ্জবের ব্যাপার জরিনা, এমন একটা খোলাসা কথা আমার এতদিন মনে পড়ল না। না, তোমার সাথে কাজিয়া কইরাই এতদিন আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইছিল। আজ তোমার গুণেই সব তরতর কইরা মনে পইড়া যাইতাছে।

স্ত্রীকে একটা বড় রকমের চুমা দিয়া আমির আলি রান্নাঘর হইতে বাহির হইল। আর কোনদিকে মন না দিয়া সে নিজের পুরাণ চিঠির ফাইল লইয়া বসিল।

তেত্রিশ

রান্না-বান্না সারিয়া জরিনা যখন খাওয়ার জন্য স্বামীকে ডাকিতে আসিল, তখন সে দেখিল, তাজ্জব ব্যাপার! আমির আলি চিঠি-পত্র, বই-পুস্তক, খাতা-পত্র, বাক্স-পেটরা সব ছড়াইয়া ঘরের মেঝেয় জংগল করিয়া ফেলিয়াছে।

এইসব জংগল পরিষ্কার করিয়া মেঝেয় বিছানা করিতে তার আবার সারারাত লাগিবে জানিয়াও জরিনা বিরক্তি প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ দরদ-মাখা সুরে পুছ করিল: চিঠি পাওয়া গেল?

আমির আলি কাগজ-পত্র হইতে মাথা না তুলিয়াই জবাব দিল:

পাওয়া যাইব নিশ্চয়ই। তবে কোন্ জাগায় পড়ছে, তা মনে পড়তাছে না। প্রায় শেষ কইরা আন্‌ছি। পাওয়া গেল প্রায়।

স্বামীর জরুরী কাজে কোনো রকমে বিঘ্ন না ঘটাইয়া এক কোণে ছেলে-মেয়েদের কোনোমতে শোওয়াইয়া দিল। এসব করিতে তার বেশ সময় লাগিল। তখনও স্বামীর কাজ শেষ হয় নাই দেখিয়া সে আগে খাওয়ার কাজ সারিয়া লইতে বলিল।

'এই আস্‌তাছি' 'এই হৈল প্রায়' বলিয়া আমির আলি আরো আধঘণ্টা সময় নিল। তখন জরিনা নিজেই স্বামীর তল্লাশীতে সাহায্য করিতে গেল।

'এই—এই তুমি ছুঁইও না, সব গোলমাল হৈয়া যাইব' বলিয়া আমির আলি স্ত্রীর হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া নিল এবং কাগজপত্রের উপর সতরঞ্জি চাপা দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল : চল, খাওয়া-দাওয়াটা তবে সাইরাই লই। পাই পাই কইরা পত্রটা পাইতাছি না। পামু নিশ্চয়ই। এই সেদিনও কোথায় যেন পত্রটা দেখছি। তুমি চিন্তা কইর না, হারাইছে না পত্রটা। তোমার স্বামীর আর যত দোষই থাকুক, কাগজ-পত্র সে হারায় না কোনদিন।

স্বামী-স্ত্রীতে রান্নাঘরে খাইতে গেল। খাইতে বসিয়া আমির আলি বলিল : একটু সাবান-টাবান কিছু একটা আছে জরিনা ? হাত দুইটা একটু সাফ করা লাগব। অনেকদিন কাগজ-পত্রে হাত দেওয়া হৈছে না ত। তাই একটু ধুলা জমা হইয়া গেছে।

জরিনা দেখিল স্বামীর কব্‌জি পর্যন্ত দুই হাত একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে।

সে শোবার ঘরে গিয়া অনেক তালাশ করিয়াও গায়ে-মাখা সাবানটা পাইল না। অগত্যা ছেলেদের ময়লা কাপড় ধোয়ার সাবানের টুকরাটাই লইয়া আসিল। দরকারের সময় জিনিস-পত্র যে পাওয়া যায় না, অদরকারের সময় যে হাঁটিয়া যাইতে সে-সবে হোঁচট লাগে, এ বিষয়ে সে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ একমত হইল।

জরিনা লক্ষ্য করিল স্বামী ভাল করিয়া খাইল না। তাড়াতাড়ি লুক্‌মার উপর লুক্‌মা দিয়া পানি খাইয়া পেট ভরিয়া আমির আলি উঠিয়া পড়িল। খাওয়ার সময় একটা কথা বলিল না। হাত ধুইয়া এত তাড়াতাড়ি রওয়ানা হইবার চেষ্টা করিল যে, পায়ের ধাক্কার চোটে এক-এক খড়ম এক-এক দিকে ছুটিয়া গেল। তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে সেগুলি পায়ে লাগাইয়া উঠানে কুলি ফেলিয়া আমির আলি ঘরে ঢুকিল।

জরিনা কল্পনায় দেখিল স্বামী আবার কাগজ-পত্রে ডুবিয়া গেল।

নিজে খাইয়া হাঁড়ি-কুড়ি ধুইয়া পাকঘরের সব জিনিস-পত্র সিজিল করিয়া আসিতে জরিনার অনেক দেরি হইল। আসিয়া দেখিল স্বামী তেমনি কাগজ-পত্র ঘাঁটিতেছে। বড় বড় বই ও খাতার এক-একটি করিয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছে। চিঠি-পত্র ফেলিয়া খাতা-পত্রের পাতা উল্টাইতেছে দেখিয়া জরিনার ভয় হইল। তবে বা চিঠি পাওয়া যায় না!

সে স্বামীকে প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। যদি সে নৈরাশ্যজনক উত্তর দেয়, তবে ত জরিনা মূর্ছা যাইবে। তার বুক যে ধড়ফড় করিতেছে! ঐ চিঠির উপরই যে স্বামীর জেল হইতে বাঁচা নির্ভর করিতেছে!

জরিনা অন্যকথা পাড়িল। স্বামী কি তখনও তামাক খায় নাই? কি লজ্জা! জরিনা ইতিমধ্যে একটা ছিলিম সাজিয়া দিয়া গেল না কেন? হাঁড়ি-কুড়ি পরে ধুইলেই ত চলিত।

সে তাড়াতাড়ি একটা ছিলিম সাজিয়া স্বামীর সামনে রাখিয়া দিল। দুই-একবার তাকিদ করিল। স্বামী 'হুঁ হুঁ' করিয়া জবাব দিল, 'এই খাই' বলিয়া খাইবার ইচ্ছাও জানাইল। কিন্তু খাইল না। কাগজপত্র হইতে সে মুখ উঠাইল না। সে মাঝে মাঝে ঘরের চারিদিকে, কাঠের বাক্সটার দিকে, জরিনার পোর্টমেণ্টের দিকে, শিকায় তোলা হাঁড়ি-কুড়ির দিকে চাহিতে লাগিল। তামাকটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া শেষ হইয়া গেল। জরিনা তেমনি স্বামীর পাশে বসিয়া রহিল। সে স্বামীর ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিল, কাগজপত্রে আর আশা নাই বলিয়া স্বামী অন্যত্র তালাশ করিতেছে। সে কোনো কাজে লাগিতেছে না সত্য, কিন্তু এই জীবন-মরণের জরুরী কাজে

স্বামীকে একা ফেলিয়া সে শুইতেও যাইতে পারিল না। কখন কোন্ দরকার লাগে কে জানে?

হ্যারিকেনের আলো ঘোলাটে হইয়া আসিল। আমির আলি কাগজ হইতে চোখ না সরাইয়া হাত বাড়াইয়া হ্যারিকেনটা ঝাঁকি দিয়া দেখিল তেল নাই। এইবার সে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল: তেল ফুরাইয়া গেল যে।

যেন তার জীবনের বাতির হায়াতের তৈলই ফুরাইয়া গিয়াছে, চোখে মুখে গলার আওয়াযে এমনি নৈরাশ্য।

জরিনা জানে বোতলেও তেল নাই। কিন্তু সেকথা বলিতে সাহস পাইল না। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে গেল। সে-ঘরের কুপ্পিতে কিছু তেল ছিল। কুপ্পিটা আনিয়া সে হ্যারিকেনে ঢালিল।

কিন্তু কোনো ফল হইল না। হ্যারিকেন নিভিয়া যাইতে লাগিল।

জরিনা ভয়ে ভয়ে বলিল: রাতও অনেক হৈছে। আজ থাক, কাল সকালে তালাশ করলেই চলব।

আমির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল: আচ্ছা, তাই হোক। কিন্তু—

জরিনা আবার ঘাবরাইয়া উঠিল। কিন্তু কি? তবে কি তল্লাশী ব্যর্থ হইয়াছে? ভয়ে সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের দিকে সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

আমির আলি তাড়াতাড়ি সতরঞ্জিটা টানিয়া কাগজপত্রের উপর বিছাইয়া দিল। জরিনা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বিছানা করিল।

অনেকরাত পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর কারো ঘুম হইল না। অবশেষে আমির আলি বলিল: চিঠিটা না পাবার কোনো কারণ নাই। নসিমুদ্দিনের আর সবগুলি পত্র পাইলাম, অথচ সেই কাজের পত্রটা পাইতাছি না কেন, বুঝবার পারতাছি না। তুমি কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছিলা না ত?

জরিনা দুঃখিত হইল। তাকে সন্দেহ! সে এত করিয়া সারাদিন তল্লাশীতে স্বামীর সহায়তা করিল, অথচ এখন তারই ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা! সে রাগত-সুরে বলিল: আমি চিঠিটা লুকাইয়া রাখছি নাকি?

আমির আলি সে অর্থে কথাটা বলে নাই। সে মনে করিয়াছিল, ঘর ঝাড়ু দিবার সময় জরিনা কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করিয়া থাকিতে পারে। এই সাধারণ কথাটায় জরিনার চটিয়া যাওয়ার কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু জরিনা আমির আলির কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না। সে ওয়াদা করিল আর যদি সে আমির আলির কাগজ-পত্র ছোঁয় কখনো, তবে—

এরপর স্বামী-স্ত্রীতে আর কোনো কথা হইল না। অবশেষে দুজন দুদিকে ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে আমির আলি যখন আবার কাগজ-পত্র লইয়া বসিল, তখন জরিনা তার পাশ দিয়াও আসিল না। বরঞ্চ নিজের চাবির তাড়াটা আমির আলির দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলঃ আমার বাক্সটাও দেখবার পার।

আমির আলি কোন জবাব দিল না। বরং খুশী হইল। কারণ কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাটির সময় কেউ ডিস্টার্ব না করাই ভাল। তাতে ভুল হইয়া যাইতে পারে, কোনো কাগজ চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে।

জরিনা শুধু যে ঘরে আসিল না তা নয়। ছেলে-মেয়েগুলিকেও ঘরের দিকে আসিতে দিল না। রাত্রে সে যতই রাগ করুক, আজ সে বেশ বুঝিতেছে, অত কাগজ-পত্র হইতে এক টুক্‌রা কাগজের একখানা চিঠি বাহির করা কঠিন কাজ। একমনে তালাশ করিতে না পারিলে সেটা হইবে না। কাজেই রাগের বশে নয়—আন্তরিকভাবেই সে স্বামীকে নির্বিঘ্নে তালাশ করিতে দিল। ছেলে-মেয়েগুলির উপর সর্বদা নযর রাখা সম্ভব নয় বলিয়া সে বাহির হইতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্বামীকে ডাকিয়া সেকথা জানাইয়া দিল। তার কোন দরকার হইলে সে যেন জরিনাকে ডাক দেয়।

আমির আলি ভিতর হইতে বলিলঃ আচ্ছা।

সকালে নাশ্‌তা-টাশ্‌তা কিছু খাওয়া হইল না। আমির আলি খাইল না বলিয়া জরিনাও খাইল না। ছেলেমেয়েদের মুঠ মুঠ করিয়া চিড়ামুড়ি দিয়া বিদায় করিল।

সারা সকালটা জরিনা রান্নাঘরেই কাটাইল বটে, কিন্তু মন স্থির করিয়া সে একটানা সে-ঘরে থাকিতে পারে নাই। মনটা তার শোবার ঘরে স্বামীর পাশেই ঘোরাফেরা করিতেছে। এই বুঝি স্বামী 'পাইছি পাইছি' বলিয়া ডাক দিতেছে—কতবার সে কান খাড়া করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাঝে মাঝে অসহ্য হওয়ায় সে পা টিপিয়া টিপিয়া শোবার ঘরের সামনে দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, সাহস করিয়া এক-আধবার জানালার ফাঁক দিয়া উঁকিও মারিয়াছে। কিন্তু স্বামী তখনও নিবিষ্টমনে কাগজের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

সে শতবার চঞ্চল-পদে এইরূপ আনাগোনা করিয়াছে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সেই 'পাইছি পাইছি' কথা তার কানে আসে নাই।

চিন্তা ও উদ্বেগে জরিনা যখন একরূপ ক্ষতবিক্ষত, সেইসময়ে দুপুরের একটু আগে জরিনা দরজার খটখটানি শুনিতে পাইল। সে পাকঘর হইতে বাহির হইয়া দৌড় দিল। শুনিল স্বামী ডাকিতেছে: জরিনা, ও জরিনা।

জরিনা তাড়াতাড়ি শিকল খুলিয়া দিল। আমির আলি হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। তার হাতে একখানা পুরাতন পত্র। সে বলিল: জরিনা, খোদা মিলাইছে।

'পাওয়া গেছে? দেখি।'—বলিয়া জরিনা পত্রখানা স্বামীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। রাত্রের কসম খাওয়ার কথা সে একদম ভুলিয়া গেল।

পত্রখানা হাতে লইয়া সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। সত্যই অনেক দিনের পুরাণ লেপাফা। লেপাফার উপর ইংরাজীতে তার স্বামীর নাম লেখা। সে কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলিল। চোখ তার চিঠিটার উপর ঘোড়-দৌড় করিতে লাগিল। হাঁ, এই চিঠিই বটে। এই ত ওসমান সরকারের দস্তখতের কথা লেখা আছে। ঠিক ঠিক। ইয়া আল্লাহ্! তোমার হাজার শোকর।

জরিনা স্বামীর হাতে চিঠিটা ফেরৎ দিয়া 'হাজার শোকর' 'হাজার শোকর' তিন চার বার বলিয়া মুখে দুহাত মলিল। তারপর খুশীর চোটে স্বামীকে একটা কদমবুসি করিল। আমির আলি স্ত্রীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

বলিল ঃ জরিনা, এইবার ? এইবার ওসমান সরকার কোন্ দিকি যাব ? তার সব জারিজুরি এইবার ভাঙব না ?

তার মুখে দৃঢ়তা ও প্রতিহিংসা ফুটিয়া উঠিল। জরিনার বুক আনন্দে পুলকে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। নির্দোষের পক্ষে আল্লাহ্। তিনি বেগোনাকে কখনো শাস্তি দেন না।

আমির আলির হাতে তখন খোলা পত্র ও লেপাফাটা ঝুলিতেছিল। জরিনার লোভ হইল আবার ঐ পত্র দেখে, একশবার পড়ে। ওটা যেন প্রথম যৌবনের প্রেমপত্র। সে পত্রটা আবার স্বামীর হাত হইতে কাড়িয়া লইল। পত্রটায় চুমা দিবার তার ইচ্ছা হইল। কিন্তু লোভ সম্বরণ করিয়া সে পত্রটা পড়িল। একবার দুইবার তিনবার। তৃপ্তি আর মিটে না। হে পত্র! তুমিই জরিনার স্বামীকে জেল হইতে বাঁচাইবার জন্য, জরিনার ছেলেমেয়েকে দারিদ্র দূরবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ফেরেশ্তা রূপে নাযিল হইয়াছ।

চিঠিটা পুরাতন হইলেও কত সুন্দর! কি সুন্দর নসিমুদ্দিন সরকারের হাতের লেখা! দেখিতে ঠিক জরিনার স্বামীর হাতের লেখার মতই। দুই জন ক্লাসফ্রেণ্ড ত। একই মাষ্টারের কাছে পড়িলে হাতের লেখা একরকম হইয়াই থাকে। যারা জরিনার সাথে একই মক্তবে পড়িয়াছে, তাদের হাতের লেখাও প্রায় জরিনারই মত।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া ওরা সমস্ত কাগজ-পত্র, বই-পুস্তক, খাতা-পত্র, বাক্স-পেটরা সাজাইল। এই উপলক্ষে ঘরটা ভাল করিয়া সাফ করা হইল। নূতন করিয়া জিনিস-পত্র সাজান হইল।

তারপর সাবান দিয়া ভাল করিয়া গোসল করিয়া উভয়ে পেট ভরিয়া খাওয়া-দাওয়া করিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আমির আলি যখন উকিলের বাসা হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন তার মুখে আর হাসি ধরে না। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল ঃ জরিনা, উকিল কৈল, জুরিরা এই পত্র পাইয়া আমার পক্ষে রায় দিতে বাধ্য। যতই বল জরিনা, আমি এই মামলায় খালাস পাইয়াই কিন্তু ওসমান সরকারের নামে খেসারতের মামলা দায়ের করমু। দেখি কে তখন বেটাকে বাঁচায়।

চৌত্রিশ

সেবার বসন্ত একটু সকাল-সকাল আসিয়াছে। শীত চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণা হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। শীতের পরে অনেক গাছে নূতন পাতা ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ওয়াজেদ অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। এখন সে লাঠিতে ভর দিয়া বাড়ির বাহির হয়, পুকুর-পাড় দিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রোড বোর্ডের সড়ক পর্যন্ত বেড়াইয়া আসে। এখন সে বেশ হাঁটিতে পারে। পায়ের দুর্বলতা এখন আর নাই বলা যায়।

শীতের পরে বসন্ত। দক্ষিণা হাওয়া ওয়াজেদের নাকে-মুখে-বুকে শীতল পরশ দিয়া চলিয়া যায়। তার মন চঞ্চল হয়। চারিদিকে গাছে গাছে নূতন পাতা। এ যে নয়া জীবনের শুরু। ওয়াজেদের নয়া জীবন শুরু হইয়াছে। সে কঠোর বিভীষিকাময় অতীত ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনে তার বসন্ত দেখা দিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার আগে আগে চারিদিকের প্রকৃতির সাথে এমনি করিয়া নিজের জীবনের মিল দেখিতেছে। হঠাৎ দেখিল একটি ছইওয়ালা গরুর গাড়ি তাদের বাড়ির দিকে আসিতেছে। সে দূর হইতে দেখিল, গাড়ি তাদের পুকুর-পাড় ঘুরিয়া বাহির বাড়ির উঠান পার হইয়া সদর দরজায় গিয়া থামিল।

ঐ গাড়িতে কারা আসিয়াছেন, ওয়াজেদ তা জানিতে পারিল। গাড়ি দেখিয়াই তার বুক দুরুদুরু শুরু হইয়াছিল। এবার সে নিশ্চিত হইল। হাঁ, সেই গাড়িই বটে। তার সারা দেহে একটা পুলকের বিজলি খেলিয়া গেল।

যায়েদার কাছে ওয়াজেদ শুনিয়াছিল, লুৎফুন তাদের হোষ্টেল হইতে এবং তার মা দেশের বাড়ি হইতে এখানকার বাসায় আসিয়াছেন। মা লুৎফুনের মাকে দাওয়াৎ করিয়াছেন। লুৎফুনকে লইয়া একদিন বেড়াইতে আসিবার দাওয়াৎ। একরাত থাকিবার অনুরোধ। লুৎফুনের মা সে দাওয়াৎ কবুল করিয়াছেন। যে কোনোদিন তাঁরা আসিতে পারেন।

তাঁরাই আসিয়াছেন। ওয়াজেদের মন বাড়ির দিকে দৌড় দিল। কিন্তু তার পা সরিল না। কি রকম যেন শরম-শরম করিতে লাগিল। ভাবি ও বুবু বলিবেন লুৎফুনের গন্ধ পাইয়া ওয়াজেদ বেড়ান ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। যদিও অন্যান্য দিন এইসময় সে বেড়ান শেষ করিয়া বাড়ি ফিরে, এর বেশী দেরি করিলে মা বকেন, ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া সোয়মার পাড়েন, তবু আজ ওয়াজেদ এখনই বাড়ি ফিরিতে পারে না। অন্যান্য দিনের চেয়ে সে একটু দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিবে।

যদিও এই দেরি করাতে তার মনের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেল, তথাপি শেষ পর্যন্ত সে দেরি করিয়াই অন্দরে ঢুকিল। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ওয়াজেদ নিজের কামরায় ঢুকিল। টেবিলের উপর মিট্‌মিট্ করিয়া হ্যারিকেন জ্বলিতেছিল। সে ঘরে ঢুকিয়াই হ্যারিকেনটা তেজ করিয়া দিল। চিমনিটা যেন সেদিন আর দিনের চেয়ে অনেক বেশী ধপধপা সাফ। সারা ঘর আলোকে হাসিয়া উঠিল।

ওয়াজেদ হাতের লাঠিটা এক কোণে রাখিয়া চেয়ারে বসিল এবং স্যাণ্ডাল পরিবার জন্য জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। কিন্তু দৃষ্টি জুতার ফিতার দিকে ছিল না, ছিল উঠানের দিকে। ওঁরা কোন্ ঘরে উঠিয়াছেন, উঠানে চলাফেরা করিতেছেন কিনা, তাই ঠাহর করিবার জন্য ওয়াজেদ চোখ ও কানকে একসঙ্গে ঐ কাজে লাগাইল। কিন্তু কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। তবে কান যেন বলিল, মার ঘর হইতে কথাবার্তার একটু গুন্‌গুন্ শোনা যাইতেছে।

ওয়াজেদ কদিন হইতেই রীতিমত শেভ করে। যায়েদার কাছে লুৎফুনদের বেড়াইতে আসার সংবাদ শোনা অবধি রোজই করে। আজও সকালে করিয়াছে। জুতা খুলিয়া স্যাণ্ডাল পায়ে লাগাইয়া সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। নিজের চেহারাটা আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। সারিয়া উঠিবার জন্য, স্বাভাবিক চেহারা ফিরিয়া পাইবার জন্য কতদিন ধরিয়া সে অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। বড় ধীরে ধীরে উন্নতি হইতেছে।

কিছুদিন আগে সরকার সাহেবের এক পত্রের উত্তরে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, ওয়াজেদ যদিও টেষ্ট পরীক্ষা দেয় নাই, তথাপি ছাত্রহিসাবে তার মেরিট বিবেচনা করিয়া তাকে বি-এ পরীক্ষায় বসিতে দেওয়া হইবে। এই খবর পাওয়া অবধি ওয়াজেদ সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়া হলে ফিরিয়া যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। সে এতদিন আশা করিতেছিল যে, আর দশ পনর দিনের মধ্যেই সে হলে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। ডাক্তার সাহেবও সে আশা দিয়াছেন।

কিন্তু আজ ওয়াজেদের মনে হইতেছে, তার চেহারার মোটেই উন্নতি হইতেছে না। চোখ দুইটা এখনো কোটরে পড়িয়া রহিয়াছে। অসুখের সময় মাথা নেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চুলগুলি এখনো যথেষ্ট লম্বা হয় নাই। গালের গোশ্‌ত এখনো ভরিয়া উঠে নাই।

সে চোখ দুইটা উপরে নীচে টানিয়া, গাল টিপিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল দেখাইবার চেষ্টা করিল। হাসিলে সে কেমন দেখায়, তা দেখিবার জন্য কয়েক রকমের হাসি হাসিল, অবশ্য নিঃশব্দে।

না, এই চেহারা লইয়া লুৎফুনের সামনে পড়ার সাহস তার নাই। লুৎফুন কি মনে করিবে ? তার প্রতি লুৎফুনের ভাব বদলাইয়া যাইবে না ত ?

—ওয়াজেদ।

বোনের গলা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল এবং যেন কিছু না এই ভাব করিয়া সরিয়া গিয়া বলিল ঃ জি।

—খালাআম্মা তোমারে দেখ্‌তে আসতেছেন।

ওয়াজেদ ঝটিতি গিয়া পালঙ্কের পাশে বসিয়া পড়িল। আগে লুৎফুনের মা পিছে ওয়াজেদের মা ঘরে ঢুকিলেন।

ওয়াজেদ এঁকে আর দুইদিন মাত্র দেখিয়াছে—একদিন রাস্তায় সেই প্রথম পরিচয়ের দিন, আরেকদিন অসুখের মধ্যে। অসুখের সময়কার কথা তার ভাল মনে নাই। তাই যায়েদা আগে বলিয়া না রাখিলে ওয়াজেদ এঁকে হঠাৎ চিনিতে পারিত না। সে উঠিয়া গিয়া মহিলার কদমবুসি করিল।

লুৎফুনের মা ওয়াজেদের মাথায় হাত দিয়া 'আল্লাহ্‌ হায়াৎ দারায করুক'

বলিয়া যায়েদার আগাইয়া দেওয়া চেয়ারটাতে বসিলেন। ওয়াজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুচার কথা জিগ্‌গাস করিলেন। ওয়াজেদ যথারীতি তার জবাব দিল।

তারপর ওয়াজেদের মা ও লুৎফুনের মার মধ্যে যে আলাপ শুরু হইল, তাতে ওয়াজেদের যোগ দেওয়ার কোনো দরকার হইল না। ও-আলাপ করিবার জন্য তাদের এ ঘরে আসার কোনো দরকার ছিল না। অর্থাৎ ওয়াজেদের মা ওয়াজেদের এবং লুৎফুনের মা লুৎফুনের তারিফ করিতে লাগিলেন। যায়েদা সময় বুঝিয়া কখনো এ-পক্ষ কখনো ও-পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। ওয়াজেদের মার প্রতিপাদ্য এই যে, কলেজে ওয়াজেদের মত ভাল ছাত্র আর একটিও নাই। একথা প্রফেসাররা নিজেরাই বলিয়া থাকেন; এবং টেষ্ট পরীক্ষা না দিয়াও ওয়াজেদ যে এলাও হইয়াছে এর জন্য ওয়াজেদ বা তার বাবার কিছু বলিতে হয় নাই, প্রফেসাররাই গরজ করিয়া এটা করিয়া দিয়াছেন। তাছাড়া, ওয়াজেদ বি-এ পাশ করিলেই যে ডিপুটি-গিরি লইয়া গবর্ণমেণ্ট ওয়াজেদের পিছে পিছে খোসামুদ করিয়া বেড়াইবেন, এমনও লক্ষণ চতুর্দিকেই দেখা যাইতেছে।

আর লুৎফুনের মাও সত্য ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, বিদ্যাময়ী স্কুলে বর্তমানে পড়াশোনায়, গানে, বাজনায়, নাচে, আবৃত্তিতে এবং সিলাইএ লুৎফুনের মত ভাল মেয়ে আর একটিও নাই। এ সবের কোন-কোনটার সে প্রাইজও পাইয়াছে। রান্না-বান্নাতেও লুৎফুন এই বয়সেই তার মাকে হারাইয়া দিয়াছে।

ওয়াজেদ যথারীতি নিজের তারিফের সময় লজ্জা পাইয়াছে এবং লুৎফুনের তারিফের সময় হা করিয়া গিলিয়াছে।

এই ধরণের আলাপে অনেক সময় কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সরকার সাহেবের এক্কা ফিরিবার আওয়ায পাওয়া গেল। খাবার সময়ও হইয়া আসিল।

সকলে উঠিয়া গেলেন।

পরদিনও ধূমধামের মধ্যেই কাটিল। বিকালবেলা তাঁরা বিদায় হইয়া গেলেন। ওয়াজেদের মনে হইল ওঁরা চলিয়া যাইবার পর যেন বাড়িটা

খা খা করিতে লাগিল। মাত্র একটি দিনের প্রবাসী দুইজন লোক চলিয়া যাওয়াতেই একটা বাড়ি যে এমন খালি-খালি লাগিতে পারে, ওয়াজেদ ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইল। অথচ এই দুইজন লোকের একজনকে সে দেখেই নাই। সে যে এ বাড়িতে আসিয়াছিল, এটা তার একেবারেই শোনা কথা। কারণ এই দুইটা দিনে ওয়াজেদ লুৎফুনকে একনযর দেখা দূরের কথা, অত কান পাতিয়া থাকিয়াও সে একটিবার তার গলার স্বর বা হাসির আওয়াযও শুনতে পায় নাই।

লুৎফুন তার সাথে দেখা করে নাই বলিয়া প্রথমে ওয়াজেদ লুৎফুনের উপর রাগ করিয়াছিল। কিন্তু যায়েদার নিকট সে জানিতে পারে যে, বিয়ার কথাবার্তা হইলে দুলা দুলহাইনে দেখা হইতে নাই ইহাই নিয়ম। লুৎফুনের মত শিক্ষিতা মেয়ের এই কুসংস্কার মানা উচিত ছিল না বলিয়া ওয়াজেদ যায়েদার নিকট মন্তব্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন ওয়াজেদ সেটা মানিয়া লইয়াছে এবং লুৎফুনের উপর তার রাগও দূর হইয়াছে।

এর পর হইতে ওয়াজেদের বিকালের বেড়ানর সময়টা আরও লম্বা হইয়া যায়। সে একটু সকাল সকাল বাহির হইয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে অনেক দূর চলিয়া যায়। সরকারী ডাক্তারখানা ওয়াজেদের বাড়ি হইতে সড়ক ঘুরিয়া প্রায় একমাইল। ওয়াজেদ এর পর হইতে এই একমাইল রাস্তা হাঁটিয়া রোডবোর্ডের রাস্তা ধরিয়া ডাক্তারখানার পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসে। ডাক্তারখানার পাশ দিয়া যাইবার সময় ডাক্তারখানার পিছনে অবস্থিত ডাক্তারের কোয়ার্টারের দিকে আড়চক্ষে পুনঃপুনঃ নযর করে। যদিই সে একবার নযরে পড়িয়া যায়। ওয়াজেদের মতলব একদিনও সফল হয় না। কিন্তু আজ হয় নাই, কাল নিশ্চয় হইবে আশা করিয়া সে পরদিনও তেমনি-ভাবে সেই রাস্তায় অগ্রসর হয়।

ইতিমধ্যে ওয়াজেদ একদিন শুনিয়াছিল আমির আলির দায়রার মামলা অমুক দিন। শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। তার মুখ হইতে একটিমাত্র শব্দ বাহির হইয়াছিল, 'তাই নাকি?' তারপর সে সব ভুলিয়া গিয়াছে। তারিখটা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। সে লুৎফুনের ভাবনায় এত মশগুল যে,

আমির আলির মামলার কথা মনে হইলেই তাকে তৎক্ষণাৎ মন হইতে তাড়াইয়া দেয়। লুৎফুনের ভাবনা তার মনে এমন পুলক সৃষ্টি করে যে, ওর মধ্যে মামলার কথা আমলই পায় না। সুন্দর সুসজ্জিত লোকের উদ্যান-সম্মিলনীতে একটা ময়লা কুষ্ঠরোগী ঢুকিয়া পড়িলে উহা যেমন বেমানান দেখায়, ওয়াজেদের মনের রমণীয় কল্পনার ভিড়ের মধ্যে আমির আলির মামলার ভাবনাটা তেমনি অপাংক্তেয় হইয়া উঠে। আস্তে আস্তে সে ভাবনা মুছিয়া যায়।

সুতরাং ওয়াজেদ যেদিন সকালে উঠিয়া বাবার সাজসাজ রব শুনিয়া বুঝিল যে মামলার তারিখ আজ, তখন সে হঠাৎ মর্মাহত হইল। কিন্তু সে বাড়ির বাহির হইতে সাহস করিল না। যতক্ষণ বাবা বাড়ি ছাড়িয়া না গেলেন, ততক্ষণ ইচ্ছা করিয়াই সে তাঁর সামনে পড়িল না। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করিতে লাগিল।

বাবা লোকজন লইয়া বাড়ি হইতে বিদায় হওয়ার পরও ওয়াজেদ ঘর হইতে বাহির হইল না। তার কেমন যেন ভয় হইতে লাগিল বাহির হইলেই আমির আলির সাথে, অন্ততঃ তার লোকজনের সাথে ওয়াজেদের দেখা হইয়া যাইবে, তারা ওয়াজেদকে ঠাট্টা করিবে।

সারাদিন কাটিল ওয়াজেদের অত্যন্ত অসোয়াস্তির মধ্যে। এত অসোয়াস্তির মধ্যেও সে বাড়ির বাহির হইল না। বরাবরের বিকালের বেড়ানটাও সে আজ বাদ দিল। কামরার মধ্যে এবং বারান্দায় পায়চারি করিয়াই সে সারাটা দিন কাটাইয়া দিল।

অবশেষে সন্ধ্যার সময় ওয়াজেদদের একটা লোক সাইকেলে বাড়ি ফিরিল এবং মামলা জয়ের খবর আনিল।

জুরীরা সকলে একমত হইয়া আমির আলিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। জজ সাহেব তাঁকে চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জজ সাহেব তাঁর রায়ে বলিয়াছেন যে, দায়রা আদালতে আসামী একটি জাল পত্র দাখিল করাতেই তার দণ্ডের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন।

বাড়ির মেয়েরা, পাড়া-পড়শী, ছেলে-মেয়েরা বিপুল আগ্রহে এই খবর

শুনিতেছিল। নূতন জাল পত্রের কথা শুনিয়া তারা জিগ্‌গাস করিল: এটা আবার কি?

উত্তরে খবর-বাহক সবিস্তারে যা বলিল তার সারমর্ম এই যে, নসিম সরকার নামে একটা লোকের লেখা পুরাণ চিঠি বলিয়া আমির আলি এক পত্র দাখিল করিয়াছিল। ইন্‌ভেলাপের উপরের ঠিকানা লেখাটা ঠিকই নসিম সরকারের লেখা ডাকে-আসা পত্রের লেপাফাই ছিল বটে, কিন্তু ভিতরের চিঠিটা ছিল জাল। জজ ও জুরীরা একমত হইয়াছেন যে, ওটা আমির আলির নিজের হাতের লেখা। সম্প্রতি লিখিয়া উহাকে কৃত্রিম উপায়ে পুরাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জজ সাহেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মামলার সাক্ষী-প্রমাণ এমন করিয়া জাল করিয়া কোর্টকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতে পারে, সে যে ওসমান সরকারের নাম জাল করিয়াছিল, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

'খোদার বিচার খোদা করিয়াছেন,' 'আমির আলিটা আদত বদ্‌মায়েশ,' এই ধরণের মন্তব্য করিতে করিতে দরবার ভাঙিয়া যে যার মতে চলিয়া গেল।

ওয়াজেদ নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া কান পাতিয়া সব শুনিতে ছিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আল্লাহ্‌ তার বাবার ইয্‌যৎ রক্ষা করিয়াছেন, এতে সে নিশ্চয় খুবই আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু আমির আলি খাঁর ঐ কঠোর দণ্ড না হইলেই কি হইত না? সে যে নিজে জানে ঐ ব্যাপারে আমির আলি নির্দোষ। ওয়াজেদের চোখের উপর দিয়া একটা নির্দোষ লোকের চার বছর জেল হইয়া গেল! সে নিজের বিবেকের কাছে আর মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

কিন্তু সম্ভবতঃ আমির আলি ওয়াজেদের এই সহানুভূতির যোগ্য নয়। সত্যই ত যে ব্যক্তি জাল প্রমাণ সৃষ্টি করিয়া কোর্টকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতে পারে—। জজ সাহেব ঠিক কথাই ত বলিয়াছেন।

ওয়াজেদের চিন্তা আরো উচ্চস্তরে উঠিয়া গেল। নির্দোষ লোকও

তবে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য অন্যায়ের আশ্রয় লইতে পারে? যদি লয়, তবে তার নির্দোষিতা কি নষ্ট হয় না? আমির আলির মূল নির্দোষিতা তার পরবর্তী অপরাধে নষ্ট হইয়া গেল না কি? নিশ্চয় হইয়াছে।

যাক। ওয়াজেদ বাঁচিয়া গেল। একজন নির্দোষ লোককে সে বাঁচাইল না বলিয়া এতদিন ওয়াজেদের যে অপরাধটা ছিল, সেটা আজ কাটিয়া গেল।

এতদিন সে মনের গোপন কোণে নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া আসিতেছিল। আজ দেখিল সেটা নিতান্তই এক-তরফা চিন্তা। ও-ভাবে দুনিয়ার সত্যমিথ্যার বিচার চলে না। মানুষের সাধুতা-অসাধুতা, তার জীবনের ন্যায়-অন্যায় কোনো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়। ওটা একটা অখণ্ড সমষ্টি।

ওয়াজেদ তবে নৈতিক স্তরেও লুৎফুনের অযোগ্য নয়। সে লুৎফুনের চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

পঁয়ত্রিশ

সেদিন শনিবার। স্কুল-মাদ্রাসা সকাল সকাল ছুটি হইয়াছে। ছাত্রদের অনেকে মাঠে খেলিতেছে। শিক্ষকদের বেশীর ভাগ বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। উপরের দিক্‌কার কয়েকজন তখন হেড মাষ্টারের রুমে দরবার করিতেছেন।

এমনসময় জামালুদ্দিন সরকার 'আদাব' 'আদাব' বলিয়া সেই রুমে প্রবেশ করিলেন। শিক্ষকরা সকলে উঠিয়া তাঁকে সম্মান করিলেন। জামাল সরকার হাতের লাঠিটা টেবিলের উপর রাখিয়া একটি চেয়ার দখল করিলেন।

জামাল সরকার ইউনিয়ন বোর্ডের একজন মেম্বর এবং স্কুলের সেক্রেটারি। তিন বছর আগে ওসমান সরকারই এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। স্কুলের একস্-ওফিসিও প্রেসিডেণ্ট সদরের এস-ডি-ও সাহেবের অনুরোধে তিন বছর আগে সরকার সাহেব সেক্রেটারিগিরিতে পদত্যাগ

করেন। কারণ সরকার সাহেবকে ইউনিয়ন বোর্ড ও কোর্ট-বেঞ্চের প্রেসিডেণ্টরূপে এবং সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, স্কুলের কাজে নযর দিবার তাঁর মোটেই ফুরসুৎ হয় না। এটা অবশ্য অন্যের মত, সরকার সাহেবের নিজের মত নয়। তিনি নিজে মনে করিতেন কাজের লোক যে, সে দশটা কাজ একসঙ্গে করিতে পারে। অকাজের লোক একটাও পারে না। কাজেই তাঁর সেক্রেটারিগিরিতে স্কুলের কোনো অবনতি বা অনিষ্ট হইতেছে, এটা তিনি মানিতেন না। সব কাজই সরকার সাহেব করেন বলিয়া যাদের চোখ টাটায়, এটা সেই শ্রেণীর লোকেরই একটা প্রচারণা মাত্র। যা হোক, এস-ডি-ও সাহেবও যখন ঐ মত পোষণ করেন, তখন যাক গিয়া ঐ বাজে সেক্রেটারিগিরি। গরজ কি তাঁর অত ঝামেলা পোহাইবার ?

তাঁর পদত্যাগের পর যখন এস-ডি-ওর ইশারায় জামালুদ্দিন সরকার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন, তখন সরকার সাহেব মনে মনে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন যে, এটা জামাল সরকারেরই চক্রান্ত। সেই হইতে জামালুদ্দিনের উপর তাঁর কড়া নযর ছিল। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের অনেক ব্যাপারে জামালুদ্দিন মোটামুটি ওসমান সরকারের সমর্থক ছিলেন বলিয়া তিনি জামালুদ্দিনের বিরুদ্ধে কখনো কোনো কথা বলিতেন না। বরঞ্চ এটা জানাজানি হইয়াছিল এবং এ ধারণা অনেকেরই আজো আছে যে, ওসমান সরকারই জামাল সরকারকে স্কুলের সেক্রেটারি বানাইয়া স্কুলটি নিজের তাবে রাখিয়াছেন। এ প্রচারণার মূলে ওসমান সরকারের যথেষ্ট হাত ছিল।

কিন্তু এবারকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের কিছু আগে জামালুদ্দিন সরকার একদিন গোপনে ওসমান সরকারকে না দাঁড়াইতে উপদেশ দেওয়ায় এবং শেষ পর্যন্ত ক্যানভাসিংএ নিরপেক্ষ থাকায় ওসমান সরকারের ধারণা হয়, তলে তলে জামালুদ্দিন শত্রুপক্ষে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন।

তারপর আমির আলির মামলার সময় সরকার সাহেবের চোখে জামালুদ্দিনের স্বরূপ আরো স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক যদিও বিদেশী, তবু বিভিন্ন মাতব্বরের বাড়িতে জায়গীর থাকার

দরুণে তাঁরা স্থানীয় রাজনীতি হইতে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ যে কয়েকজন শিক্ষক ওসমান সরকার ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং দলের পাণ্ডাদের বাড়িতে জায়গীর থাকেন, তাঁরা অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এই মামলার তদবিরের ব্যাপারেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়াইয়া পড়েন। শরাফত মণ্ডলের দলের লোকদের বাড়িতে স্কুলের শিক্ষকদের জায়গীর খুব বেশী ছিল না। কিন্তু ছাত্র-জায়গীর যথেষ্ট আছে—এই যুক্তিতে নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া সেক্রেটারি জামাল সরকার ও হেড মাষ্টার মান্নান সাহেব স্কুলের সকল শিক্ষকের উপর নিরপেক্ষ থাকার নির্দেশ জারী করেন। এতে কার্যতঃ ওসমান সরকারের পক্ষেরই লোকসান হয় বেশী। তাই ওসমান সরকারের দৃঢ়বিশ্বাস, জামালুদ্দিন সরকারই আমির আলিকে জিতাইয়া দিবার কৌশলস্বরূপ এই নিরপেক্ষতার ভান করিয়াছেন।

কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, হেড মাষ্টার মান্নান সাহেব সত্যসত্যই খুব কড়া লোক। তিনিই সেক্রেটারিকে রাযী করিয়া এই নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন। কারণ প্রথমতঃ নীতিহিসাবে শিক্ষকদের এইরূপ মামলা-মোকদ্দমা-ঘটিত দলাদলিতে যোগদানের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই মোকদ্দমায় দোষী-নির্দোষিতা সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল আমির আলির পক্ষে। সেটা তিনি ভাষায় কখনো প্রকাশ করেন নাই। তবে আভাসে-ইঙ্গিতে কাজে-কর্মে তা বুদ্ধিমানদের চোখে গোপন থাকে নাই। স্বয়ং ওসমান সরকারের কাছেও না।

বরং জামালুদ্দিন সরকার নিজে এ ব্যাপারে সত্যসত্যই নিরপেক্ষ লোক ছিলেন। কারণ কোন্ পক্ষ যে দোষী, তা তিনি সত্যই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে আমির আলি দায়রায় সোপর্দ হওয়ার পর এ বিষয়ে তাঁর মন ওসমান সরকারের পক্ষেই কতকটা হেলিয়া পড়িয়াছিল। আদালতের বিচারের প্রতি তাঁর একটা অসাধারণ আস্থা ছিল। তিনি নিজে কখনো কোনো মামলা করেন নাই। কিন্তু সর্বদাই বলিতেন হাকিম যে বিচার করেন, ঠিকই করেন। তাই দায়রার বিচার শেষ হওয়ার সংগে সংগেই তিনি ওসমান সরকারের নির্দোষিতা ও আমির আলির দোষিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া গিয়াছেন।

সেক্রেটারি সাহেব বসামাত্র সকলে একযোগে তাঁর দিকে চাহিলেন। তিনি যখন আসিয়াছেন, নিশ্চয় কোনো কাজের কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছেন। হেড মাষ্টার সাহেব কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন: কোনো গোপনীয় কথা কইবেন? এঁদেরে যাইতে কইব?

জামাল সরকার হাসিয়া বলিলেন: আপনাদেরে একত্রে পাইমু বইলাই এই সময়ে আসছি। কথাটা সকলের সামনেই কইতে চাই।

তাঁদের চাকুরি বা বেতন সম্পর্কে কোনো কথা নয় ত? সকলেরই একটু-আধটু চিন্তা হইল। সকলেই সেক্রেটারি সাহেবের কথা শুনিবার জন্য কান খাড়া করিলেন।

সেক্রেটারি সাহেব বলিলেন: কথাটা আমি সেক্রেটারি হিসাবে কইমু না, কইমু দশজনের একজন হিসাবে; আর আপনেরা শিক্ষিত লোক বইলা আপনাদের পরামর্শ পাইবার আশাতেই কইমু।

সকলের আগ্রহ আরো বাড়িল। হেড মাষ্টার সাহেব সেক্রেটারির বদ্-অভ্যাস জানেন; তিনি বড় প্যাঁচাইয়া কথা বলেন। তাই তিনি লাগাম খেঁচিবার উদ্দেশ্যে হাসিয়া বলিলেন: কথাটা আপনে কইয়াই ফেলেন, আমাদেরে আর উৎকণ্ঠায় লটকাইয়া রাখবেন না।

জামাল সরকার অপ্রস্তুত হইলেন। সোজাসুজি বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিবার জন্য তিনি বলিলেন: কথাটা আর কিছু না; এই যে ব্যাপারটা ঘইটা গেল, এ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্যের কথা।

ইতিমধ্যে বহু ব্যাপার ঘটিয়াছে, সেক্রেটারি সাহেব কোন্‌টার কথা বলিতেছেন, তা কেউ বুঝিলেন না। কিন্তু সেক্রেটারির কথা বুঝিলেন না হঠাৎ সেটা স্বীকার করিয়া নিজেদের অজ্ঞতার প্রমাণ দিতেও কেহ রাযী হইলেন না। তাই তাঁরা পরস্পরের দিকে নযর বুলাইয়া সেক্রেটারির দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া রহিলেন এইজন্য, যদি আভাসে ব্যাপারটার একটা কিনারা করা যায়; হাসিমুখে এইজন্য যে, ওটাই নির্বুদ্ধিতা গোপনের একমাত্র মুখোস।

আর যার বিবেচনায় যত ব্যাপারই ঘটিয়া থাকুক না কেন, জামালুদ্দিন

সরকারের বিবেচনায় ইদানীং একটা ছাড়া দুইটা ব্যাপার ঘটে নাই এবং সে ব্যাপারটা হইতেছে আমির আলির জালের ব্যাপারটা। এই মোটা ব্যাপারটা কারো, বিশেষতঃ স্কুল-মাষ্টারদের মত শিক্ষিত লোকের নযরে পড়ে নাই, এটা তিনি ভাবিতেই পারেন নাই। কাজেই তিনি নির্বিবাদে বলিয়া যাইতে লাগিলেন: না, হাসবেন না। এই জালের ব্যাপারটা শুধু এই আংরাফেরই লজ্জার কথা না, এটা আপনারার বি-এ পাশ-করাদেরও কলঙ্কের কথা। কাজেই আমার মতে এর একটা প্রতিকার হওয়া চাই-ই।

এতক্ষণে মাষ্টার সাহেবরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু প্রতিকারের আবশ্যকতা ও উপায় সম্বন্ধে কিছু ঠাহর করিতে না পারিয়া শুধু মাথা নাড়িতে লাগিলেন। শুধু এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার কাদের সাহেব বলিলেন: তাত বটেই।

শুধু একটিমাত্র 'তাত বটেই'-এ জামাল সরকার মোটেই খুশী হইলেন না। ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর। তিনি বলিলেন: এর প্রতিকার না করলে আমরা এই আংরাফের লোকেরা ভদ্রলোকের সমাজে মুখ দেখাইতে ত পারমুই না, হায়ার এডুকেশনেরও আর কোনো ইয্‌যৎ থাকব না। তাতে আমাদের স্কুলেরও ক্ষতি হৈতে পারে, এটা কি আপনেরা মনে করেন না?

এ অঞ্চলের লোকেরা কোথাও মুখ দেখাইতে পারুক আর না পারুক, তাতে মাষ্টার সাহেবদের বেশীমাত্রায় চিন্তিত থাকিবার কথা নয়। তবে স্কুলের যে কোনো ক্ষতির দিকে তাঁদের নযর আছে, এটা বলা তাঁদের কর্তব্য। তাই এবার স্বয়ং হেড মাষ্টার সাহেব বলিলেন: তা ঠিক।

জামাল সরকার এইবার নড়িয়া-চড়িয়া চেয়ারে ভালভাবে বসিয়া লইয়া বলিলেন: যদি ঠিক হয়, তবে এর প্রতিকার করেন।

হেড মাষ্টার সাহেব বলিলেন: আপনে কি ধরণের প্রতিকারের কথা কইতাছেন?

জামাল সরকার মাথা চুলকাইয়া বলিলেন: দেখুন, এখন আর দলাদলির সওয়াল নাই। যতক্ষণ ছিল, আপনেরাও কোনো দলে গেছেন না, আমিও

গেছি না। তার লাগি আমরার উপরে দু-দলই গোস্বা হৈয়া আছে। কিন্তু ইন্‌সাফের ঘরে আজ হক-নাহক ফয়সালা হৈয়া গেছে। কোন্ পক্ষ দোষী কোন্ পক্ষ নির্দোষী আদালত থাইকা সেটা সাফ কইরা দিছে।

হেডমাষ্টার মুচকি হাসিয়া বলিলেনঃ হাঁ, আদালতের রায় তাই হৈছে বটে।

হেডমাষ্টারের স্বরে এমন কিছু ছিল, যাতে বোঝা যায় তিনি আদালতের রায়ের সত্যতায় নিঃসন্দেহ নহেন।

জামাল সরকার সে স্বরের কারণ বুঝিলেন না। কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলেনঃ ওসমান সরকার সত্যই নির্দোষী, এটা আপনে বিশ্বাস করবেন নিশ্চয়ই।

হেডমাষ্টার শুধু বলিলেনঃ হাঁ।

স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁর মনের কথা এটা নয়, তবে তিনি তর্ক করিতে চান না।

জামাল সরকারের উদ্দেশ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। তিনি কথাটা আর না কচলাইয়া বলিলেনঃ তা যদি হয়, তবে আমরার এখন উচিত দলাদলি ও পুরাতন শত্রুতা ভুলিয়া নির্দোষীর পক্ষে দাঁড়ান। লোকে বুঝুক এ আৎরাফের কোনো ভদ্রলোকই দোষীর পক্ষে থাকে না।

'পুরাতন শত্রুতা' কথাটায় হেডমাষ্টারের মনে আঘাত লাগিল। যতদিন ওসমান সরকার সেক্রেটারি ছিলেন, ততদিন মান্নান সাহেব হেডমাষ্টার হইতে পারেন নাই। মান্নান সাহেব এম-এ বি-টি হওয়া সত্বেও ওসমান সরকার একজন বি-এ বি-টিকেই হেডমাষ্টার করিয়া রাখেন। তারপর জামাল সরকার সেক্রেটারি হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে মান্নান সাহেবকে হেডমাষ্টার করা হয়। পুরাতন হেডমাষ্টার লম্বা ছুটি লইয়া বাড়ি যান এবং আর আসেন না। জামাল সরকার ইহাকেই ওসমান সরকারের বিরুদ্ধে মান্নান সাহেবের 'পুরাতন শত্রুতা' বলিতেছেন মনে করিয়া মান্নান সাহেব অসুবিধায় পড়িলেন। মান্নান সাহেব বুঝিলেন, তিনি ওসমান সরকারের সামান্য বিরুদ্ধতা করিলেও ভুল-বুঝার আশঙ্কা আছে। অথচ সত্যকথা এই যে,

মান্নান সাহেব ও-কথা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। নাহক ভুল-বুঝার মধ্যে গিয়া কাজ কি? বিদেশে চাকুরি করিতে আসিয়াছেন, চাকুরি লইয়াই থাকা ভাল। তাই তিনি জামাল সরকারের কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া বলিলেন: নিশ্চয়ই। নির্দোষীর সমর্থনে দলাদলির কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। কিন্তু কি করতে চান?

জামাল সরকারের দুশ্চিন্তা দূর হইল। তিনি অত সহজে এতটা সফল হইবেন আশা করেন নাই। তিনি বলিলেন: আমি একা চাইলে ত হৈব না। আমরার সকলের চাইতে লাগব।

হেডমাষ্টার: সেটা ঠিক। তবে একজনের মাথা থাইকা আইডিয়াটা আসা চাই ত।

জামাল সরকার: আইডিয়া আর কি? আমরার নেতারা সে পথ দেখাইয়াই রাখছেন। তাঁরা কি করেন? কেউ কোনো স্থায়ের লড়াইএ জিতলে তাঁকে নেতারা সবাই মিইলা সভা কইরা অভিনন্দন দিয়া থাকেন। আমরা কি ওসমান সরকারকে অভিনন্দন দিতে পারি না?

এতক্ষণে মাষ্টাররা সেক্রেটারি সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। একটা লোক মামলায় জিতিয়াছে, সেজন্য সবাই মিলিয়া তাকে অভিনন্দন দিতে হইবে? ব্যাপারটা তাঁদের কাছে বড়ই বিসদৃশ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু সেক্রেটারির মনে কি আছে, তা না জানিয়া সোজা এটাকে উড়াইয়াও দেওয়া যায় না। তাই এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার কাদের সাহেব বলিলেন: ব্যাপারটা একটু নতুন ধরণের হইতাছে কিনা। লোকে কিছু না কয় আবার।

জামাল সরকার: করবার আগে সব জিনিসই নতুন থাকে। অভিনন্দন জিনিসটাই এককালে নতুন আছিল। কেউ খান বাহাদুর খেতাব পাইলে বা মন্ত্রীগিরি চাকুরি পাইলে তাঁরে যদি আমরা অভিনন্দন দিতে পারি, তবে স্থায়ের পক্ষে লড়াই কইরা যে ব্যক্তি ফতেহ্ করল, তারে আমরা অভিনন্দন দিতে পারি না? ওসমান সরকার কি শুধু নিজের লাগি লড়ছেন কইতে চান? তিনি দুনিয়ার সকল নির্দোষীর পক্ষে সকল জালিয়াতের বিরুদ্ধে

লড়াই করছেন না? আজ ওসমান সরকারের নাম জাল হৈছে, কাল আপনার আমার নামও জাল হৈতে পারে।

মাষ্টাররা সবাই দেখিলেন, জামাল সরকারের কথায় যুক্তি আছে। তাই তাঁরা অভিনন্দনের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু তবু তাঁদের দ্বিধা থাকিয়া গেল এক ব্যাপারে। কাদের সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন ঃ ওসমান সরকার সাহেব এই অভিনন্দন চান নাকি? জামাল সরকার কাদের সাহেবের দিকে এমন ভ্রূকুটি করিলেন যে, কাদের সাহেব ঘাবরাইয়া গেলেন। জামাল সরকার বলিলেন ঃ ওসমান সরকার মইরা গেলেও কারো কাছে কিছু চাইয়া নিবে না। আপনারা জানেন না লোকটা কতবড় অভিমানী।

কাদের সাহেব ঃ তা হৈলে তিনি অভিনন্দন নিতে রাযী হৈবেন ত?

জামাল সরকার সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। বলিলেন ঃ সেটা আমার উপর ছাইড়া দেন।

কাদের সাহেবের তর্কটা মান্নান সাহেবের ভাল লাগিতেছিল না। তিনি অন্যদিক বিচার করিতেছিলেন। বলিলেন ঃ আপনে কি মনে করেন, সব শ্রেণীর লোক এতে শামিল হৈব?

জামাল সরকার নিশ্চিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন ঃ শামিল হৈব না? ভাল মানুষ সবাই শামিল হৈব। শুধু যারা জালিয়াত বা জালিয়াতের সমর্থক, তারাই শামিল হৈব না।

মাষ্টাররা বুঝিলেন, জামাল সরকারের এই মাপকাঠি চালু হইয়া গেলে শেষ পর্যন্ত এই এক যুক্তির বলেই ওসমান সরকারের পাক্কা দুশ্‌মনরাও অভিনন্দনে যোগ দিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং আয়োজনের সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া হেডমাষ্টার বলিলেন ঃ কিন্তু অভিনন্দন পাঠ করবেন কে?

জামাল সরকার মুচকি হাসিয়া বলিলেন ঃ অভিনন্দন পাঠের গলা এ অঞ্চলে একটি লোকেরই আছে। তিনিই পাঠ করবেন।

হেডমাষ্টার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেক্রেটারির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ তিনি কে?

জামাল সরকার তখনও মুচকি হাসিতেছিলেন। বলিলেন: হেডমাষ্টার মৌলবি আবদুল মান্নান খাঁ এম-এ বি-টি।

হেডমাষ্টারের আগেই এ সন্দেহ হইয়াছিল। এই প্রস্তাবে তিনি মনে মনে আনন্দিত হইয়াও মুখে বলিলেন: আমি?

জামাল সরকার সমান উৎসাহে বলিলেন: এ অঞ্চলের পাবলিকের পক্ষে কথা কইবার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র আপনারই আছে।

হেডমাষ্টার গর্ববোধ করিলেন। তবু বিনয় দেখাইয়া বলিলেন: আর কেউ হৈলে ভাল হৈত। বিশেষতঃ স্থানীয় লোক হৈলে।

জামাল সরকার কথাটা আমলই দিলেন না। বলিলেন: আপনে স্থানীয় লোক না? ইটা কি কইলেন হেডমাষ্টার সাব?

কথাটা সেইখানেই শেষ হইল। অভিনন্দন-পাঠক ঠিক হইয়া যাওয়ার পর বাকি রহিল সভাপতি কে হইবেন। ঠিক হইয়া গেল সভাপতির বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। অভিনন্দন-পাঠই হইল বড় কাজ। সভাপতি মানে একজন বুড়া মুরুব্বিকে চেয়ারে বসাইয়া রাখা। সকলে একমত হইলেন মওলানা মুসা সাহেবই এ-কাজে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। হেডমাষ্টার তাঁকে রাযী করিবার ভার নিলেন।

এইভাবে একঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া জামাল সরকার যখন স্কুলঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁর বুকটা হাল্‌কা বোধ হইতেছিল। ওসমান সরকারের প্রতি তিনি সত্যই অবিচার করিয়াছিলেন। ওসমান সরকার তাঁর উপকার বই অপকার কোনোদিন করেন নাই। তাঁর বিরুদ্ধে জামাল সরকার স্কুল-কমিটিতে ও ইউনিয়ন বোর্ডে যা-কিছু করিয়াছেন, সেটা নীতি-হিসাবে। সেজন্য তাঁর দুঃখ নাই। কিন্তু মামলার ব্যাপারে ওসমান সরকারকে তিনি সত্যই অসুবিধায় ফেলিয়াছিলেন; কারণ তাঁকে দোষী বলিয়াই একসময়ে তাঁর সন্দেহ হইয়াছিল। সৎলোকের সততায় সন্দেহ করিলে তার কাফ্‌ফারা দিতে হয়। জামালুদ্দিন সরকার আজ সেই কাফ্‌ফারা দিতে যাইতেছেন। লোকে কত কি মনে করিবে। কেউ মনে করিবে জামাল সরকার আবার ওসমান সরকারের লালি চাটিতে যাইতেছেন। তা মনে করে করুক।

ছত্রিশ

সেদিন সরকার সাহেব বরাবরের অভ্যাসমত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।

সরকার সাহেব এ কয়দিনে বেশ বুড়া হইয়াছেন। গত কয়েক মাসের দুশ্চিন্তা ও ঝামেলায় তাঁর চেহারা অনেকখানি ভাঙিয়াছে ঠিক, কিন্তু এতটা বুড়া দেখাইবার অন্য কারণ আছে। প্রথমতঃ তিনি চুল-দাড়িতে খেযাব লাগান ছাড়িয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ পোশাকেও তাঁর বাবুয়ানার বদলে মুন্সিয়ানা দেখা দিয়াছে। আগে তিনি বাড়িতে লুঙ্গি ও বাহিরে ধুতি শার্ট ও তুর্কিটুপি পরিতেন। এখন লুঙ্গি ছাড়িয়া ধবধবা সাদা তহ্‌বন্দ ধরিয়াছেন। বাহিরে যাইবার সময় তার উপর লম্বা কল্লিদার কোর্তা এবং মাথায় কালেব-করা জালি টুপি পরেন।

চেহারা-ছবি ও পোশাক-পরিচ্ছদে যা, ব্যবহারেও তাই। মামলায় যারা সরকার সাহেবের বিরুদ্ধে খাটিয়াছিল, মামলা জয়ের পর সরকার সাহেব তাদেরে কঠোর শাস্তি দিবেন, এটা ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। কাকে কি শাস্তি দিবেন, তাও মোটামুটি তিনি স্থির করিয়াই বসিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! একটা সংকল্পও সরকার সাহেব এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করেন নাই। মামলা জয়ের পরদিন হইতেই এক দুই করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের অনেকেই তাঁর সাথে দেখা করিয়াছে এবং তাঁর জয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সরকার সাহেব তাঁর প্রতিজ্ঞা-মত কাকেও বলিতে পারেন নাইঃ ওরে মিথ্যাবাদী, তুই ত আমার বিরুদ্ধ পক্ষে তদবির করিয়াছিলি।

যাদের তিনি শাস্তি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাদের মধ্যেও অনেকে ইতিমধ্যে সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে হাত পাতিয়াছে এবং দু-এক জন সাহায্য পাইয়াছেও।

সরকার সাহেব এখন ভাবেনঃ এ সব মশা-মাছি মারিয়া হাত কাল করিব? লোকে বলিবে কি?

সরকার সাহেব বেড়াইতে বেড়াইতে কেরামত শেখের বাড়ির আংগিনায় উপস্থিত হইলেন। কেরামতের বিবিটা গোবর দিয়া ঘুঁটে তৈয়ার করিতে-

ছিল। সরকার সাহেবকে দেখিয়া তার বুক ধড়ফড় শুরু করিল। নিশ্চয় তাকে ভিটা ছাড়িতে বলিতে আসিতেছেন। সে পিঠের বুকের কাপড়টা সিজিল করিয়া মাথায় কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েলি ভঙ্গিতে সরকার সাহেবকে 'সেলাম' জানাইল।

সরকার সাহেব সালাম লইয়া হাসিমুখে বলিলেন ঃ ফজুর মা, আছ কেমন?

সরকার সাহেবের গলায় যথেষ্ট দরদ। কিন্তু ফজুর মা উহাতেই আরো বেশী ভয় পাইল। তার খসম সরকার সাহেবের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাতে তার প্রতি এই ব্যবহার সে কিছুতেই আশা করিতে পারে না। সরকার সাহেবের বিরুদ্ধে তার স্বামী সাক্ষ্য দেয় নাই বটে, কিন্তু সাক্ষ্য দিবে বলিয়া সরকার সাহেবকে ভয় দেখাইয়া আসিয়াছিল। এটা যে সাক্ষ্য দেওয়ার চেয়েও খারাপ, ফজুর মা মেয়ে মানুষ হইয়াও তা বুঝিতে পারিয়াছিল। চুপে চুপে বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া চোরের মত পলাইয়া আসা এক কথা, আর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিব বলিয়া বুক ঠুকিয়া মুখের উপর বাহাদুরি করিয়া আসা অন্য কথা। বড়লোকেরা এতেই বেশী চটে এবং এ বেআদবি তারা মাফ করে না। ফজুর মা বরাবর খসমকে বুঝাইয়াছে, সাক্ষ্য দিবার হইলে চুপে চুপে গিয়া দিয়া আসুক। কিছু বলিলে 'পেটের দায়ে টাকার লোভে করিয়াছি' বলিয়া হাতেপায়ে ধরিয়া মাফ নিলেই চলিবে। তা না করিয়া তার খসম সরকার সাহেবের বাড়ি যাইয়া তাঁর মুখের উপর 'সাক্ষী দিব' বলিয়া আসিল, এটা সে কোনোদিন সমর্থন করিতে পারে নাই। এর ফল ভাল হইবে না বলিয়া সে বরাবর আশঙ্কা করিয়াছে। এটা ভিমরুলের চাকে ঘা মারা হইয়াছে। এরপর সাক্ষ্য দেওয়া-না-দেওয়া সমান। সেজন্যই মওলানা সাহেবের হুকুমে স্বামীর হইয়া সাক্ষ্য দিতে সে আপত্তি করে নাই।

এতদিন সরকার সাহেব কিছু করেন নাই শুধু মামলা নিষ্পত্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য। যেদিন ফজুর মা শুনিয়াছে মামলায় সরকার সাহেব জিতিয়াছেন, সেইদিন হইতেই সে বিপদের আশঙ্কায় দিন কাটাইতেছে।

আজ তাঁকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল, তাঁর ভিটায় থাকা আজ হইতেই শেষ। তবু 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই ভরসায় সে সরকার সাহেবের

দয়া আকর্ষণ করিবার জন্য বলিল: সাহেবের দোওয়ায় আল্লা রাখছে একরকম ভালাই।

খসমের মৃত্যুতে তার খুব দুঃখ হইয়াছে বা সে খুব কষ্টে পড়িয়াছে, মেয়েলোকের স্বাভাবিক এই ধরণের কোনো কথা তার মুখে আসিল না। কারণ স্বামীর নামোল্লেখমাত্রেই যদি সরকার সাহেবের দিল পাষাণ হইয়া যায়।

সরকার সাহেব নিজে কিন্তু সেকথা তুলিলেন। বলিলেন: ফজুর বাপ বেচারা মারা গেল, আমি একবার দেখতে আসতে পারলাম না; তার সাথে শেষ দেখাটা হৈল না। বড়ই আফ্‌সোসের কথা। কিন্তু তোমরা ত জান, ঐ বাজে ফ্যাসাদটায় পইড়া আমি আর কোনোদিকে নযরই দিতে পারছিলাম না। যাই হোক, তোমার এখন চল্‌ছে কেমন? একলা থাকতে ডরাও-টরাও না ত?

কথাবার্তায় ফজুর মার ভয় ও জড়তা কাটিয়া গিয়াছিল। সে বলিল: না, ডর-ভয়ের কিছু নাই। তবে ঘরে থাম-খিলা নাই। বৈশাখের ঝড়-ঝাপ্টায় কপালে কি আছে আল্লাই জানে।

সরকার সাহেব চিন্তিত হইয়া বলিলেন: থাম-খিলা লাগাইবার কোনো বন্দোবস্ত করছ না?

"কি দিয়া করমু সাব? একটা বরাক বাঁশের দাম পাঁচ টাকা। চারটা থাম লাগাইবার গেলেও দুইটা বাঁশ লাগব। এর উপর আছে কামলার মাইনা। কই পামু অত টাকা সাব?"

সরকার সাহেব একটু ভাবিয়া বলিলেন: আচ্ছা, এরজন্য তুমি ভাইব না। আমার বাজারের ঘরের সামনে কাঠ পইড়া আছে দেখছ ত?

ফজুর মা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাজ্জব হইয়া বলিল: জি হাঁ, দেখছি। আপনের ঘরের সামনে দিয়াই ত হামেশা চলাফিরা করি।

সরকার সাহেব: ওর মধ্যে থাইকা ছোট ছোট চারটা থাম বাইছা বাইর কইরা গোটা দুই কামলা ঠিক কইরা ঘরে লাগাও। আর কামলাগরে কইও, আমার কাছ থাইকা যেন মজুরি নেয়।

খানিকক্ষণ থামিয়া বলিলেন: না, তোমার দরকার নাই। আমিই কাঠ ও কামলা পাঠাইয়া দিমু। তুমি তারারে দেখাইয়া দিও কোন্ কোন্ থাম লাগান লাগব।

—বলিয়া সরকার সাহেব চলিয়া গেলেন।

ফজুর মা অবাক হইয়া সরকার সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন দয়ালু ফেরেশ্‌তার বিরুদ্ধে তার খসম সাক্ষ্য দিতে চাহিয়াছিল! আল্লাহ্ তার খসমকে মাফ করুন। আর শয়তান আমির আলি কিনা এমন মানুষেরে ফ্যাসাদে ফেলিবার লাগি তার নাম জাল করে! আল্লাহ্ তার উচিত ইন্‌সাফ করিয়াছেন।

পথে আসিতে আসিতে সরকার সাহেব ফজুর মার কথা ও তার খসম কেরামতের কথা ভাবিলেন। অন্যলোক হইলে মনে করিত সে একটা বড় রকমের পরোপকার করিয়া ফেলিল। কিন্তু সরকার সাহেব এতে গর্বিত হাওয়ার কিছুই দেখিতেছেন না। ঐ কয়টা কাঠ মাটিতে পড়িয়া রোদে-পানিতে পচিতেছিল। উই-এ খাইয়া ওর আর আছেই বা কি? ওতে যদি এই বেচারী বিধবার উপকার হয়, তবে হোক না। এটা ত বিনা-খরচের উপকার। ও বেচারীর খসম আমির আলির প্রলোভনে পড়িয়া সরকার সাহেবের বিরুদ্ধে গিয়াছিল, তাতে ও বেচারীর দোষ কি? তাছাড়া যে গোনা করিয়াছে, সে ত এখন মরিয়া গিয়াছে। খোদা তাকে মাফ করুন। ওর মত নগণ্য লোকের উপর প্রতিশোধ নিতে যাইবেন, এমন ছোট মন যেন খোদা ওসমান সরকারকে না দেন।

পথে চলিতে-চলিতে আমির আলির বাড়ি ও তার ইটখোলার দিকে তাঁর নযর পড়িল। হায়! বেচারা এখন জেলখানায় তার পাপের শাস্তিভোগ করিতেছে। সরকার সাহেব শুনিয়াছিলেন দায়রার রায়ের পরের দিনই ব্যাংক আমির আলির মায়-ইটখোলা দোকানপাট ও বাড়িঘর নিলাম করাইবার অর্ডার করাইয়াছে। ইতিমধ্যে নিলাম ইশ্‌তাহার জারিও হইয়া গিয়াছে। আহা! ডেংগু বেপারীর মেয়েটা কি হতভাগার হাতেই পড়িয়াছিল! আজ বেচারী নাবালক ছেলেমেয়ে লইয়া কোথায় দাঁড়াইবে? বাপ তার ওভাবে

মারা পড়িল। কি আফ্‌সোস! একজনের পাপে কতজনকে শাস্তিভোগ করিতে হয়! না, সত্যই আল্লার বিচার আল্লাই করেন। মানুষ প্রতিশোধের জন্য শুধুই ব্যস্ত হইয়া উঠে। আসলে মানুষের করণীয় কিছুই নাই।

পাড়া-পথ ছাড়িয়া বড় সড়কে উঠিয়া তিনি বাড়িমুখো রওয়ানা হইলেন। চারিদিকে খোলা মাঠের দিকে তিনি নযর ফিরাইলেন। খোলা মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁর চোখ মুখ শরীর জুড়াইল। তাঁর মন আরো উদার হইল।

শুধু কেরামত কেন, তিনি আজ আমির আলিকে পর্যন্ত মাফ করিতে রাযী আছেন। যথেষ্ট শাস্তি তার হইয়াছে। চার বছর সশ্রম—সে ত ভীষণ শাস্তি। সত্য বটে সে সরকার সাহেবের বিরুদ্ধে জাল-জুয়াচুরি, কুৎসা-রটনা, ছেলে ভাঙানি কিছুই বাকি রাখে নাই। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত বর্গাদারকে তেভাগার লোভ দেখাইয়া জমা করিয়া সরকার সাহেবের বাড়ি লুট করিবার পর্যন্ত উত্তেজনা দিয়াছে। এসব সত্ত্বেও সরকার সাহেব আমির আলিকে মাফ করিতে পারেন। কারণ সে তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে।

তাছাড়া সরকার সাহেব এখন বুঝিতেছেন, আমির আলি ছোকরাটা শয়তানদের পাল্লায় পড়িয়াই এসব অন্যায় কাজে হাত দিয়াছিল। বরাবরই সে খারাপ ছিল, একথা বলা যায় না।

আর সরকার সাহেবের নিজের বিপদের কথা? সত্য বটে এই মামলায় পড়িয়া তিনি শারীরিক কষ্ট, মানসিক অশান্তি ও আর্থিক ক্ষতি ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু দুনিয়ায় বাস করিতে গেলে আপদ-বিপদ আছেই। অল্প-বিস্তর বিপদাপদ কার জীবনে না আসিয়াছে? এমন যে অলি-দরবেশ, নবি-রসুল, তাঁদের জীবনেও ত কত আপদ-বিপদ আসিয়াছিল।

আর ওয়াজেদ? সে ত ছেলে মানুষ। সে ওদের প্রচারে ধান্দায় পড়িবে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে? সরকার সাহেব নিজেই ত ধান্দায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিক কথাটা মনে হইলে সরকার সাহেব আজ না হাসিয়া পারেন না। একসময় তাঁর নিজেরই মনে হইয়াছিল, সত্যই বুঝি তিনি আমির আলির যামিননামায় দস্তখত দিয়াছিলেন। মিথ্যা প্রচারের কি যাদুকরী প্রভাব!

আসলে সরকার সাহেবের বিবির কথাই সত্য। বিবি সাহেব বলিয়া থাকেন সরকার সাহেবের দিলটা বড়ই নরম। এই নরম দিলের সুযোগ লইয়া অনেকেই সরকার সাহেবকে ঠকায়। তাঁর দিলটা নরম বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন আমির আলি যখন অত জোরে বলিতেছে যে, সরকার সাহেব তার যামিননামায় দস্তখত দিয়াছেন, তখন কি সে আর মিথ্যা কথা বলিতেছে? তাঁর বেশ মনে আছে আফতাবের হোটেলে আমির আলি ঐ দস্তখতের জন্য তাঁকে ধরিয়াছিল। সেখানে দস্তখত দিতে রাযী হইয়া তিনি সমিরের রেষ্টুরেণ্টে আসিয়া দস্তখত দিয়াছিলেন, এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি? না, আমির আলিটা সত্যই যে শয়তানের ওস্-ওসায় পড়িয়াছিল তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

বাড়ি ফিরিতে সরকার সাহেবের সন্ধ্যা হইল। তিনি অন্দরে না ঢুকিয়া পুকুরের বাঁধান ঘাটে ওযু করিয়া মগরেবের নামায পড়িতে মস্‌জিদে ঢুকিলেন। ফরয নামায তখন হইতেছিল। মাদ্রাসার মৌলবি, স্কুলের মাষ্টার ও কয়েকজন ছাত্র সরকার-বাড়িতে জায়গীর থাকেন। তাঁরাই এবং আর দু-একজন জমাতে নামায পড়িতেছিলেন। সরকার সাহেব তাড়াতাড়ি জমাতে শামিল হইলেন। আগে লক্ষ করেন নাই, ফরয নামায শেষ করিয়াই তিনি দেখিলেন, জমাতে জামাল সরকারও আছেন।

উভয়ের নামায শেষ হইলে জামালুদ্দিন ওসমান সরকারকে আদাব জানাইলেন এবং দুইজন একসঙ্গে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানায় গেলেন। পথে জামালুদ্দিন সংক্ষেপে জানাইলেন যে, তাঁর জরুরী কথা আছে।

সরকার সাহেব চাকরকে পান-তামাকের হুকুম দিয়া বৈঠকখানায় জামালুদ্দিনকে লইয়া বসিলেন এবং ইতিমধ্যে অন্য কেউ আসিলে তাকে অন্য বৈঠকখানায় বসাইতে চাকরকে উপদেশ দিলেন। সরকার-বাড়িতে একাধিক বৈঠকখানা আছে।

মামলা শেষ হওয়ার পর জামাল আরেকদিন এ বাড়িতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং কোনো ভূমিকা না করিয়াই তিনি নিজের প্রস্তাব ওসমান সরকারের কাছে পেশ করিলেন।

ওসমান সরকার কথাটা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জামালের মতলব ঠাহর করিবার জন্য তাঁর মুখের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেনঃ পাগল হইছ? এ কুবুদ্ধি তোমাকে দিল কেটা?

জামাল দৃঢ়স্বরে বলিলেনঃ এটা আমরা ঠিক কইরাই ফেল্‌ছি। আপনের কোনো আপত্তিই আমরা শুন্‌মু না।

ওসমান সরকারের সন্দেহ তখনও ঘুচে নাই। তিনি বলিলেনঃ আমরা মানে কি? তোমার সাথে আর কেউ আছে নাকি?

জামালঃ আর কেউ মানে? সারা গ্রামের লোকই এটা চায়। সকলের তরফ থাইকাই ত আমি কথা কইতাছি।

ওসমান সরকার এবার জামালের কথার সরলতায় বিশ্বাস করিলেন। বলিলেনঃ বাবা, সারা গ্রামের লোকের কথা আর কইও না। এই অদ্ভুত খেয়াল তোমরার কার কার মাথায় ঢুকছে, সেই কথাটা কইয়া ফেল।

জামাল সরকার তখন স্কুলের হেডমাষ্টার ও অন্যান্য মাষ্টারদের কথা এবং গ্রামের অন্যান্য যাদের সাথে তাঁর প্রাথমিক আলাপ হইয়াছে তাদের সকলকার কথা খুলিয়া বলিলেন এবং এই অনুষ্ঠানের পক্ষে তাঁর এবং সকলের যুক্তিসমূহ খুব জোরের সঙ্গে পেশ করিলেন।

উপসংহারে তিনি বলিলেনঃ এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা আপনেরে সম্মান করতে যাইতাছি না; আমরা হক, ইন্‌সাফ, সাধুতা ও সততারই সম্মান করতে যাইতাছি। কাজেই আপনের আপত্তি আমরা শুন্‌মু না।

সরকার সাহেব জীবনে অনেক মানুষকে অভ্যর্থনা-অভিনন্দন দেওয়াইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট, এস-ডি-ও, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে শুরু করিয়া স্থানীয় এম-এল-এ, সার্কেল অফিসার, দারোগা পর্যন্ত কেউ বাদ পড়েন নাই। এ বাবদ সরকার সাহেব পয়সাও খরচ করিয়াছেন যথেষ্ট। এমন কি, স্থানীয় জমিদারের কুমার যখন একবার এদিকে পাখী শিকার করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁকেও তিনি অভিনন্দন দেওয়াইয়াছিলেন।

সুতরাং অভিনন্দনের ব্যাপারে তিনি পাকা। কিন্তু সেই অভিনন্দনের মালা একদিন তাঁর নিজের গলায় পড়িবে, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

কারণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগিরির উপরে আর কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না।

তিনি বলিলেন: পাবলিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনোদিন যাই নাই, এ ব্যাপারেও যাইতে চাই না। কিন্তু এ সম্পর্কে আমারও একটা ইরাদা আছে। আল্লাহ্ আমাকে এই বিপদ থাইকা উদ্ধার করায় এবং আমার ছেলেটাকে সাংঘাতিক বেমার থাইকা শাফা দেওয়ায় একটা শোকরানার তামদারির নিয়ত করছি। তোমরা এই দুই অনুষ্ঠান একসঙ্গে এক জায়গায় করবার ব্যবস্থা কর। আমারে অভিনন্দন দিতে আইসা গাঁয়ের লোক খালিমুখে ফিইরা যাইব, এটা আমি পসন্দ করি না।

সাইত্রিশ

শেষ পর্যন্ত অভিনন্দন-সভার দিন-ক্ষণ-স্থান ঠিক হইয়া গেল। হাই-স্কুলের খোলা মাঠেই সভার স্থান হইল। উপরে শামিয়ানা খাটান হইতেছে। শামিয়ানার এক দিকে মঞ্চ করা হইতেছে। মঞ্চের উপরে সভাপতি ও সরকার সাহেবের বসিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইবে। মঞ্চের সামনে কিছু-দূর তক্ সতরঞ্জি-ফরাস এবং তারপর আম লোকের জন্য চট পাতা হইবে।

এই সংগে তামদারির ব্যবস্থাও হইতেছে। তিন হাজার লোকের খাওয়ার আয়োজন হইয়াছে। বেলা একটা হইতে চারটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইবে। পাঁচটার সময় আসরের নামাযের পরেই সভার কাজ শুরু হইবে।

জামালুদ্দিনের আর দিনরাত দম ফেলিবার ফুরসৎ নাই। তাঁর অসামান্য কর্মদক্ষতার ফলে গ্রামের সকল দল এই ব্যাপারে একমত হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ইয়াসিন মৌলবি পর্যন্ত এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতেছেন। প্রকাশ, শরাফত মণ্ডলও তাঁর দলবলসহ সভায় তাম-দারিতে যোগ দিতে রাযী হইয়াছেন। জামাল সরকার কোথাও কোনো বাধা বা আপত্তি দেখেন নাই।

শুধু মওলানা মূসা সভাপতিত্ব করিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন।

বলিয়াছিলেন ঃ এসব দুনিয়াবী মামেলার মধ্যে আমাকে আর জড়ান কেন?

আসলে কেরামত শেখের সেই ব্যাপারটার পর তাঁর মনটা খুব খারাপ ছিল। ঐ ঘটনার পর তিনি এই মামলার ব্যাপার একেবারে চাপিয়া গিয়াছিলেন। তারপর সরকার সাহেবের জয়ে যখন মাদ্রাসার সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল, তখন এক ছুতা করিয়া তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

কাজেই হেডমাষ্টার মান্নান সাহেব জামাল সরকারসহ যখন সভাপতিত্বের অনুরোধ লইয়া তাঁর কাছে আসেন, তখন তাঁর মুখে প্রায় সোজা 'না' আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মান্নান সাহেবকে তিনি বরাবর কদর করিতেন। তাঁর একটা অনুরোধ সোজাসুজি ঠেলিয়া ফেলিতে তাঁর দ্বিধা হইতেছিল। তাই তিনি ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং সেজন্য দুনিয়ার মামলা হইতে ফারাখ থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্য কি কি যুক্তি তিনি দিতে পারেন তা যখন তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময় মাদ্রাসার সামনে দিয়া দুইজন লোককে কাঠের থাম কাঁধে করিয়া যাইতে দেখিলেন। মওলানা সাহেবরা পায়চারি করিতে করিতে আলোচনা করিতেছিলেন। কাঠ কাঁধে লোক দুইটাকে জিগ্‌গাস করিয়া তাঁরা জানিতে পারিলেন, কেরামতের বিধবার ঘরের থাম না থাকায় সরকার সাহেব বিনামূল্যে ঐ কাঠ দিতেছেন এবং কামলার মাইনাও সরকার সাহেব নিজেই দিবেন।

এরপর মওলানা সাহেবের মত বদলিয়া গেল। তিনি অভ্যর্থনা-সভার সভাপতিত্ব করিতে রাযী হইয়া গেলেন। মান্নান সাহেব ও জামাল সরকার জানিতেও পারিলেন না এই কাঠের সঙ্গে মওলানা সাহেবের সম্মতির কোনো সম্পর্ক আছে। মওলানা সাহেব বুঝিলেন, জয়ের পরে যে ব্যক্তি দুশ্‌মনের এমন উপকার করিতে পারে, সে ব্যক্তি অভিনন্দনের যোগ্য।

মান্নান সাহেবের পরামর্শে জামাল সরকার তামদারি ও অভ্যর্থনার খরচপাতি সম্পূর্ণ আলাদা রাখিয়াছেন। অভ্যর্থনার আয়োজনের এক পয়সাও সরকার সাহেবের তামদারির তহবিল হইতে খরচ না হয়, সেদিকে বিশেষ

নযর রাখা হইয়াছে। অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের সমস্ত খরচা চাঁদা তুলিয়া চালান হইতেছে।

তামদারির দাওয়াৎ সরকার সাহেব নিজে বাড়ি-বাড়ি হাঁটিয়া করিয়া গিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি শরাফত মণ্ডলের বাড়ি গিয়া প্রায় আধঘণ্টা বসিয়া গল্প-গোযারি করিয়া আসিয়াছেন। আমির আলির বাড়িতেও তিনি দাওয়াৎ করিতে ভুলেন নাই। তিনি আমির আলির নাবালক ছেলেদের দাওয়াৎ করিয়া দেউড়ির কাছে দাঁড়াইয়া জরিনার উদ্দেশে বলিয়াছেন: বৌ-মা, তুমি ছেলেদের পাঠাইয়া দিও। কিছু মনে কইর না। লোকে যাই কউক, আমি কইয়া গেলাম এটা মামলা জিতের জিয়াফত না; ওয়াজেদের শাকার এটা শোকরানার তামদারি। ছেলেরা না গেলে আমি মনে খুব কষ্ট পামু।

শুনিয়া ঘরে শুইয়া শুইয়া জরিনা দাঁত কড়মড় করিয়াছে। লোকটা তার কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে আসিয়াছে! মামলার রায়ের দিন হইতেই তার শরীরটা ভাল যাইতেছে না। তারপর আমির আলি যেদিন হইতে জেলে গিয়াছে, সেদিন হইতে সে একেবারে বিছানা লইয়াছে।

জেল হইতে আমির আলি তাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে যে, সে জেল-আপিল করিবে, তাতে ফল না হইলে গবর্ণমেণ্টের দয়া ভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করিবে। সে ভরসা পাইয়াছে যে, এতে ফল হইবে।

কিন্তু আমির আলির কোনো কথায় জরিনার আর বিশ্বাস নাই। আদালতের সুবিচারে, আল্লার ইন্‌সাফেও সে বিশ্বাস হারাইয়াছে। এখন লাটসাহেব তার স্বামীর উপর সুবিচার করিবে, এটা সে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। কাজেই স্বামীর পত্রে সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা পায় নাই।

সভার দিন সকালে জামাল সরকার শেষ তদবিররূপে বাড়ি বাড়ি ঘুরিতে ঘুরিতে শুনিতে পাইলেন জরিনার খুব জ্বর। জরিনা জামাল সরকারের দূর সম্পর্কে ভাতিজী হয়। জরিনা তাঁকে চাচা বলিয়া ডাকে। বাড়ির পাশ দিয়া যাইবার সময় আমির আলির ছেলেদের ময়লা কাপড়-চোপড় দেখিয়া তাঁর দয়া হইল এবং জরিনার জ্বরের কথাও মনে পড়িল।

তিনি 'জরিনা' 'জরিনা' বলিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিলেন। জরিনা জবাব দিল না। উঠানে আফাজের মা লাকড়ি কাটিতেছিল। তাকেই জামাল সরকার পুছ করিলেন : জরিনা কোন্ ঘরে?

আফাজের মা জরিনার শোবার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল : কি কমু সরকারের পো, বৌ-টা সেই কোন্ সক্কালে পুলাপানরে বাইর কইরা দিয়া দরজায় খিল দিয়া বিছানায় পড়ছে, ডাকাডাকি কইরা তার জবাব পাইতাছি না। আজ রবিয়ে রবিয়ে আটদিন ধইরা এই কাণ্ড চল্‌ছে। গায়ে কাঠ-ফাটা জ্বর। মুখে একটা দানা একফোঁটা পানি নিব না। পুলাপানগুলি খাইল কি না খাইল, তা দেখব না। নিজেও মরব, পোলাপানগুলিরেও মারব। আমি বুড়া মানুষ, অত শত কি আমারে দিয়া হয়?

জামাল সরকার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া 'জরিনা' 'ও জরিনা' বলিয়া অনেক ডাকাডাকি করিলেন। ভিতরে জরিনার পাশ ফেরার খচ-মচ শব্দ পাইলেন। কিন্তু জরিনা জবাব দিল না।

তিনি চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভাবিলেন। জরিনা তাঁর সঙ্গে কথাটা পর্যন্ত বলিল না! ওসমান সরকারকে তিনি অভ্যর্থনা দিতেছেন, এটা শুনিয়া বেচারীর মনে খুবই ব্যথা লাগিয়াছে। তিনি ত জানেন, স্বামীর নির্দোষিতায় জরিনার কি অটল বিশ্বাস ছিল। কতবার তাঁকে সে বলিয়াছে : দেখবেন চাচা, উনি খালাস পাবেনই। আল্লাহ্ বেকসুরকে সাজা দিতে পারেন না। সেই খসমের জেল হইয়া গেল, অপরপক্ষকে তার চাচা হইয়া জামাল সরকার অভ্যর্থনা দিতেছেন, এতে বেচারা মনে আঘাত পাইবে এটা স্বাভাবিক। লেখাপড়া জানা মেয়ে ত। কিন্তু তিনি কি করিতে পারেন? অপরাধ অপরাধই; ভাতিজী জামাই অপরাধ করিলেও তিনি সেটা সমর্থন করিতে পারেন না। আর নির্দোষ লোক দুশ্‌মন হইলেও তার মর্যাদা দিতেই হইবে।

ব্যবস্থা হইয়াছে ওসমান সরকারকে বাড়ি হইতে মিছিল করিয়া সভাস্থল

পর্যন্ত নেওয়া হইবে। সুতরাং তামদারির গোড়ার দিকে কাতারে কাতারে ঘুরিয়া মেহমানদের কাছে "ডাল-ভাত রোক্কা খানা" বলিয়া মাফ চাহিয়াই সরকার সাহেব বাড়ি চলিয়া আসিলেন। ওয়াজেদকে দিয়া সরকার সাহেবের স্থান পূরণ করিয়া মাতব্বররাই তামদারির দেখাশোনা করিলেন।

পাঁচটার সময় ভলান্টিয়াররা সরকার সাহেবকে নিতে আসিল।

সরকার সাহেব তাঁর শ্রেষ্ঠ পোশাকে সাজিয়া বিবি সাহেবের দেওয়া আতর লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ছেলেরা 'আল্লাহু-আকবর' 'ওসমান সাহেব জিন্দাবাদ' বলিয়া মিছিলের পুরোভাগে সরকার সাহেবকে লইয়া রওয়ানা হইল। বিবি সাহেব ও যায়েদা পাড়ার মেয়েদের লইয়া জানালা দিয়া মিছিল দেখিতে লাগিলেন। গর্বে আনন্দে তাঁদের বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি সাহেবার চোখে পানি আসিল।

মিছিল ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ছাড়িয়া রোডবোর্ডের পাকা সড়ক ধরিয়া পশ্চিম দিকে মোড় ফিরিল। তখন মিছিলের লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রাস্তায় বেজায় ভিড়।

মিছিলের কয়েক গজ আগে দুইজোড়া ভলান্টিয়ার 'হেই রাস্তা ছাড়' চীৎকার করিয়া করিয়া গাড়ি-ঘোড়া ও লোকজন সরাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া যাইতেছিল।

এদেরই 'হেই হেই' ধমকে একটি গরুর গাড়ির গাড়োয়ান রাস্তা ছাড়িতে গিয়া বোধহয় ডাইনের বলদটাকে বেশী মাত্রায় তাড়া করিয়াছিল; তাতে গাড়িটা রাস্তা ছাড়িয়া রাস্তার ঢালুতে নামিয়া পড়িল। সকলে 'হেই হেই হুঁশিয়ার' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। গাড়ির আরোহীদের কান্নাকাটি শোনা গেল। কয়েকজন লোক ছুটিয়া আসিয়া গাড়ির সামনে দাঁড়াইল। গাড়িটা তেড়া অবস্থায় থামিয়া পড়িল।

সরকার সাহেবের নযর গাড়িটার উপর পড়িল। বাঁশের কাপারি বাঁধিয়া তার উপর নানারঙের কয়েকটি ময়লা কাঁথা ও কম্বল চাপাইয়া ছই তৈয়ার হইয়াছে। ভিতরে ছেলেপিলে ও মেয়েলোক আছে গলার আওয়াযে সরকার সাহেব বুঝিতে পারিলেন।

সরকার সাহেব অর্থাৎ মিছিলের অগ্রভাগ গরুর গাড়িটার নিকটে পৌছিতে পৌছিতে এটা জানাজানি হইয়া গেল যে, এই গাড়িতে আমির আলির পরিবার বাপের বাড়ি যাইতেছে।

সরকার সাহেব গাড়িটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁর মনে অনেক কথা জাগিল। কিন্তু তাঁর চিন্তায় বাধা পড়িল। তিনি শুনিলেন গাড়ির ভিতর হইতে একটি শিশুকণ্ঠ বলিতেছে: মা, আমি যিয়াফত খাইবার য়ামু। একটি মেয়েকণ্ঠ জবাব দিল: চুপ কর্ হারামযাদা, গলা টিইপা যিয়াফত খাওয়ামু।

সরকার সাহেবের ইচ্ছা হইল তিনি মিছিলের অগ্রভাগ হইতে ছুটিয়া গিয়া ঐ গাড়ির পর্দা উঠাইয়া ফেলেন এবং ঐ ছেলেটাকে কোলে লইয়া এবং গাড়ির আর সব ছেলেমেয়েগুলিকে সঙ্গে করিয়া যিয়াফতে লইয়া যান, সেখানে নিজ হাতে ওদের পেট ভরিয়া খাওয়ান। খোদা বাপের পাপের জন্য নাবালক শিশুদেরও কি কষ্ট না দিতেছেন!

কিন্তু সরকার সাহেবের ইচ্ছা পূরণ হইল না। তিনি মিছিলের চাপেই যেন গাড়ি হইতে অনেক দূর আগাইয়া পড়িলেন। তাছাড়া তিনি ভাবিলেন, বরাতির হাতে যেমন দুল্‌হা, তেমনি তিনি আজ এই মিছিলের হাতেও পুতুলমাত্র। তিনি মিছিলের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র। তাঁর কোনো স্বাধীনতা নাই; তাঁর নিজস্ব আলাদা কোনো গতি নাই। মিছিলের গতিই তাঁর গতি।

আটত্রিশ

মিছিল প্যাণ্ডালের গেটে গিয়া থামিল। প্যাণ্ডাল হইতে সড়ক পর্যন্ত দুধারে কলাগাছ পুতিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। এই রাস্তার মুখে সড়কের মেন গেট করা হইয়াছে। গেটের সামনে অভ্যর্থনা-সমিতির মেম্বররা গেষ্ট-অব-অনারের ইস্তেক্‌বালের জন্য ইন্তেযার করিতেছেন। মেম্বরদের মধ্যে হেডমাষ্টার মান্নান সাহেব ও জামাল সরকার ত আছেনই, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ইয়াকুব মৌলবিও আছেন।

সকলে একে একে সরকার সাহেবের মুসাফেহা করিলেন এবং তাঁকে সামনে লইয়া প্যাণ্ডালের দিকে রওয়ানা হইলেন। জামাল সরকারের ইশারায় ভলান্টিয়ার-দল আবার যিকির দিলঃ 'আল্লাহু-আকবর', 'ওসমান সাহেব জিন্দাবাদ'। দর্শকগণের সকলেই সে যিকিরে যোগ দিল।

অভ্যর্থনা সমিতির আগে আগে যখন সরকার সাহেব প্যাণ্ডালে পৌছিলেন, তখন সমস্ত সভা উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনবার 'জিন্দাবাদ' যিকির দেওয়া হইল।

মঞ্চের নীচেই কয়েকটি চেয়ার খালি ছিল। তার একটিতে সরকার সাহেবকে বসান হইল এবং অপরগুলিতে অভ্যর্থনা সমিতির মেম্বরদের কেহ কেহ বসিলেন। গোটা সভাও বসিল।

সভায় গুন্‌গুন্ শব্দ শোনা গেল।

মান্নান সাহেব মঞ্চে উঠিয়া হাতের ইশারায় সকলকে চুপ করিতে বলিলেন। সভায় সুঁই-পড়া নিস্তব্ধতা আসিল।

'সাহেবান, আমি প্রস্তাব করিতেছি' ইত্যাদি বলিয়া মান্নান সাহেব 'আজিকার এই মহান অনুষ্ঠানে' মওলানা মুসা সাহেবের মত 'সর্বজনমান্য আলেমকে' সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে অনুরোধ করিলেন।

পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়া চোগা গায়ে বিশাল পাগড়ী মাথায় লাঠি হাতে মওলানা সাহেব ধীরে ধীরে মঞ্চে আরোহণ করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং লাঠিটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

সভা-জুড়িয়া বিপুল করতালি হইল।

সভার প্রোগ্রাম সভাপতির সামনে টেবিলের উপর রাখা ছিল। তিনি উহা দৃষ্টে নির্দেশ দিতে লাগিলেন। প্রথমে কোরআন-পাক তেলাওৎ করা হইল। তারপর সভাপতি সাহেবের অনুরোধে গেষ্ট-অব-অনার সরকার সাহেবকে সসম্মানে সভাপতি সাহেবের পাশে নির্দিষ্ট আসনে আনিয়া বসান হইল। সম্মানিত মেহমান যথারীতি সভাকে কুর্ণিশ জানাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সভা-জুড়িয়া অনেকক্ষণস্থায়ী বিপুল করতালি-ধ্বনি হইল।

করতালি থামিলে পর সভাপতি সাহেব দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেনঃ এইবার সম্মানিত মেহমানের অভিনন্দন। প্রথমে অভিনন্দন-সংগীত গাওয়া হইবে, পরে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হইবে।

গোটা সভা যেন রুদ্ধনিশ্বাসে গলা উঁচা করিয়া চাহিয়া রহিল। এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার কাদের সাহেবের দুইটি ছোট মেয়ে দুইটি মালা হাতে লইয়া মঞ্চে উঠিল। মেয়ে দুইটি দেখিতে প্রায় একই আকৃতি, একই চেহারা। একই রঙের ফ্রক-পরা। যেন আঁকা ছবি।

সভা-শুদ্ধ প্রশংসমান ফিস ফিস শোনা গেল। মেয়ে দুইটি মাল্যদানের ভঙ্গিতে হাত উঁচা করিয়া কোরাসে সংগীত গাহিতে-গাহিতে ধীরে ধীরে একপা দুইপা করিয়া অতিথির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিস্তব্ধ সভার একপাশ হইতে অপর পাশ পর্যন্ত সংগীতের ঢেউ খেলিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে যখন সেই ছোট্ট হাতের একটি মালা সম্মানিত মেহমানের গলায় এবং অপরটি সভাপতির গলায় পরাইয়া দেওয়া হইল, তখন বিরাট করতালি ও হর্ষধ্বনিতে কচি গলার গান কয়েক মিনিটের জন্য তলাইয়া গেল।

বালিকাদ্বয় তখন কোরাসে গান গাহিতে গাহিতে যেমন করিয়া আগাইয়াছিল, তেমনি ধীরে ধীরে পায়-পায় পিছাইয়া-পিছাইয়া মঞ্চের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল এবং নাটকীয় ভংগিতে সভাকে সালাম জানাইয়া মঞ্চ হইতে নামিয়া গেল।

সভায় আবার বহুক্ষণস্থায়ী বিপুল হর্ষধ্বনি হইল।

অতঃপর হেডমাষ্টার সাহেব একটি সোনালী ফ্রেমে বাঁধান অভিনন্দনপত্র হাতে লইয়া টেবিলের একপাশে দাঁড়াইলেন। একটু কাশিয়া গলা সাফ করিয়া তিনি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

জামাল সরকার ঠিকই বলিয়াছিলেন, মান্নান সাহেবের মত আবৃত্তিকারী খুব কমই দেখা যায়। তাঁর গলাটি যেমন মিঠা, তেমনি বুলন্দ। পড়িবার ভংগিটিও নাটকীয়। যে শব্দে যে রকম জোর দেওয়া দরকার, যেখানে যে রকম উচ্চ-নীচ, মোটা-মিহিন সুরে উচ্চারণ করা দরকার, সেখানে সেইভাবে নিখুঁত উদারা-মুদারা-তারা গ্রামে গলার আওয়ায উঠানামা করাইয়া

মান্নান সাহেব অভিনন্দনটি পাঠ করিলেন। শ্রোতৃগণের প্রত্যেকের বুকও পাঠকের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিভিন্ন গ্রামে উঠানামা করিতে লাগিল। অভিনন্দনের প্রত্যেকটি কথাও শ্রোতাদের কাছে তেমনি খাঁটি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় অভিনন্দনপত্রে যাহা বলা হইল, তার সারমর্ম এই :

আজ এ অঞ্চলের একটা ঐতিহাসিক গৌরবের দিন। কারণ এই দিনে সকল দলের সকল মতের সকল শ্রেণীর ধনী-গরিব শিক্ষিত-অশিক্ষিত বালক-বৃদ্ধ একমত হইয়া একটি আদর্শের সন্ধান করিতে সমবেত হইয়াছে সে আদর্শ হইতেছে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া সত্য ও ন্যায়ের সম্মান করাই ইসলামের আদর্শ। এই অঞ্চলের সকলে আজ খাঁটি মুসলমান বলিয়া গৌরব বোধ করিতে পারে। জনাব মৌলবি ওসমান আলি চৌধুরী সাহেবকে আজ যে সম্মান দান করা হইতেছে, তাহা কোনো ব্যক্তির সম্মান নয়, ইহা আসলে একটা আদর্শেরই সম্মান। ওসমান আলি সাহেব সেই আদর্শের প্রতীক। তিনি ন্যায়-সত্যের জন্য জালিয়াতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এ অঞ্চলের, আসলে এ জিলার এবং কার্যতঃ সমস্ত দুনিয়ার সৎ সাধু ন্যায়বাদী শান্তিপ্রিয় নাগরিকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। এই সংগ্রামে তিনি যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, যে আর্থিক ক্ষতি শারীরিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাতে এই চিরন্তন শাশ্বত সত্যই আবার প্রমাণিত হইল যে, যুগে যুগে সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য মানুষকে ত্যাগস্বীকার করিতে হইতেছে। এই সত্যনিষ্ঠার ও এই আদর্শবাদিতার জন্য মহাপুরুষরা যুগে যুগে ত্যাগস্বীকার ও নির্যাতন বরণ করিয়া থাকেন। তার পুরস্কার আর্থিক ও বৈষয়িক ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না, বিশ্ববাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই এই নির্যাতনের পুরস্কার। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বাদী ওসমান আলি সাহেব আজ ঐতিহাসিক ঐসব মহাপুরুষের সম-মর্যাদায় এক কাতারে গিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঐতিহাসিক মহাপুরুষ

এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়া এতদঞ্চলের অধিবাসীকে গৌরবান্বিত করায় এতদঞ্চলের সকলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে এবং সেই কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র ও নগণ্য চিহ্ন স্বরূপ এই অভিনন্দন দান করিতেছে।

পড়া শেষ করিয়া অভিনন্দন-পত্রটি অর্পণ করিবার জন্য মান্নান সাহেব যখন সরকার সাহেবের মুখের দিকে নযর করিলেন, তখন তাঁর মনে হইল সত্যই যেন তিনি কোনো সৌম্যমূর্তি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া আছেন। তিনি অভিনন্দনে যা যা বলিয়াছেন, তার প্রত্যেক কথার ছাপ যেন এই লোকটির নাকে-মুখে ও চেহারায় সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট লাগিয়া আছে। এই মহাপুরুষ যেন তাঁর চেয়ে অতি মহান, অতি উঁচু। মান্নান সাহেব যেন তাঁর সামনে নগন্য ক্ষুদ্র প্রাণীমাত্র। তিনি যেন সত্যই ঐ মহাপুরুষের পায়ে নিজের অন্তরের অর্ঘ দিয়া নিজেকে ধন্য করিতেছেন। কম্পিত হস্তে মান্নান সাহেব অভিনন্দন-পত্রটি বহু ঊর্ধ্বে ঐ মহাপুরুষের দিকে আগাইয়া ধরিলেন। দুইটি জ্যোতির্ময় পবিত্র হস্ত অনুগ্রহ করিয়া ভক্তের সেই নগণ্য উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া যেন ভক্তকে কৃতার্থ করিলেন।

মান্নান সাহেবের পঠন-ভংগিতে সমস্ত সভা এক কল্পনা-রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল। মান্নান সাহেবের কণ্ঠস্বর থামিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। প্রত্যেকেই নিজনিজ পার্শ্ববর্তী লোকের দেখাদেখি এক হর্ষধ্বনি ও করতালিতে মাতিয়া উঠিল। অবশেষে যখন হর্ষধ্বনি ও করতালি থামিল, তখন সকলেরই মনে হইল ওসমান সরকার সত্যই তাদের পরম গৌরবের বস্তু।

তারপর সভাপতি সাহেব সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিলেন। তারও তালিকা আগে হইতেই করা ছিল।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ইয়াকুব মৌলবি, স্থানীয় ডাক্তারখানার ডাক্তার সুলেমান সাহেব, স্যানিটারি ইনস্পেক্টর ইসরাইল সাহেব, জিলাবোর্ডের প্রধান কেরানী আবেদ আলি তালুকদার সাহেব, গ্রামের সর্বাপেক্ষা অশীতিপর বৃদ্ধ ঈমান আলি খাঁ সাহেব এবং আরো অনেকে ওসমান সরকারের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতায়

সকলেই সরকার সাহেবের সহিত তাঁদের ব্যক্তিগত কায-কারবারের অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিলেন। ইয়াকুব মৌলবি বলিলেন যে, বার বৎসর ইউনিয়ন বোর্ডে সরকার সাহেবের সঙ্গে কাজ করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, অমন যোগ্য, সাধু, পরোপকারী প্রেসিডেন্ট সমগ্র জিলায় আর একটিও নাই। ডাক্তার সাহেব বলিলেন যে, তিনি চাকুরি উপলক্ষে বাংলার সর্বত্র বেড়াইয়াছেন, কিন্তু এমন জ্ঞানী, অমায়িক, ভদ্র ও পণ্ডিত লোক একটিও তাঁর নযরে পড়ে নাই। সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত দিলেন আবেদ আলি সাহেব। তিনি বলিলেন যে, ওসমান সাহেবের সাধুতার কথা জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলা জজ প্রভৃতি সমস্ত রাজকর্মচারীর মুখে মুখে। কারণ একদা জিলাবোর্ডের একাউন্টস্ বিভাগের ভুলে সরকার সাহেবের সাত হাজার পাঁচ শ সত্তর টাকার এক বিলে আট হাজার সাত শ পঞ্চাশ টাকা পাশ করিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছিল। সরকার সাহেব তিন দিন পরে নিজের খাতা-পত্র লইয়া গিয়া ওভারসিয়ার ও একাউন্টেন্টের সহিত তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তাঁর নিজের হিসাবই ঠিক; বোর্ড তাঁকে ভুলে বেশী টাকা দিয়াছে; সে টাকা ফেরৎ নিতে হইবে। অনেকেই তখন বলিয়াছিলেন, জিলা বোর্ডের টাকা সরকারী টাকা, কতজনেই ত লুটিয়া লইতেছে; সরকার সাহেবের ঐ টাকা ফেরৎ দিতে যাওয়ার দরকার নাই। আবেদ আলি সাহেব নিজে তার একজন সাক্ষী। এমনকি, তিনি লজ্জার সহিত স্বীকার করিলেন, তিনিও সরকার সাহেবকে ঐ পরামর্শই দিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সরকার সাহেব ঐ টাকা বোর্ডকে ফেরৎ দিলেন।

সরকার সাহেবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবেদ আলি সাহেব এই সত্য ঘটনা বর্ণনা করিতেছিলেন। ঘটনাটি মূলতঃ ও নীতিতঃ সত্য, কিন্তু খুঁটিনাটিতে একটু অতিরঞ্জিত। অর্থাৎ সরকার সাহেবকে ভুলে এক হাজার এক শ আশি টাকা বেশী দেওয়া হয় নাই, বেশী দেওয়া হইয়াছিল চার টাকা। বিলও সাত হাজার পাঁচ শ সত্তর টাকার ছিল না—দেওয়াও হয় নাই আট হাজার সাত শ পঞ্চাশ টাকা। আসলে বিলটি ছিল সাইত্রিশ টাকার, ভুলে

দেওয়া হইয়াছিল একচল্লিশ টাকা। ভুলও ধরা পড়িয়াছিল তিন দিন পরে নয়, সেইদিনই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, সরকার সাহেব বোর্ডের আফিসে থাকিতে থাকিতেই। তবু আবেদ আলি সাহেব দ্বিধাহীন চিত্তে বিবেকের সম্মতিক্রমে অকম্পিত কণ্ঠে এই গল্পটি অত লোকের মাঝখানে বলিয়া গেলেন।

আবেদ আলি মিঞার বক্তৃতা শেষ হইতেই বিপুল হর্ষধ্বনি ও জিন্দাবাদ চলিল। ভদ্রতার খাতিরে সরকার সাহেব ঈষৎ মাথা তুলিয়া শির ঝুঁকাইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

উপসংহারে অশীতিপর বৃদ্ধ ঈমান আলি খাঁ সাহেব তাঁর 'পুত্রতুল্য পরম স্নেহের' সরকার সাহেবের শৈশবের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ওসমান সরকার জন্ম হইতে সাধুতার জন্য নাম করিয়াছিলেন এবং সরকার সাহেবের চারি বৎসর বয়সেই তিনি তাঁর বাপকে ও দাদাকে সেকথা বলিয়াছিলেন। তিনি আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, ওসমান সরকারের বাপ-দাদাও সততার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আসল কথা এই যে, ওসমান সাহেবের বাবা সদসৎ সাধারণ মানুষই ছিলেন এবং তাঁর দাদাকে ঈমান আলি খাঁ সাহেব চক্ষেও দেখেন নাই। তাঁর সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছু শুনেনও নাই। তবু ঈমান আলি খাঁ সাহেব বিবেকের সম্মতিক্রমে এই কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করিয়া গেলেন।

সকলের বক্তৃতার শেষে সম্মানিত মেহমানের জবাব দিবার পালা।

সরকার সাহেব বিশেষ আলাপী লোক; ছোট-খাটো বৈঠকে তিনিই হন প্রধান বক্তা। ছোট-খাটো সভায় দাঁড়াইয়াও তিনি বহুবার বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু এত বড় জনসমাগমে তিনি কখনও মঞ্চের উপর দাঁড়ান নাই।

কাজেই সরকার সাহেব অভিনন্দনের জবাব দিতে যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ওয়াজেদ আলির বুক ভয়ে-আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিল। অভ্যর্থনা-সমিতির মেম্বররা ধরিয়া লইলেন, সরকার সাহেব শুধু ধন্যবাদ দিয়াই বসিয়া পড়িবেন। কাজেই সম্মানিত অতিথি দাঁড়াইবা মাত্র তাঁরা করতালি ও জিন্দাবাদের ইশারা করিলেন। অনেকক্ষণস্থায়ী হর্ষধ্বনি ও যিকির চলিল।

উনচল্লিশ

সরকার সাহেব কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। সরকার সাহেব বুঝিলেন, ভয়ে তাঁর বুক কাঁপিতেছে না, তাঁর ঠোঁট কাঁপিতেছে ভাবাবেগে। চোখ দিয়া তাঁর আনন্দের আঁসু যেন ঠেলিয়া উঠিতেছে।

তিনি কাশিলেন। নিজেই নিজের গলা শুনিলেন। সে গলায় ভীতি নাই, আছে দরদ। তাঁর মনে সাহস হইল। তিনি দরদ-কম্পিত সুরে আরম্ভ করিলেন। এক-আধ মিনিটে গলা স্বাভাবিক হইয়া আসিল। তারপর গলায় জোর আসিল। গলার জোরের সাথে কথারও জোর আসিল।

সরকার সাহেব তাঁর বক্তৃতায় যা বলিলেন তার সারমর্ম এই: আজিকার এ অভিনন্দন সরকার সাহেবের প্রাপ্য নয়, এ সম্মান সমবেত জনগণের, বিশেষতঃ অভ্যর্থনা সমিতির মেম্বরগণেরই প্রাপ্য। তিনি ন্যায় ও সত্যের জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছেন, যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তা তাঁর ইচ্ছার তুলনায় অতি নগন্য। তিনি যদি এই আদর্শের জন্য আরো কঠোর সংগ্রাম করিতে পারিতেন এবং আরো বেশী নির্যাতন যদি তাঁকে সহ্য করিতে হইত, তবে তিনি অধিকতর আনন্দিত হইতেন। (হর্ষধ্বনি) যে সব মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সরকার সাহেব তাঁদের পায়ের কাছে বসিবারও যোগ্য নন। তবু যে এই সভা সরকার সাহেবকে তাঁদের সাথে এক কাতারে দাঁড় করাইয়াছেন, তার কারণ এই যে, সরকার সাহেব ঐ সব মহাপুরুষের নগণ্য অনুসারী মাত্র, তাঁদের প্রদর্শিত পথের পথিক মাত্র। (হর্ষধ্বনি) ন্যায় ও সত্যের সাধনায় সরকার সাহেব যে সামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাও একা নিজের চেষ্টায় নয়। এ সাধনায় তিনি সর্বজনমান্য মুত্তাকী-পরহেযগার আলেমকুল-শিরোমণি মওলানা মুসা সাহেবের প্রেরণা ও নসিহত এবং হেডমাষ্টার মান্নান সাহেব, জামাল সরকার ও ইয়াকুব মৌলবি সাহেবের মত বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য না পাইলে কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। কাজেই সরকার সাহেবের বদলে তাঁদেরই

আজিকার এই অভিনন্দন পাওয়া উচিত ছিল। (বিপুল হর্ষধ্বনি) উপসংহারে সরকার সাহেব বলিলেন যে, আজিকার এই আনন্দের দিনে আমরা যেন সেই দুর্ভাগা লোকটির কথা ভুলিয়া না যাই যে শয়তানের ওসওসায় পড়িয়া পাপকার্যে লিপ্ত হইয়াছিল। আমরা যেন সকলেই তার হেদায়েতের জন্য এবং তার বিপন্ন স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যার মঙ্গলের জন্য দোওয়া করি।

কানফাটা বিপুল হর্ষধ্বনি ও জিন্দাবাদ পূরা এক মিনিট স্থায়ী হইল। শ্রোতাগণ উল্লাসে ক্ষিপ্ত হইয়া টেবিল, চেয়ার, চৌকি, পাশের লোকের পিঠ প্রভৃতি যা সামনে পাইল চাপড়াইয়া ও 'মারহাবা' 'মারহাবা' চীৎকার করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

সভা শান্ত হইলে এইবার উঠিলেন সভাপতি সাহেব। তিনি গোড়ায় এই অনুষ্ঠানের সমর্থক ছিলেন না। কেরামতের বিধবার প্রতি সরকার সাহেবের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া তিনি সভাপতিত্ব করিতে রাযী হইলেন বটে, কিন্তু কেরামতের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি তাঁর ধার্মিক মনে হামেশাই খোঁচা পাড়িতেছিল। অন্য ব্যাপারে ওসমান সরকার যতই প্রশংসার যোগ্য হউন না কেন, মামলার ব্যাপারে তিনি যে অপরাধী, এ সম্বন্ধে কেরামতের জবানবন্দি তাঁকে নিঃসন্দেহ করিয়া দিয়াছিল। সেই মামলা জিতার জন্য যে অভিনন্দন-সভার আয়োজন হইয়াছে, তাতে সভাপতিত্ব করিতে না যাওয়াই তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু যখন রাযী হইয়া গিয়াছেন, তখন কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকাই তিনি প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। তারপর যতই দিন যায় ততই তিনি দেখিতে পান যে, সভাপতি হিসাবে কিছু না বলিয়া তাঁর গত্যন্তর নাই। সেটা দেখিতে খারাপ হইবে। তারপর চিন্তা করিতে করিতে তাঁর একথাও মনে হয় যে, শেষ পর্যন্ত আমির আলিও নির্দোষ ছিল না। সে দায়রায় জাল চিঠি দাখিল করিয়াছিল। কাজেই এক ব্যাপারে সরকার সাহেবকে দোষী ধরিয়া লইলেও অনেক ব্যাপারে আমির আলি দোষী। দুই দোষীর জয়-পরাজয়ে মওলানা সাহেবের পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। পাবলিক এক্ষণে যা করিতেছে, তার বিরুদ্ধতা করিবার কোনো প্রয়োজন

নাই। সুতরাং মওলানা সাহেব সভাপতি হিসাবে দু'-এক কথা বলিতে পারিবেন স্থির করিয়াই সভায় আসিয়াছিলেন। তারপর সভার সার্বজনীন উৎসাহ-উদ্দীপনা ধীরে ধীরে তাঁর মনে সংক্রমিত হয়। অবশেষে মান্নান সাহেবের বক্তৃতায় তিনি মাতিয়া উঠেন। এমন যে ভাল মানুষ ওসমান সরকার, তাঁর বিরুদ্ধে মওলানা সাহেব কেরামতের মত রুগ্ন ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন! এটা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার। সম্ভবতঃ কেরামত রোগের ঘোরে প্রলাপ বকিয়াছে। ঐ বৃদ্ধ বয়সে অসুখ হইলে অনেকেরই স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। হইয়াছেও তাই। কেরামত শেখ ওটা যে প্রলাপের মুখেই বলিয়াছিল, তাতে মওলানা সাহেবের আর কোনো সন্দেহই রহিল না। সরকার সাহেবের নির্দোষিতায় এইভাবে নিঃসন্দেহ হইয়া মওলানা সাহেব মনে মনে তাঁর বক্তৃতা ভাজ করিতেছিলেন। এমন সময় সরকার সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁর মন একেবারে গলিয়া গেল। ওসমান সরকার তলে তলে মওলানা সাহেবকে এত ভক্তি করেন? বাস্তবিকই ত। মওলানা সাহেবের এখন মনে পড়িল, ওসমান সরকার অনেক ব্যাপারেই তাঁর উপদেশ নিতে আসিয়াছেন। তারপর সরকার সাহেব আমির আলির স্ত্রী ও নাবালকদের সম্বন্ধে যা বলিলেন, এটার সত্যই তুলনা হয় না।

মওলানা সাহেবকে এ অঞ্চলের সকলে আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস করিত। সুতরাং তাঁর মুখের কথা শুনিবার জন্য সকলেই গলা উঁচা করিয়া রহিল। তিনি হাদিস-কোরআন হইতে আরবী উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, আজিকার অনুষ্ঠান দেখিয়া তাঁর আশা হইতেছে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ আবার ফিরিয়া আসিতেছে, ইসলামের পথ আমরা আবার ফিরিয়া পাইতেছি। সরকার সাহেবের তারিফ করিয়া তিনি বলিলেন যে, জীবনে তিনি অনেক লোককে হাদিস-কোরআন শুনাইয়াছেন, নসিহত করিয়াছেন; কিন্তু ওসমান সরকার সাহেবকে নসিহত করিয়া এবং হাদিছ-কোরআন বুঝাইয়া তিনি যত আনন্দ পাইয়াছেন, এমন আনন্দ তিনি জীবনে পান নাই। সরকার সাহেবও তাঁকে অনেক শিখাইয়াছেন। (হর্ষধ্বনি)

এইসময় সরকার সাহেব মওলানা সাহেবের চোগা ধরিয়া টান দিলেন।

মওলানা সাহেব সরকার সাহেবের দিকে হেলিয়া তাঁর মুখের কাছে কান পাতিলেন। সরকার সাহেব মওলানা সাহেবকে কি বলিলেন।

মওলানা সাহেব সোজা হইয়া হাসিমুখে বলিলেনঃ আমাদের সম্মানিত মেহমান যে কথাটি বিনয়বশতঃ নিজে আপনাদের কাছে ঘোষণা করেন নাই, তা তিনি আমার মুখ দিয়া বলাইতেছেন। তিনি নিজে বলিলে সেটা তুকাব্বরি হইত বলিয়া তিনি মনে করেন।

সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে গলা লম্বা করিয়া কান পাতিল। মওলানা সাহেব ঘোষণা করিলেনঃ আমির আলির অসহায় স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য ওসমান সরকার একটি তহবিল খুলিয়াছেন। তিনি নিজে তাতে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। যার যা খুশী তাতে চাঁদা দিতে পারেন।

সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইল। সে বিস্ময়ের ভাব কাটিলে আবার তুমুল হর্ষধ্বনি ও জিন্দাবাদ চলিতে লাগিল। অনেকে পাশের লোকের দিকে চাহিয়া বলিলঃ এমন লোকও কলিকালে হয়?

সভা শেষ হইল। সমস্ত লোক মঞ্চের দিকে ছুটিল সরকার সাহেবকে দেখিবার জন্য, সম্ভব হইলে মুসাফেহা করিবার জন্য। যেন তারা ওসমান সরকারকে এই নূতন দেখিতেছে।

মঞ্চের চারিপাশে ভীষণ ভিড়। লোকেরা ঠেলাঠেলি করিতেছে। নেতারা দল বাঁধিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। সরকার সাহেবকে ঘিরিয়া অনেকে আলাপ করিতেছেন।

সরকার সাহেব বলিলেনঃ শরাফত মণ্ডল সাহেবকে ত সভায় দেখিলাম না। তাঁর কোনো অসুখ-বিসুখ হয় নাই ত?

মুহূর্তে কথাটা বিদ্যুতের মত সভায় ছড়াইয়া পড়িল—শরাফত মণ্ডল সভায় আসেন নাই। চারিদিকে ঢিঢি, শেম-শেম পড়িয়া গেল। এমন অনুষ্ঠানে যে যোগ দেয় না, তাকে ন্যায়, সত্য ও ইস্‌লামের শত্রু ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

কথা বাড়িয়া শেষ পর্যন্ত জনতার এই মত স্থির হইয়া গেল যে, ইউনিয়ন বোর্ডের আগামী ইলেকশনে শরাফত মণ্ডল যাতে এক ভোট না পান, তার জন্য সকলের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে।

চল্লিশ

সভাশেষে লোকজন যার-তার বাড়ির দিকে রওয়ানা হইল। এক-এক দল এক-এক দিকে চলিল। সবারই মুখে এককথা, সব দলে একই আলোচনা—ওসমান সরকার। দেখা গেল সবাই ওসমান সরকারের সাধুতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে আগে হইতেই কিছু-না-কিছু জানিত। প্রত্যেকেই পাশের লোককে বাধা দিয়া নিজের কথা বলিবার চেষ্টা করিল, তার মুখের কথা কাড়িয়া আরেকজন বলিতে লাগিল।

সরকার সাহেবও সকলের কাছে রুখ্‌সৎ হইয়া পার্শ্ববর্তী দু'চারজনের সহিত মুসাফেহা করিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা হইলেন। মান্নান সাহেব, জামাল সরকার প্রভৃতি কয়েকজন অনেকদূর পর্যন্ত সরকার সাহেবকে আগাইয়া দিয়া গেলেন। একদল অতিভক্ত ও পড়শী সরকার সাহেবের পিছনে পিছনে আসিল।

ওয়াজেদ সরকার সাহেবের সংগে আসিল না। সে তার সমবয়সীদের সহিত আলাপে মত্ত ছিল। বাবার আজিকার সম্মানে তার বুক গর্বে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সকলের মুখে পিতার প্রাণখোলা উচ্চ প্রশংসা শুনিলে সন্তানের মনে কি অপূর্ব পুলকানন্দ হয়, আজ সেটা বুঝিবার সুযোগ ওয়াজেদের হইয়াছে। ওয়াজেদের বিশেষ আনন্দিত হইবার কারণ আছে। সে বাবার সততায় একবার সন্দেহ করিয়াছিল। আজ আইন-আদালত ও জনমত একমত হইয়া বাবাকে নির্দোষ ঘোষণা করিয়াছে; জনমত তাঁকে সম্মানিত করিয়াছে। সুতরাং ওয়াজেদ আজ সেদিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তার বুকের উপর হইতে ভারী পাথর নামিয়া গিয়াছে। তাই সে বিপুল উৎসাহে আজিকার অনুষ্ঠানে খাটিয়াছে। সকলের সহিত সে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক ভদ্রতা করিয়াছে। লোকজনেরা তাকেও খুব সম্মান করিয়াছে। যেখানেই সে গিয়াছে, লোকজনেরা বলাবলি করিয়াছেঃ যেমন বাপ তেমনি বেটা, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয় ইত্যাদি। এসব কথা ছাড়াও ওয়াজেদ বেশ বুঝিয়াছে, আজিকার এই সম্মানের অর্ধেক সে পাইয়াছে। এমন আনন্দের বিরতি কেউ চায়? সুতরাং সভাশেষে ওয়াজেদ বন্ধুদের সংগে মাঠে,

বাজারে ও সড়কে এদিক-ওদিক বেড়াইল, হাস্য-রসিকতা করিল; পরীক্ষা কবে, ঢাকা কবে যাইতেছে ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচনা করিল।

অবশেষে সে যখন বাড়ি রওয়ানা হইল, তখন সন্ধ্যা পার হইয়া বেশ রাত হইয়াছে। পূবের আসমানে অনেকদূর তখন চাঁদ উঠিয়াছে। বহু সংখ্যক তারাও উঠিয়াছে। চাঁদ ও তারার এই মেলা তার মনে বেশ আনন্দ দান করিল। মনে পড়িল এই চাঁদ-তারার মেলার সংগে আজিকার অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য। চাঁদ যেন তার বাবা এবং তারাগুলি যেন সমবেত জনতা। হঠাৎ তার বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। অত সুন্দর এই চাঁদের যেমন কলঙ্ক আছে, তার বাবারও কি তেমনি কলঙ্ক আছে? না না, আইন-আদালতের রায় ও বিপুল জনমত মিথ্যা হইতে পারে না, যদিও ওয়াজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে তার মিল নাই। সে একা একপক্ষে, আর আইন-আদালত ও সারা দুনিয়া অপরপক্ষে। এটা কি সম্ভব যে সে একাই ঠিক, আর দুনিয়ার সবাই এবং তার বাবাও ভ্রান্ত? এত লোক একসংগে ভুল করিতে পারে? এত লোক একত্রে মিলিয়া অপরাধীর জয়ধ্বনি করিতে পারে? আইন-আদালত ও জজ-জুরীরা নির্দোষকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারেন? অসম্ভব। এই অভিনন্দন, এটা কি শঠতা ভণ্ডামি? কই, এতলোক যে বক্তৃতা দিলেন, কারও মুখে ত একটু শঠতার ছাপ ওয়াজেদ দেখিল না, কারও গলায় ত ভণ্ডামির একটু আঁচও ওয়াজেদ শুনিল না। বরঞ্চ কি আন্তরিকতা! কি সরল বিশ্বাস! কি সরল ধারণা! ওয়াজেদ মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। বক্তাদের মনের কোণে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস যদি থাকিত, তবে ওঁরা ঐ সুরে ঐ ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন? ন্যায়, সত্য, ধর্ম ও আল্লার নাম অমন অবিচলিত চিত্তে, অমন অকম্পিত কণ্ঠে তাঁরা লইতে পারিতেন? না না, মানুষ অত ভণ্ড, অত শঠ হইতে পারে না। পারে না? যদি পারে না, তবে দুনিয়ায় এত মিথ্যা, এত অন্যায়, এত জুলুম, এত পাপ চলিতেছে কি করিয়া? যত পাপ যত অন্যায় ধরা পড়িতেছে, সাজা পাইতেছে, তার চেয়ে বেশী পাপ কি সাজা এড়াইয়া যাইতেছে না? বহু পাপ কি অভিনন্দন পাইতেছে না? বহু বড় বড় পাপী কি সমাজের চূড়ায় বসিয়া রাষ্ট্রের নেতৃত্ব

করিতেছে না? এসব কি করিয়া সম্ভব হইতেছে? ভক্তি, ঐক্য, আইন, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, রাষ্ট্রানুগত্য, ধর্ম, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি বড় বড় বুলির আড়ালে এইসব পাপীর পাপ ঢাকা পড়িতেছে না? ওয়াজেদের নিজেরই বিবেক কি পরিষ্কার? তার বাবা দোষী কি নির্দোষ, সে বিচার ওয়াজেদ স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ মন লইয়া করিতে পারিল কি? সে কি পিতৃভক্তি, পারিবারিক শান্তি, সর্বোপরি নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া সত্য-নিষ্ঠা হইতে—? ওয়াজেদ আর ভাবিতে পারে না। না না, সে নিজে অত অসৎ নয়। দুনিয়া অত খারাপ নয়। অত খারাপ হইলে দুনিয়া এতদিন টিকিত না। দুনিয়া তবে কোন্‌দিন—

সে যে বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন কি সদর দরজায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ওয়াজেদ সে খবরই রাখিত না। বাবার শোবার ঘরের পাশ দিয়াই গেট। সে-ঘরের জানালা খোলা ছিল। হঠাৎ বাবা-মার কণ্ঠস্বর তার কানে প্রবেশ করিল। নিজের নাম শুনিয়া তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সে থামিয়া দাঁড়াইল।

বাবা বলিতেছেন: ওয়াজেদের পরীক্ষাটা শেষ না হৈলে ত আর দিন-তারিখ ঠিক করা যাইতাছে না।

মা: দিন-তারিখ না হয় পরীক্ষার পরেই হোক, কথাবার্তাটা পাকা হৈয়া থাক্‌তে দোষ কি?

বাবা: তুমি যখন কইতাছ ছেলে মেয়ে দুজনাই রাযী, তখন আর পাকা কথার বাকি কি? ডাক্তার সাহেব রাযী আছেন, সেকথা ত তোমারে কইছিই।

মা: তবু কথাটা শেষ হৈয়া থাকা ভাল।

বাবা: আচ্ছা, বেশ তাই—

ওয়াজেদের আর শোনার দরকার হইল না। সে চুপি-চুপি পা ফেলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে-ছাড়িতে সে ভাবিতে লাগিল: লুৎফুন কি সত্যই তার স্ত্রী হইতে যাইতেছে? লুৎফুনের মত মেয়ে যে দুনিয়ায় আছে, সে দুনিয়া কি খারাপ হইতে পারে? না না, দুনিয়া

যদি অত খারাপ হইত, তুনিয়ার লোকজন যদি অত ভণ্ড, অত শঠ হইত, তবে অত প্রেম, অত ভালবাসা, অত মহত্ত্ব, অত শিল্প, অত সৌন্দর্য্য তুনিয়ায় থাকিতে পারিত না।

ওয়াজেদ কাপড় ছাড়িয়া খড়ম পায়ে দিয়া হাত-মুখ ধুইতে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে বাহির বাড়ির টিউব-ওয়েলে চলিয়া গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সরকার সাহেব, বিবি সাহেব, যায়েদা, ওয়াজেদ ও বৌ সকলে মিলিয়া অনেকক্ষণ গল্প-গোযারি করিলেন। সভার বিস্তৃত বিবরণ, বক্তৃতাসমূহের একটানা প্রশংসা, তামদারির তারিফ, ওয়াজেদের ঢাকা যাওয়ার তারিখ, বাড়ি-ঘর জমি-জিরাতের উন্নতিবিধান, হালের নূতন গরু খরিদ, তুধের গাই বাড়ান, এক্কা বদলাইয়া একটা পাল্কী গাড়ি কেনার সম্ভাবনা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা হইল। তাতে রাত অনেক হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে এশার জামাত হইয়া গিয়াছে। কাজেই সরকার সাহেব একাই নামায পড়িতে মসজিদে গেলেন। ধীর শান্তভাবে নামায পড়িলেন। নামায পড়িয়া এত শান্তি জীবনে তিনি আর কোনোদিন পান নাই। আজ যেন রহমানুররহিম আল্লাহ্‌তালাকে তিনি নিজের চোখের সামনে হাযির-নাযির দেখিতে পাইলেন। রহমতের মালিক আল্লাহ্ তাঁকে আবার দেশবাসীর অন্তরে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ স্থান তাঁর বরাবরই ছিল; মাঝখানে কয়েকটা তুষ্ট লোক তাঁকে ইয্‌যতের স্থান হইতে সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মেহেরবান খোদা তাঁর সে স্থান তাঁকে ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং ধুমধামের সহিতই ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁর মত ভালমানুষকে আল্লাহ্ কেন বিপদে ফেলিয়াছিলেন, এখন তা তাঁর কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। ঐ কয়টা লোক তুশ্‌মনি না করিলে দেশের লোক এমন সভা করিয়া তাঁকে সম্মান দিত কি? এখন দেশের লোক তাঁকে ভালবাসা দেখাইয়াছে, দেশের লোককেও তিনি ভালবাসা দেখাইবেন।

এ সবই আল্লার কুদরত, তাঁরই মেহেরবানি।

সরকার সাহেব 'ইয়া আল্লাহ্' 'ইয়া আল্লাহ্' বলিতে-বলিতে তুই হাত মুখে ও বুকে মলিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাহিরে তখন মাথার উপর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসিতেছিল। প্রকৃতি যেন নীরবে হাসিয়া তাঁকেই অভিনন্দন জানাইতেছে। খানিক আগে সভায় হর্ষধ্বনি ও করতালির ভিড়ের মধ্য দিয়া তিনি যেভাবে সগৌরবে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঠিক তেমনি সগৌরবে তিনি প্রশান্ত প্রকৃতির করতালির মধ্যে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বিবি সাহেব এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তিনি ঘুমের মধ্যেও হাসিতেছেন। হাসিবেন না? সরকার সাহেবের মত স্বামী যাঁর, সে স্ত্রীলোক সুখী না হইয়া পারেন? ঘুমেও তিনি সুখের স্বপ্ন দেখিবেন না ত কি?

সরকার সাহেব শুইয়া পড়িলেন। হারিকেনের তেজ কমাইয়া দিয়া তিনি চিৎ হইয়া সারাদিনের ঘটনাবলীর যরিফ করিতে লাগিলেন। বায়স্কোপের ছবির মত বিদ্যুৎগতিতে গত কয়েক মাসের ঘটনাসমূহ তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হইল। সব যোগ-বিয়োগ করিয়া তিনি এটা বুঝিলেন যে, দুনিয়ার মানুষ মোটামুটি খারাপ নয়। তারা দোষে-গুণেই মানুষ। কিন্তু আমির আলির মত আদালতে দাঁড়াইয়া হলফ করিয়া নির্বিকার মনে মিথ্যা কথা মানুষ কি করিয়া বলিতে পারে, এটা সরকার সাহেব কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এইসব দুঃসাহসী পাপীকে আল্লাহ্ হেদায়েত করুন, খোদার দরগায় সরকার সাহেবের এই আরয।

সমাপ্ত